NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PGBG

PAPER- VII (A)

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

ত্রয়োদশতম পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, 2020.

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : বাংলা

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম ঃ PGBG — 7A

পর্যায় ঃ 1

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 : ছিন্নপত্র	অধ্যাপিকা মীনাক্ষী সিংহ	—
একক 2 : সোনার তরী	ঐ	—
একক 3 : শ্যামলী	ঐ	—

পর্যায় ঃ 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 : রক্তকরবী	রুণা চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত
একক 2 : সে	ড. শ্রাবণী পাল	ড. শিবানী ঘোষ
একক 3 : তিনসঙ্গী	ড. মঞ্জুভাষ মিত্র	—
একক 4 : ভারতবর্ষের ইতিহাস	ড. বাসন্তী মুখোপাধ্যায়	—
একক 5 : জীবনস্মৃতি	ঐ	—

পর্যায় ঃ 3

	রচনা	সম্পাদনা
একক 6 : গোরা	অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র	ড. শিবানী ঘোষ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

বাংলা

PGBG – 7A

(বিশেষ পত্র)

পর্যায়

1

একক 1 ☐ ছিন্নপত্র 7 – 22

একক 2 ☐ সোনার তরী 23 – 48

একক 3 ☐ শ্যামলী 49 – 62

পর্যায়

2

একক 1 ☐ রক্তকরবী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 63 – 83

একক 2 ☐ 'সে' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 84 – 99

একক 3 ☐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প : তিনসঙ্গী 100 – 123

একক 4 ☐ ভারতবর্ষের ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 124 – 129

একক 5 ☐ জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 130 – 180

পর্যায়

3

একক 6 ☐ 'গোরা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 181 – 202

একক 1 ❑ ছিন্নপত্র

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 পাঠ ও আলোচনা

1.2.1 ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী

1.2.2 ছিন্নপত্র ঃ প্রকৃতিপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি

1.2.3 ছিন্নপত্র ঃ মূল্যায়ণ ঃ পত্র সাহিত্য ও কবিজীবনের রসভাষ্য

1.2.4 ছিন্নপত্র ঃ রবীন্দ্রসৃষ্টির অঙ্কুর

1.2.5 ছিন্নপত্র ঃ সৌন্দর্য চেতনা

1.2.6 অনুশীলনী

1.2.7 গ্রন্থপ্রাঞ্জ

1.1 ঃ প্রস্তাবনা

গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের অসামান্য গ্রন্থ-ছিন্নপত্র। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পকাশিত ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের এক অনুপম সৃষ্টি। কবির জীবনদর্শন, ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অধ্যায় ছিন্নপত্রের যুগে শিলাইদহে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছিল। নিসর্গ প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবনে হাসিকান্নার কলতান কবি জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের এই চিঠিগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। (প্রথম আটখানি চিঠি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা হয়েছিল) ছিন্নপত্রে সংকলিত ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত ১০৭খানি পত্রের একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৬০ খ্রিঃ প্রকাশিত।

1.2.1 ঃ ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন সেগুলির বহু অংশ বর্জন করে, প্রয়োজনমত ভাষা ও ভাবগত সংস্কার করে সাধারণের উপযোগী কিছুটা সাহিত্যিক আকার দেওয়া হয়। ছিন্নপত্রাবলী সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এটাই।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৯ বঙ্গাব্দে) এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম আটটি চিটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত. বাকী সব কটিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ছিন্নপত্রের ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত ১০৭ খানি পত্রের (ইন্দিরা দেবীকে লেখা) একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী। প্রকাশ কাল ১৯৬০ (বিশ্বভারতী)। রবীন্দ্রনাথের লেখা

এই চিঠিগুলি ব্যক্তিগত পত্রের সীমানা ছাড়িয়ে এক বিশেষ সার্বজনীনতায় পৌঁছে বাংলা পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যময় করেছে। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র সাহিত্য হয়ে ওঠার পিছনে পত্র লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতার প্রমাণ থেকে যায়। রবীন্দ্রমানসলোক ও অন্তর্জীবনের অসামান্য রসভাষ্য এই পত্রগুচ্ছ। উপলব্ধির গভীরতায় ও আন্তরিকতায় ছিন্নপত্রাবলী সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ।

পত্রাবলীর আলোচনার গভীরে যাবার আগে চিঠি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমাদের আলোচনাকে পূর্ণতা দানে সহায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যারা ভালো চিঠি লেখে তারা স্বপ্নে জানালার
ধারে বসে আলাপ করে যায়। তার কোনো
ভার নেই, বেগও নেই স্রোত আছে।"

একেই তিনি বলেছেন 'ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস'। সুতরাং চিঠি হল লেখকের আত্মকথন যার অপর দিকে একজন উন্মুখ শ্রোতার উৎসুক শ্রবণ অপেক্ষিত থাকে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদেই চিঠি লেখার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্য ছাপিয়ে যখন পারস্পরিক অনুভবের সেতুবন্ধ রচনা করে চিঠি তখনই তা পত্রসাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য পড়ার জন্য পত্র রচিত হয় না, রচিত পত্র রচয়িতার অজ্ঞাতে সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মনের আয়নাতে নিজেকে ও অপরকে দেখতে পাওয়াই চিঠি। কিন্তু সেই দেখা যখন ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে অনুভব গভীরতায় সর্বজনের ব্যক্তির সীমানা অতিক্রম করে সর্বজনের সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। জাভাযাত্রীর পর, পারস্যে, জাপানে, রাশিয়ার চিঠি, পথে ও পথের প্রান্তে, ছিন্নপত্র সবই বিশিষ্ট একজনকে লেখা হলেও নির্বিশেষ সাহিত্যরূপে মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যেমন অমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি। ঘটনার
ডাকপিয়নগিরি করে না সে, নিজেরই সংবাদ সে নিজে"।

আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের চিঠি শুধুমাত্র ঘটনার ঘনঘটার তথ্য ভারাক্রান্ত নয়, অন্য এক স্বাদু রস তার মধ্যে মিশে থাকে, ঠিক যেমন আত্মচরিত রচনা কালে প্রাত্যহিক ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে জীবনের সত্যরূপে ও অনুভবকে তিনি তুলে ধরেন।

ছিন্নপত্রাবলী রবীন্দ্রমানসের গভীর জীবনবোধ ও জীবনরসে সমুজ্জ্বল। একটি চিঠিতে ইন্দিরাদেবীকে লিখেছেন—

"তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি, তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয়নি।"

—এই স্বীকারোক্তির মধ্যে নিহিত আছে ছিন্নপত্রাবলীর দ্বিতীয়রহিত অনন্যতা। এর বিভিন্ন চিঠির মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ, মর্ত্যপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিরসিক রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথ ও জীবনরসিক রবীন্দ্রনাথের নানা পরিচয় বিচ্ছুরিত। জমিদার রবীন্দ্রনাথ, পাঠক রবীন্দ্রনাথকেও এখানে আবিষ্কার করা যায়। সেই সঙ্গে ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ছবির সামগ্রিক সত্তায়

প্রকাশিত। এই পত্রাবলী রচনাকালে কবি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদ্মার উপর বোটে করে। তাঁর নিজের ভাষায়—

"পথ চলা মানে সেই সকল গ্রাম দৃশ্যের নানা নতন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল, তখনই তখনই তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।"

মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সেই মানচিত্র চিঠির ভাষায় রূপচিত্র হ'য়ে ধরা পড়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত রবীন্দ্রমানসের যে পূর্ণ মূর্তি প্রকাশিত তেমন আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ছিন্নপত্রাবলীকে রবীন্দ্রভাবনার অনুবিশ্ব বলতে পারি।

এর একেকটি চিঠিতে কবি মনের এক একটি দিক ধরা পড়েছে। ১৬০ সংখ্যক পত্রে চিঠি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই তিনি লিখেছেন যে কোনও লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা যদি তার চিঠিতেই দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হ'বে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তারও আছে চিঠি লেখাবার আশ্চর্য ক্ষমতা। এজন্যই তাঁর মনে হয় যে শোনে এবং যে বলে এই দু'জনের সহমর্মিতায় শ্রেষ্ঠ চিঠি রচিত হ'তে পারে।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের নির্যাস বলতে পারি। এর অনন্যতা আমাদের কাছে তখনই ধরা পড়ে যায় যখন তিনি জানান যে তাঁর ইচ্ছা করে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই চিঠিগুলি নিরালায় পড়ে জীবনের বহু বিগত মুহূর্তের স্মৃতির মধ্যে ডুব দিত। এ বিষয়েই ২০ সংখ্যক চিঠিতে জানিয়েছেন—

"আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।"

স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে এমন অভিজ্ঞানপত্র নিঃসন্দেহে ছিন্নপত্রাবলীর মর্যাদাকে কালাতীত গৌরব দান করেছে। এর বিভিন্ন চিঠিতে নানা রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুঁজে পাই। কখনো ঘরোয় টুকরো ছবি, কখনো বা হৃদয়ের একান্ত অনুভব, আবার কখনো সৌন্দর্য তত্ত্বের অনন্ত রসরূপ, কখনো বা ধর্মের মূল ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন প্রেম হ'চ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। এই বোধ রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যে, প্রবন্ধে বহুবার ধরা পড়েছে। আবার সৌন্দর্যের গভীর তত্ত্ব স্বরূপ নিয়ে আরেকটি চিঠিতে তার ব্যখ্যা করেছেন। সৌন্দর্যের ভিতরকার অনন্য গভীর আধ্যাত্মিক কথা প্রসঙ্গে এসেছে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল', শেলীর কবিতার অংশ এবং কীটসের কবিতার উল্লেখ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা'। সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে এমন কথা সাহিত্যতত্ত্বে তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠির মধ্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের এমন আলোচনা সম্ভবত আর কেউ করেন নি। ১২০ নং চিঠিতে দুঃখের স্বরূপ নিয়ে গভীর কথা বলেছেন, বলেছেন গভীরতম দুঃখে হৃদয়ে বিদীর্ণ, ব্যথার ভিতর থেকে একটা সান্তনার উৎস জন্মায়। ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ, কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। এই গভীর জীবন অনুভবের পাশাপাশি অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিচয়ের যে ছবি ছিন্নপত্রে আঁকা আছে তার মূল্যও কম নয়। ৪৬ সংখ্যক চিঠিতে তাঁর তিন পুত্রকন্যা খোকা, বেলি ও রানু-র (রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা ও রেণুকা) শিশুসুলভ চাপল্যের যে আনন্দ ছবি আঁকা আছে তা পিতা রবীন্দ্রনাথের স্নেহবৎসল হৃদয়ের অপূর্ব প্রকাশ। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরার একেবারে শিশুবেলার যে মধুর ছবি ছিন্নপত্রে আঁকা আছে, অন্য কোথাও তেমন নিবিড়ভাবে তা ধরে পড়েনি।

সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা যে অঙ্কুরিত অবস্থায় ছিন্নপত্রাবলীতে প্রচ্ছন্ন তা পাঠক মাত্রেই জানেন। ছিন্নপত্রের যুগে লেখা অসামান্য ছোটগল্প, 'সোনারতরীর' অনবদ্য কবিতা চিঠিগুলির পাতায় আভাসে ধরা আছে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমার এ সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা"।

আবার ছিন্নপত্রের একটি চিঠির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বহুখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব' এবং 'বসুন্ধরা'র বীজ। 'চিত্রা' কাব্যের সৌন্দর্যচেতনা বিকশিত 'পূর্ণিমা' কবিতাটির উৎস মনে হয় ছিন্নপত্রাবলীর ২৫০ সংখ্যক চিঠি। অনেক রাত্রিতে পাঠশ্রান্ত কবি শুতে যাবার আগে বাতি নিভিয়ে দেওয়া মাত্র দেখলেন চারিদিকে খোলা জানালা দিয়ে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠলো। গ্রন্থের মধ্যে সে সুধা তিনি খুঁজেছিলেন বাইরের সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই সুধার প্লাবন পরিপূর্ণ হচ্ছিল জ্যোৎস্নালোকে। অন্ধকারের অন্তর থেকে উৎসারিত এই সৌন্দর্য তাঁর অনুভবকে আচ্ছন্ন করেছে, প্রেরণা দিয়েছে সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক অনন্য কবিতা রচনায়। ছিন্নপত্রের চিঠির মধ্যে যেন সেই জ্যোৎস্নালোকের অনুভূতি ও মহিমা ধরা পড়েছে। কবি মনের সমস্ত বিচিত্রভাব এই চিঠিগুলিতে যেমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে আর কোথাও সামগ্রিকভাবে তা হয়নি।

এই পত্রাবলীতে পাঠক রবীন্দ্রনাথ এক অন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এখানেই কালিদাসের প্রতি তাঁর অসামান্য অনুরাগ প্রকাশিত। বিভিন্ন চিঠিপত্রে বিভিন্ন সময়ে মেঘদূতের প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কালিদাস মুগ্ধতা ছিন্নপত্রে সূত্রাকারে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া নানা বিদেশী গ্রন্থের উল্লেখ রবীন্দ্র-অধ্যয়নের বিশাল ক্ষেত্রকে ছিন্নপত্রে তুলে ধরেছে। তাঁর মনের কাছাকাছি একটি বই-এর একাধিকবার উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করেছি। বইটির নাম—'অ্যামিয়েলস জার্নাল'। পরবর্তীকালে দেখা গেছে এই বইটি নানাভাবে রবীন্দ্রমননে প্রভাব রেখে গেছে।

অন্যান্য পরিচয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ অনালোকিত আরেকটি সত্তা ছিন্নপত্রাবলীতে বারবার ছায় ফেলেছে। সেই পরিচয় জমিদার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপরিচয়, যার সূত্রে শিলাইদহে তাঁর আগমন ঘটেছিল। পরিচিত জমিদারের প্রথাগত মূর্তি'র পরিবর্তে প্রজারঞ্জক দরদী রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাদের চোখে ধরা দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা বা সমবায় নীতির প্রচার সম্ভব হয়েছিল। তাঁর দরদী মনের স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে কয়েকটি চিঠিতে যেখানে দরিদ্র চাষী প্রজাদের দেখে তাঁর নিষ্ঠুর বিধানের কথা মনে হ'য়েছে। তাদের প্রতি তাঁর মমতার প্রকাশ নানাভাবেই দেখা গেছে। দরিদ্র খানসামার শিশুকন্যার মৃত্যুতে রবীন্দ্রমানসে বেদনার্ত প্রকাশ ছিন্নপত্রের চিঠিতে ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কৌণিক ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য তাঁর নানা রচনায় ধরা পড়েছে। কিন্তু ছিন্নপত্রাবলীতে তা যেন পূর্ণ স্বরূপে এবং অখণ্ডভাবে ধরা রয়েছে। সমগ্র রবীন্দ্র জীবন ও মননের নির্যাস রূপে এই ছিন্নপত্রাবলীকে গ্রহণ করা হয়। আর তখনই চিঠি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যের আলোতে ছিন্নপত্রাবলীর মূল্য অমূল্য হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়।"

বাংলা সাহিত্যের বিগত, সমাগত ও অনাগত সমস্ত পাঠকের কাছে ছিন্নপত্রাবলী সেই মহামূল্য উপহার।

1.2.2 ছিন্নপত্র ঃ প্রকৃতিপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি

'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য পত্রগুচ্ছ। স্বাদবৈচিত্র্য, লিপিচাতুর্য, ও সহজ বাকবিন্যাসে গ্রন্থটি অনন্য। পদ্মাতীরে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ দশবছর বসবাসের ইতিহাস আমরা ছিন্নপত্রে একান্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করি। সেখানে কবি ও নিসর্গ প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ছিন্নপত্র প্রকৃতির অভিনব এক চিত্রশালা। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে পদ্মাতীরে উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হলেন. তখনই প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রকৃতি তাঁর অনুভবে বিম্বিত হ'ল। এই দেখা সাধারণ লেখার মধ্য দিয়ে এক অভিনব দর্শনের রূপান্তরিত। প্রকৃতিকে কবি দেখলেন বস্তুরূপে উপলব্ধি করলেন বস্তুস্বরূপে।

পদ্মাতীরের গাছপালা, নদীঘাট, প্রভাতসন্ধ্যা, শীত-গ্রীষ্ম বৈচিত্র্যে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। অলস তপ্ত মধ্যাহ্ন, খর রৌদ্রস্নাত উদাস দ্বিপ্রহর, ঝিল্লী মুখরিত সন্ধ্যা, জ্যোস্নাপ্লাবিত রাত্রি, নির্জন নদী যেন শব্দ, বর্ণ ও রূপময় চিত্রে উদ্ভাসিত।

মায়ামত সন্ধ্যার বর্ণনায় দেখি—

"সূর্য ক্রমে পৃথিবীর শেষ রেখার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গাছপালার একটু ঘেরা দেওয়াল ছিল, ওইখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ী।" আবার কখনো বা প্রদোষের প্রকৃতিকে কবি কল্পনায় মনে হ'য়েছে অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আভায় যেন কোনো সীমন্তনী। গভীর রাত্রে আলোকিত জ্যোৎস্নায় স্নাত পূর্ণিমা নিশীথিনী কবিকে সৌন্দর্য দর্শনের দীক্ষা দিয়েছে। ধীরে ধীরে প্রকৃতি তত্ত্বরূপে কবি মনে আভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তখনই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এই মর্ত্যধরণীর সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরের সম্পর্ক। এই মর্ত্যভাবনা আসলে বৃহত্তর নিসর্গভাবনারই অন্যরূপ। সমকালে লিখিত 'সোনারতরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধরা আছে পৃথিবীর সঙ্গে কবির জন্ম জন্মান্তরের বন্ধনসূত্র। 'ছিন্নপত্রে' তাকেই গদ্যভাষায় রূপ দিয়েছেন—

"আমি আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে এই সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব শিশুর মতো অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম আমার সমস্ত শিকড় দিয়ে মাটির মাতাকে জড়িয়ে ধরে এর স্তনরস পান করেছিলুম"

'বসুন্ধরা' কবিতায় একেই কাব্যভাষায় বলেছেন—

"আমারে ফিরায়ে লহ আমি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে"

—এই মর্ত্যমমতা কবির বিশ্বজাগতির ভাবনার পরিণততর পকাশ। তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে আছে এক বিষণ্ণ মাধুরী। পৃথিবীর সব কিছুকেই ধরে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। এই ধরে রাখা আর

চলে যাওয়ার মানব ইতিহাস যেন প্রকৃতির মধ্যেও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সোনারতরীর 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় এই মর্ত্যপ্রীতির বিষয় মাধুরীই আভাসিত।

'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন- 'যেতে নাহি দিব', হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

প্রকৃতির মধ্যে কবি শোনেন বসুন্ধরার অশ্রুত রোদন,

—"আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা
আমার নেই, আমি ভালোবাসি কিন্তু
রক্ষা করতে পারিনে; আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে
পারিনে; জন্ম দিই কিন্তু বাঁচাতে পারিনে"

পদ্মাতীরে প্রকৃতির নিঃসীম উদারতায় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এই পৃথিবী যেন বহু সন্তানবতী জননী তার হিরণ্য আঁচলখানি বিছিয়ে নির্জন দ্বিপ্রহরে অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন। এইভাবে বারবার প্রকৃতি ও মর্ত্যমাধুরিমাকে মিশিয়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রকৃতিতন্ময় অনন্য মন্ময় পত্রাবলী 'ছিন্নপত্র'। ধীরে ধীরে প্রকৃতি তার কাছে হ'য়ে উঠেছে এক বিশিষ্ট সত্তা। রোমান্টিক প্রকৃতি চেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হচ্ছেন 'মিস্টিক' নিসর্গভাবনায়। তখন প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন সজীব এক সত্তার অস্তিত্ব, প্রকৃতির মধ্যে শুনতে পেয়েছেন এক সকরুণ বিষণ্ণ বেদনা গাথা।' কবি Wordsworth তাঁর 'Lines wirtten on Tintern Abbey" কবিতায় এমন ভাবেই প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করেছিলেন "The still sad music of humanity" তাঁর কাছেও প্রকৃতিকে মনে হয়েছিল "A living soul".

উপনিষদলালিত রবীন্দ্রমনে প্রকৃতির মধ্যে এই সর্বব্যাপী সত্তার অনুভব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। উপনিষদ বলেছেন "তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ" অর্থাৎ তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে নিজেই তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন"

অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে। অতি চেনা পদ্মা, চির চেনা নীল আকাশ, জলস্থল সব যেন বাঁধা পড়েছে তার চৈতন্যলোকে যা সত্য বা Real তা-ই ভাব বা Ideal-এর সঙ্গে মিলে মিশে রচনা করেছে অনন্য রূপচিত্র। নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রকৃতিকেও তিনি বড়ো কাছে পেয়েছেন। এই সময়ই লিখেছেন-

"মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।"

এই পর্বেই শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর, পাবনাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এই সব গ্রাম যা কোনো বিখ্যাত লোকের বাসভূমি নয়, সাধারণ গ্রামীন মানুষের আবাস, তা-ই তাঁর মনে প্রভাব রেখে গেছে। ছোট মানুষের ছোট প্রাণের সুখদুঃখের কথা এই পদ্মাতীরে বসেই কবি দেখেছেন, শুনেছেন, লিখেছেন। তাঁর পোস্টমাস্টার, ছুটি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র প্রভৃতি গল্পের সামান্য অথচ অসামান্য চরিত্রগুলি ছিন্নপত্রের

যুগের ফসল। প্রকৃতির মক মানবিক প্রকৃতিও এখানে বিচিত্র লীলায় অভিব্যক্ত হয়েছে। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ ছবিও তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—একটি চিঠিতে তারই বর্ণনা—

"একটা গড়ানে ঘাট, তাতে কেউ বাসন মাজছে, কেউ নাইছে, কেউ কাপড় কাচছে আবার কোনো লজ্জাশীলা রমণী ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে জমিদারকে নিরীক্ষণ করছে।" সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর অনভিজ্ঞতার সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে একবার বলেছিলেন— "বাংলার গ্রাম আমি জানিনে? বাঙালীর জীবন জানিনে আমি, আর চিত্র আঁকিনি?"

বাস্তবিক রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতির বিচিত্ররূপ ছিন্নপত্রে প্রকাশিত। গ্রীষ্মের খর রৌদ্র তাপে উদাস দ্বিপ্রহর, বর্ষর নবকৃষ্ণ মেঘ ও অঝোর বর্ষণ শরতের স্নিগ্ধ নীলাকাশের বর্ণিমা, হেমন্তের কুহেলি বিলীর প্রহর, শীতের হিমেল রুক্ষতা, বসন্তের বর্ণিল রঞ্জিমা যেমন তাঁর হৃদয়কে আকুল করেছে তেমনই ভাবেই মানুষের জন্য জেগে উঠেছে তাঁর অনুভবী মন। এজন্যই পল্লীর মানুষের জন সমাজ সংস্কার, কৃত্রি উন্নয়ন, শিক্ষা প্রসারের কথা তাঁর মনে জেগেছে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন তারই কর্মরূপ। তাই 'ছিন্নপত্র' কেবল চিত্রশালাই নয়, তাঁর কর্মশালাও বটে। পদ্মা নেয় কবির প্রাণ প্রবাহিনী; মানবপ্রকৃতি ও নিসর্গপ্রকৃতি যেন তার দুই তীর। এপারে সীমাবদ্ধ মানবের ক্ষুদ্র জীবন, পরপারে বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল অসীমতা। এভাবেই 'ছিন্নপত্র' সীমা-অসীম, রূপ-অরূপের দ্বৈতলীলাভূমি, যেখানে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রমানসের মর্ত্যমাধুরী ও অমর্ত্য মধুরিমা।

1.2.3 ছিন্নপত্রের মূল্যয়াণ ঃ পত্রসাহিত্য ও কবিজীবনের রসভাষ্য

'ছিন্নপত্র রবীন্দ্রজীবনের অপরূপ রসভাষ্য।' সোনারতরী'র যুগে পদ্মাবক্ষে ভাসমান কবি লৌকিক জীবনের সংস্পর্শে এসেছেন। তাই এসময়ই লৌকিক প্রেমের কাব্য 'সোনারতরী' রচিত হয়েছে, রচিত হয়েছে লোকজীবন মথিত 'গল্পগুচ্ছ'; লেখা হয়েছে অনন্য পত্রসম্ভার 'ছিন্নপত্র'। ১৮৮৭ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে চিঠিগুলি লিখিত। কিন্তু শতবর্ষ অতিক্রান্ত পাঠযোগ্য জনপ্রিয়তায়এটা প্রমাণিত যে মহাকাল এই টুকরো চিঠিগুলিকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। তাই আজও রসাবেদনে এগুলি অম্লান। ব্যক্তিগত পত্রের সীমানা অতিক্রম করে এ চিঠি হ'য়ে উঠেছে বিশ্বজনীন পত্রসাহিত্য। কাব্যজিজ্ঞাসার রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আলঙ্কারিকরা জানিয়েছেন লৌকিক বিষয়কে অবলম্বন করে কবি যখন কাব্যরচনা করেন তখন সেটি লৌকিক উপাদান মাত্র। কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে তা' আস্বাদযোগ্য হয়ে ওঠে যখন, তখনই রসের সৃষ্টি হয়।

'ছিন্নপত্র' কবির লৌকিক জীবনাশ্রিত সেই অলৌকিক কাব্যরস। তিনি নিজে বলেছেন—

"বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থভাবে নেই, যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে.....আমার পদ্যে গদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে

গাঁথা নেই।" ছিন্নপত্রের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনচারণাও প্রকাশ পেয়েছে। এই একান্ত ব্যক্তিগত লৌকিক উপাদানকে ব্যক্তিগত অনুভূতির আলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে ইন্দিরাদেবীর হৃদয়ের অনুভব ঘটেছে, তখন সেই ব্যক্তিগত লৌকিক উপাদান এবং অলৌকিক রসের উজ্জীবন ঘটিয়ে নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে বিস্তার লাব করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের একান্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ জীবন ও তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি অবিকৃতভাবে 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় উপস্থিত হয়েছে।

তাই ছিন্নপত্রাবলীতে কবি, দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রপরিচয়ের সহেগ সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও উদঘাটিত। তখন তিনি বিশ্ববন্দিত কবি ন'ন, অধ্যাত্মভাব তন্ময় দার্শনিক ন'ন, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ ন'ন, রূপতন্ময় ভাববিভোর প্রকৃতি প্রেমিক ন'ন, তখন কেবলই তিনি জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ; বড়দিদি মেজোদিদির স্নেহের রবি, বলেন্দ্রনাথের ররিকা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের ছোট বউ-এর নিতান্ত ঘরোয়া স্বামী, রথী-বেলি-রানু-মীরা-শমীর স্নেহময় পিতা।

ছিন্নপত্র/পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি এই একটি মাত্র গ্রন্থে তাঁর পরিচিতি বহুকোণিক হীরকদীপ্ত মনন মনীষার আলোক বৃত্তে থেকেও প্রায়ই একান্ত ঘরোয়া কাছের মানুষের আপনজন হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন এবং হয়তো পারিবারিক স্নেহ সম্পর্কিত ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা বলেই এই চিঠিগুলিতে সব ছাপিয়ে এক স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ধরা দেন। যাঁকে দেখে আমাদের মনে হয়

"হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
ওগো তপন তোমার দেখিয়ে স্বপন
করিতে পারিনে সেবা"

—সেই বিশ্বমানব অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে ছিন্নপত্রের ঘরোয়া উচ্চারণে বড় কাছে পাই। এখানেই ছিন্নপত্রের চিঠির অন্তরঙ্গ রূপের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। হয়তো চিঠি বলেই এই কাছে পাওয়াটি এত সহজ হয়ে ওঠে। কারণ রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—

"আমরা মানুষকে দেখে কতটা লাভ করি তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে কতটা লাভ করি আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর একদিকে থেকে তাকে আর একরকম করে পাই।" এই পাওয়ারই পূর্ণতা ছিন্নপত্রের মধে প্রত্যাশিত রস সৃষ্টি করেছে। ছিন্নপত্রের ১০ সংখ্যক চিঠিতে শিলাইদহের অর পারে একটা চরের বর্ণনাত্মক লেখায় ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ছবিটি পাই। সন্ধ্যাবেলা বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে সবাই ইচ্ছে মতো বেড়াতে গেছেন। সঙ্গী ভাইপো বলু একদিকে, কবিজায়া সঙ্গিনী সহ অন্যদিকে, স্বয়ং কবি আর একদিকে। কিন্তু ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়াম্লান আকাশে যখন কৃশ চাঁদের মৃদু আলোকপাত ঘটেছে, তখনো কবিপত্নী সঙ্গিনী সহ ফেরেননি দেখে কবির চিন্তা ও উদ্বেগের যে বর্ণনা চিঠিতে আছে, তার মধ্যে কোথাও মনীষী, দার্শনিক, কবি রবীন্দ্রনাথের অস্মিতা প্রকাশ নেই। তিনি লিখেছেন—"অসম্ভব রকমের আশঙ্কা সকল মনে জাগতে লাগলো।"

স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করা, এই পরিচিত তথ্যের বাস্তব রূপটি ব্যাকুল রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। মৃণালিনী দেবীর সাড়া না পেয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এই ভাষাতে—

কোনও সাড়া পেলুম না, তখন মুখটা চারদিক থেকে দমে গেল। একখানা বড় খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমন হয়"-এর পরেই তাঁদের সন্ধান পেয়ে কবির আশ্বস্ত চিত্তে সকৌতুক মন্তব্য—

"বোট ওপারে গেল, বোট লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন"—

ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ হৃদয়কে উদঘাটিত করে।

পিতা রবীন্দনাথের সংসার জীবনে ছোটখাটো মধুস্মৃতিভরা একাধিক চিঠি ছিন্নপত্রে আছে, সেখানে স্নেহবৎসল পিতার অনবদ্য ছবি একান্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর পুত্রকন্যাদের নানাবিধ কৌতুককর আচরণের বিচিত্র পরিচয় 'ছিন্নপত্রে' বর্ণিত, যা তিনি আর এক বিশেষ স্নেহের পাত্রী বিধির (ইন্দিরা দেবী) কাছে উন্মোচন করেছেন—

"মীরার জন্য আমার কোনো কাজ হবার জো নেই। সেই ছোট ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আপনার পা দু'খানিকে একবার আকাসে তুলে দিয়ে তারপরে নিজের মুখে পুরে দিয়ে যখন 'বাবা' শব্দে চিৎকার আরম্ভ করে দেন, তখন আমার লেখাপড়া কিংবা কোনো কাজ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।"

এই অনবদ্য আন্তরিক উচ্চারণে স্নেহমধুর পিতৃহৃদয়ের যে মমতা-মাধুরী ধরা পড়েছে তাতে পাঠকের কাছে বিশ্ববন্দিত মহাকবি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ সব খ্যাতি অতিক্রম করে একান্ত অন্তরঙ্গ ছবিটি ধরা পড়ে। এবং 'ছিন্নপত্র' ছাড়া আর কোথাও এমনভাবে তাঁর বহুমুখী সত্তার সহাবস্থানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাংসারিক রূপটি ধরা পড়েনি।

এই ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কোথাও কবি সুলভ ছন্দ ঝংকার, উপমা-অলংকার বা রূপকের তত্ত্বাবরণে ঢেকে দেওয়ায় হয়নি; একান্ত ব্যক্তিগত এই উচ্চারণে ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমনের স্পর্শ লেগে আছে। যে 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য অপরিহার্য, সেখানে এই অন্তরিক ব্যক্তিমানুষটির পরিচয় উন্মোচন অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ, মনন মনীষা, কবি প্রতিভা, দার্শনিক প্রত্যয় কিংবা অধ্যাত্মচেতনায় আলোকিত সৌরকরোজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ পরিচয়ের অভ্রান্ত নিদর্শন তাকে আমাদের একেবারে কাছে এনে দেয়। তখন আমাদের মনে হয় হয়তো বা তাঁর চরণ আমরা ছুঁতে পেরেছি। সেখানে বাস্তব ধরণীর স্পর্শ লেগে আছে। এখানেই তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি অনন্য ও দ্বিতীয়রহিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।

1.2.4 ছিন্নপত্র— রবীন্দ্রসৃষ্টির অঙ্কুর

রবীন্দ্র মানসলোকে ও অন্তর্জীবনের অসামান্য রসভাষ্য 'ছিন্নপত্র'। পত্রাবলীর মধ্যে যে উপলব্ধির গভীরতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ তা' সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে তুলনা রহিত। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দশবছরের

সময় 'ছিন্নপত্র' লেখকের কাল। তখন কবি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদ্মার ওপর বোটে করে। সেই সঞ্চরমান অবস্থায় যে চিঠি লিখেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে—তাই 'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে সংকলিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় তাঁর "পথচলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল, তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।"

মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের সেই ক্ষণচিত্র চিঠির ভাষায় রূপচিত্র হ'য়ে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে নিসর্গ প্রকৃতি, মর্ত্যমাধুরী, জীবনরহস্য, গভীর দার্শনিকতা ও জীবনবোধ ছিন্নপত্রের লিপির মধ্যে লীন হয়ে ধার পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুবিশ্ব হিসেবে ছিন্নপত্রের বিশিষ্ট স্থান সাহিত্যে নির্দেশিত। তাই রবীন্দ্র পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে 'ছিন্নপত্র' অনন্য ও দ্বিতীয়রহিত। 'ছিন্নপত্র' লেখার কালেই রচিত হয়েছে 'সোনারতরী'র কবিতাগুচ্ছ ও গল্পগুচ্ছের অসামান্য ছোটগল্পাবলী। অনেক সময়ই তাই 'ছিন্নপত্র' হয়ে উঠেছে কবিতার রসভাষ্য ও ছোটগল্পের আকর। এজন্যই ছিন্নপত্রের অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা ছোটগল্প বীজাকারে লুকানো আছে। 'সোনার তরী'র সূচনায় কবি লিখেছেন—

"মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার
মনকে জাগিয়ে রেখেছিল"

ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়ানো চলমান গ্রামীণ ছবি দেখার মধ্য থেকে অনেক চরিত্র উঠে এসেছে চিঠির পাতায়, তারপর মনের মুকুর থেকে সাহিত্য দর্পণে। এভাবেই বহু কবিতা ও ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে ছিন্নপত্রের যুগে, লেখা হয়ে আছে চিঠির পাতায়।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' তাঁর প্রথম রচিত ছোটগল্প যুগল। ছিন্নপত্র লেখা শুরু ১৮৮৫ থেকে। হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার তাগিদে গল্প লেখার শুরুও সেই সময় থেকে। পোস্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, ছুটি, সুভা, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, অতিথিস্তু প্রভৃতি গল্পগুলির আবছা আভাস কখনো বা স্পষ্ট স্কেচ 'ছিন্নপত্রের' চিঠিতে আঁকা আছে। বহু গল্পের ভাববীজ এভাবেই ছড়িয়ে আছে ছিন্নপত্রের চিঠির পাতায়। তেমনভাবেই রবীন্দ্রনা কবিতার অস্পষ্ট বা স্পষ্ট আভাস বা ছায়াও পড়েছে এই ছিন্ন পত্রেই। অনেক দৃশ্য বাঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে কবিতার ক্ষণপ্রতিমা।

৯২ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে। লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।"

—এ জন্যই এ যুগে অনন্য ছোটগল্পের সৃষ্টি, যার সম্বন্ধে অন্যত্র নিজেই বলেছেন—

"সাদাজপুরে যখন আসতুম চোখে পড়তো গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম তারই প্রকাশ 'পোস্টমাস্টার' সমাপ্তি, ছুটি প্রভৃতি গল্পে।"

২১ সংখ্যক চিঠিতে সাদাজপুরের পোস্টমাস্টারের উল্লেখ পাই। কুঠিবাড়ীর একতলাতেই পোস্ট অফিস। তার পোস্টমাস্টার প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসেন এবং তার গল্প শুনতে কবির বেশ লাগে। এই পোস্টমাস্টারই যে তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রধান চরিত্র তা ৫৯ সংখ্যক পত্রে জানাচ্ছেন—

"এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন 'হিতবাদী'তে বেরোল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।"

রবীন্দ্র গবেষকরাত 'মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে এই পোস্টমাস্টারকে চিহ্নিত করেছেন। আর বালিকা রতনের চরিত্র সম্পূর্ণ চোখে দেখা না হলেও সম্ভবত বাস্তব ছিল। পল্লীবাংলার সরল অনাথা কোনো বালিকাকে দেখে কবি একে কল্পনা করেছিলেন মনে হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প ছুটি। ডাঙার উপর মস্ত নৌকোর পড়ে থাকা মাস্তুল ঘিরে গ্রামের ছেলেদের খেলার যে ছবি ২০ নং পত্রে দেখি, তাই-ই পরে 'ছুটি' গল্পে 'প্রকান্ড এক কাঠের গুড়ি' ঠেলার মধ্যে রূপ লাভ করেছে। এই দলের একটি ছেলেই যে 'ছুটির ফটিক তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র বলেছেন—

"The Character of the boy in my story "Chhuti", was suggested by a boy in a village. I then imagined what would happen to this boy if he were taken to Calcutta for his education and made to live in an unsympathetic atmosphere of a family with his aunt. That was the background."

এ গল্পের 'ফটিক' যে রবীন্দ্রনাথের দেখা দ্বারিকপুরের চক্রবর্তীদের ছেলে হারানচন্দ্র-একথাও রবীন্দ্রগবেষকরা নির্দেশ করেছেন। এভাবেই বাস্তব চরিত্রের ভিত্তিতে গল্পগুচ্ছের বহু চরিত্র গড়ে উঠেছে।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সমাপ্তি' গল্পটি যে বীজাকারে সুপ্ত ছিল পত্রসংখ্যা ৩০-এর মধ্যে তা অনুসন্ধানী পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। সাজাদপুরের ঘাটে লেগে থাকা নৌকোর ধারে অনেকের ভীড়ে একটি মেয়েকে কবি বিশেষ ভাবে মনে রেখেছেন।

"মুখকানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে।" পাশাপাশি মনে পড়বে 'সমাপ্তি' গল্পের মৃণ্ময়ীকে যে 'দেখিতে শ্যামবর্ণ, ছোট কোঁকড়া চুল, ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব।"

সাজাদপুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটিই কবির মনোলোকে বাসা বেঁধেছিল। মাটির কাছাকাছি প্রকৃতি লালিতা এই কিশোরী তাই মৃণ্ময়ী নামেই সার্থক অভিধা খুঁজে পেয়েছে।

'মেঘ ও রৌদ্রে'র গিরিবালা স্বনামে সোজাসুজি দেখা দিয়েছে কবির চিঠিতে (পত্র সংখ্যা ১০৬)

'আজ সকাল বেলায় গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনা রাজ্যে বতারয়ণ করা গেছে।" এই গিরিবালাই কয়েকমাস পরে রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের কিশোরী নায়িকা যার জীবনের মেঘ ও রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি গল্পের মধ্যে জীবন রহস্য গ্রথিত হয়ে আছে। এই গল্পের ভাষা ও সংশ্লিষ্ট চিঠির ভাষাও প্রায় অভিন্ন।

এছাড়া অতিথি, একরাত্রি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি গল্পগুলির বীজও অস্পষ্টভাবে ছিন্নপত্রর অনুভবে ধরা পড়েছে।

১১৯ নং চিঠিতে লিখেছেন যে এমন সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। এই নির্জন দুপুরেই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশ, ঐশ্বর্যময় ভয়ভীষণ প্রাসাদ, মানুষের হাসিকান্না আশা আকাঙ্খা নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত কাল।

"আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা"।

—রবীন্দ্রনাথের নিজের এই কথার আলোকেই স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে ছিন্নপত্রের মধ্যে তাঁর অসামান্য ছোটগল্প রচনার কথা।

শুধু গল্পই নয়) তাঁর কয়েকটি কবিতাও এই ছিন্নপত্রের চিঠির টুকরোতে যেন বন্দী হয়ে আছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত ঘটনার ছায়াপাত যেমন ঘটেছে, তেমনই আছে কবিমনের অন্তর্লীন অনুভব ও তাত্ত্বিকতা। ১৪৮ নং চিঠিতে সাজাদপুরের এক খানসামার উল্লেখ দেখি যার কন্যার মৃত্যুর কথা কবি লিখেছেন। খানসামাটি একদিন কিছু দেরী করে আসায় রবীন্দ্রনাথ তার উপর রাগ করাতে সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে জানায় যে আগের দিন রাত্রে তার ছোট মেয়েটি মারা গেছে। এরপর সে ঝাড়ন কাঁধে নিত্যকর্মে ব্যাপৃত হল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে কাজের খাতিরে ব্যি—গত সুখদুঃখকে দূরে রেখে যথোচিত কর্তব্য করে যেতে হয়।

এই ঘটনার প্রতিচ্ছায়া নিয়ে কবি পরে 'চৈতালি' কাব্যের 'কর্ম' কবিতাটি লেখেন।

আবার পত্র সংখ্যা ৮৮-তে শিলাইদহ থেকে লেখা চিঠিতে চরের ওপর নদীর জল, নৌকো-বোঝাই ধান কেটে চাষীদের আনাগোনার উল্লেখ পাই—যা অভ্রান্ত মনে পড়ায় সোনারতরী কবিতাকে

"রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা"

আবার ১০৮ সংখ্যক চিঠিতে পাবনা শহরের খেয়াঘাটের মিশ্র কলরবের মধ্য থেকে অনন্ত মানবপ্রবাহের ধারা অনুভব করে উল্লেখ করেছেন তাঁর শৈশব সঙ্গীত' কবিতার কথা।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব'-র মর্ত্যমাধুরী ও বন্ধনের কথা মনে পড়ে যায় ছিন্নপত্রের ৬৪ নং চিঠি পড়লে, যেখানে পৃথিবীকে মমতাময়ী জননীর সঙ্গে তুলনা করে তার স্নেহাসক্তির বেদনামাধুরীকে বর্ণনা করেছেন। আবার ৬৭ নং চিঠিতে পৃথিবীকে অনেকদিনের ভালোবাসার লোকের মতো চিরনতুন বলে বর্ণনা করে লিখেছেন এর সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরব্যাপী সম্পর্ক আছে। পাঠকের মনে পড়ে যায় তাঁ 'সোনারতরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতার কথা—

"আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের"

এভাবেই ছিন্নপত্রের বিভিন্ন পত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারকে অঙ্কুরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সময় কবি গল্পগুচ্ছের গল্প এবং 'সোনারতরী' কবিতা লিখে চলেছিলেন; সমান্তরালভাবে লিখিত হচ্ছিল ইন্দিরাদেবীর কাছে

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি। বিবিধ রচনার ভাবসাযুজ্য এক বলেই তিনে মিলে রবীন্দ্র মনোলোকের পরিপূর্ণ ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ স্বরূপে ছিন্নপত্রাবলীতে ধরা পড়েন। এখানেই এর অনন্যতা।

1.2.5 ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত সৌন্দর্যচেতনা

সৌন্দর্যব্যাকুলতা রোম্যান্টিক কবিমানসের বিসেষ লক্ষণ। শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাই বিশিষ্ট সৌন্দর্যদর্শন ও নান্দনিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে।

তাঁর কাব্য সাধনার স্তরে স্তরে সৌন্দর্য চেতনা অভিব্যক্ত। মানসীতে যে সৌন্দর্যবিলাসের দেখা মেলে, সোনারতরীতে বিশ্বসৌন্দর্য রহস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং চিত্রায় তা এক সৌন্দর্য তত্ত্বে পরিণতি লাভ করে। বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্যসত্তাই 'চিত্রা'য় আভাসিত। বর্হিজগতে যে সৌন্দর্য বিচিত্র বহুধা বিস্তৃত, চঞ্চল— কবির অন্তরে সে-ই অদ্বিতীয়, অখণ্ড, স্থির।

'সোনারতরী' পর্বে শিলাইদহে ছিননপত্রর চিঠিগুলি লেখা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ছিন্নপত্রাবলীর প্রথম পত্র লেখা হয়েছিল ১৮৮৫ সালে এবং শেষ পত্র লেখা হয় ১৮৯৫ সালে। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) এবং 'চিত্রা' ১৮৯৬ সালে রচিত। সুতরাং এই পুরোপর্বে ছিন্নপত্রাবলী লিখিত।

রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে ছিন্নপত্রাবলীর তাৎপর্য অসামান্য। এর চিঠিগুলির মধ্যে কবি, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, প্রকৃতিপ্রেমিক, জমিদার, ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ও সৌন্দর্য মিস্টিক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই।

প্রকৃতির উন্মুক্ত উদারতায় যেন অসীমের মধ্যে অবগাহন করলেন। পার্থিব সৌন্দর্যের বস্তুরূপের থেকে অপার্থিব বস্তুরূপের সন্ধানে ব্রতী হলেন। প্রধানত প্রকৃতির বিচিত্রলীলারসে নিমগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত সৌন্দর্যসুধা পান করেছেন পদ্মাবাহিত এই পর্বে।

'ছিন্নপত্রাবলী'র এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা প্রবল।"

পদ্মাবাসের এই পর্বে কবির মনোলোকে যেমন ঘটেছে মানুষের প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক তেমনই জেগেছে সৌন্দর্যতৃষ্ণা। এই সৌন্দর্য জাগতিক, পার্থিব-কিন্তু তার থেকেই অপার্থিব অসীমতায় তার মুক্তি ঘটেছে।

রোম্যান্টিক কবি মানস সৌন্দর্যপিয়াসী। যা কিছু সত্য তা-ই তাঁর কাছে সুন্দর। এই সত্য প্রকৃতিজ বাস্তব আর প্রকৃতিজ বলেই তা' সত্য ও সুন্দর। ইংরেজ কবি বলেছেন "Beauty is Truth"। রবীন্দ্রনাথও সত্যজাত মঙ্গলসত্তাকেই অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তা বলেছেন।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য তা রবীন্দ্রনাথ দুচোখ দিয়ে এবং হৃদয়ভরে অনুভব করেছেন পদ্মার উপর

বোটে সঞ্চয়মান কবি প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণিমা ও মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ নির্জনতায় শুনেছেন নৈঃশব্দের গান। কখনো বা নিবিড় নীরব নিশীথিনীতে ভেসে গেছেন অবারিত জ্যোৎস্নালোকে। প্রকৃতির বর্ণবহুল সৌন্দর্য কবিচিত্তে এসেছে অনির্বচনীয় আনন্দ।

রোম্যান্টিকতার লক্ষণ সাধারণ অসাধারণত্ব আবিষ্কার, চেনা বস্তুতে অচেনা মাধুরী অনুসন্ধান, সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি। এই আনন্দ বিস্ময় রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবদান। কবি তাঁর গানে উচ্চারণ করেন—

"ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি
বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে
উঠেছে প্রাণ মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ"।

—এই বিস্ময়রস ছিন্নপত্রের সৌন্দর্যদর্শনে অন্বিত। একটি পত্রে লিখেছেন পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের যে আত্মীয়তা তা' নির্জনে প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করতে হয়। তখনই সৌন্দর্যের অপার রহস্য তার মধ্যে ধরা পড়ে।

ছিন্নপত্রাবলীর কয়েকটি পত্রে জ্যোৎস্নারাতের বর্ণনা আছে। এই নিবিড় পূর্ণিমা তিথি কবিকে নিয়ে চলে রোম্যান্সের জগতে, সৌন্দর্যের অনন্ত লীলাভূমিতে। সমকালে লিখিত 'চিত্রা' কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতায় সেই রহস্যের আভাস। কবি বলেছেন সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলায় যখন একাকী বই পড়ায় তিনি নিমগ্ন, তখন জানতেই পারেননি আলোকিত জ্যোৎস্নারাত্রির অনবদ্য রূপ। আলো নেবানো মাত্রই পূর্ণিমা রজনী তাঁর মনোলোকে আলো জ্বালালো।

— "হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা
অনন্তের অনন্তশায়িনী, নাহি সীমা
তব রহস্যের।
আমি গৃহকোণে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে
তোমারি সন্ধানে।
কী জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী"

এই কবিতা রচনার কয়েকদিন পরে লেখা চিঠিতে পাই— এক সন্ধ্যায় কবিতা, সৌন্দর্য আর্ট নিয়ে সমালোচনার এক গ্রন্থপাঠে তিনি নিমগ্ন ছিলেন। রাত্রি অনেক হওয়াতে বাতি নিবিয়ে 'দেয়ামাত্রেই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা

জানালা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়লো।' "বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটা" যেন কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে। এমনই সৌন্দর্যসুধারস পানেই লেখা হয়—

"নীরব রজনী দেখা মগ্ন জোছনায়"

—আলোকিত জ্যোৎস্নার মোহময়ী রূপের সুধাপানই কেবল তিনি করেন না, মর্ত্যধুলির তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুতেও সন্ধান করেছেন সৌন্দর্যের। ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রক্তিম বর্ণিলতায় যে সৌন্দর্য, তাকে কবি "জগৎসংসারের আশ্চর্য মহৎ ঘটনা" বলে বর্ণনা করেছেন। (পত্র সংখ্যা ১০)

আবার কখনো পত্রে (১৪ নং) গোধূলির অসাধারণ ছবি এঁকেছেন।

"মনে হল ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনারা রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়; আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিন্দুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে।"

আসন্ন সন্ধ্যার এহ বধূমূর্তি কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে অনন্য রূপলোক। প্রকৃতির সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন অসাধারণ সৌন্দর্য। তাঁর Beauty mystic রূপের অনন্য প্রকাশ এভাবে বারবার ছিন্নপত্রে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর কথা দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার অনন্য ছবি এঁকে চলেছেন।

আর একটি চিঠিতে (৫২ নং) পাই—

"রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগবধূদের
ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মানিকের মতো
সমুদ্রের জল খসে পড়ে যাচ্ছে.....অনন্ত দিনরাত্রির
মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া
পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখেনি।"

আসলে প্রকৃতির উন্মুক্ত উদার বিশ্বলীলা প্রাণ্যনেব প্রত্যক্ষ দর্শনে কবিচিত্তে আনন্দরসে ভরে উঠেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য সেই আনন্দরসে মিলেছিল। "এই যে পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে আছে, ওকে আমি ভালোবাসি।" আবার কখনো বা পদ্মার জলধারার মধ্যে খুঁজে পান নিত্যনবায়মানতা সীমাবদ্ধ দৃষ্টি যখন প্রকৃতির অসীমতায় মুক্তি পায়। তখনই আনন্দ রসের জন্ম। শিলাইদহ-সাজাদপুরে এসে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৌন্দর্যচেতনা বিকশিত হয়েছিল। সে সৌন্দর্য সীমার বাঁধন ছেড়ে অসীমে পরিব্যাপ্ত— যাকে কবি বলেছেন "আধ্যাত্মিকজাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী"। কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় যা গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে নয়, প্রকৃতির পাঠশালাতে রবিজীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। লৌকিক সৌন্দর্যের কাব্য 'চিত্রা'র পূর্ণিমা কবিতাতে সেই সৌন্দর্যরহস্যের কথাই প্রকাশিত। কবির সৌন্দর্য ভাবনার আদি উৎস হিসেবে ছিন্নপত্রাবলীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে 'বিশ্বব্যাপী সত্য' বলে মনে করতেন। তাই সীমাবদ্ধ সৌন্দর্যরূপকে নয়, তিনি দেখতে চেয়েছেন তার অনন্ত গভীরতা। এই সৌন্দর্য নিসর্গলোকে নিসর্গ প্রতিমায়। সৌন্দর্যসত্তার অন্বেষণে কবির চিরযাত্রা।

রূপ অরূপে মেশামেশি সৌন্দর্যভাবনা ছিন্নপত্রে পাই। বহিপ্রর্কতির সৌন্দর্যকে অন্তরালোকে অনুভব করে ছিন্নপত্রের কবি তাকে সঞ্চারিত করেছেন চেতনার অন্তর্লোকে। কবির অন্তজীবন ছিন্নপত্রে ধরা পড়েছে তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বও এরই চিঠিতে ধরে রাখা আছে।

1.2.6 অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় ছিন্নপত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। 'ছিন্নপত্রে' প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমীর পরিচয় দিন।

৩। রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যমমতা কিভাবে 'ছিন্নপত্রে' প্রকাশ পেয়েছে।

৪। 'ছিন্নপত্র' অবলম্বনে রবীন্দ্রমানসের সৌন্দর্য ভাবনার পরিচয় দিন।

৫। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্প ও কবিতা ছিন্নপত্রের চিঠিতে বীজাকারে সুপ্ত ছিল—আলোচনা করুন।

1.2.7 গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা— ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

২। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ—

৩। রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি— ডঃ নন্দদুলাল বণিক

৪। ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ— হীরেন চট্টোপাধ্যায়

একক 2 ☐ সোনার তরী

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা
2.2 পাঠ ও আলোচনা
2.2.1 সোনার তরী— লৌকিক প্রেমের কাব্য
2.2.2 সোনার তরী কাব্যে প্রতিফলিত মর্তপ্রীতি
2.2.3 সোনার তরী নামকরণ ঃ প্রথম ও শেষ কবিতা
2.2.4 মানসসুন্দরী
2.2.5 বসুন্ধরা
2.2.6 সমুদ্রের প্রতি
2.2.7 পরশপাথর
2.2.8 দুই পাখি
2.2.9 বৈষ্ণব কবিতা
2.2.10 যেতে নাহি দিব
2.2.11 ঝুলন
2.2.12 নিরুদ্দেশযাত্রা
2.2.13 অনুশীলনী
2.2.14 গ্রন্থপঞ্জি

2.1 প্রস্তাবনা

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'সোনার তরী' কাব্যের স্মরণীয় প্রকাশ। এই কাব্য থেকেই শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈভব। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের যোগসাধনের এই কাব্য রচনাকালেই মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে তাঁর মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।

2.2.1 সোনার তরী ঃ লৌকিক প্রেমের কাব্য

রবীন্দ্রকাব্যধারায় 'সোনার তরী' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এ কাব্যের পকাশ। এই কাব্য থেকেই শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি বৈচিত্র্য। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য 'সোনারতরী'। এর সূচনায় কবি বলেছেন—

"মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।..... আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তন—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

জমিদারির কাজে পদ্মাবিধৌত বঙ্গে শিলাইদহ-পতিসর পাবনা অঞ্চলে কবি এসময় 'পদ্মা' নামক বোটে করে ভ্রাম্যমান। বাংলাদেশের উদার প্রান্তর, অসীম অম্বর সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বরণ চাতুরী— সোনার তরী পর্বের লেখায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রালীর চিঠিতে যে নিসর্গ মাধুরী, মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ, সমকালীন গল্পগুচ্ছে মানুষের যে নিবিড় পরিচয়ের আভাস, তারই ছায়াপাত ঘটেছে 'সোনার তরী' কাব্যের কবিতাগুচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের বন্ধনের কথা, আত্মিক যোগের কথা 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধ্বনিত। এছাড়া একাব্যেই রয়েছে মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব' সীমা-অসীমার তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখি', চির জীবনসাধনা 'পরশপাথর', অসামান্য মৃত্যু চেতনা ঋদ্ধি 'প্রতীক্ষা' ও 'ঝুলন' এবং কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশযাত্রা'। এই সঙ্গে রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমকবিতা 'দুর্বোধ', 'লজ্জা', হৃদয় যমুনা' এবং কবির আজন্মসাধনার ধন 'মানসসুন্দরী'। সমালোচকের ভাষায় "মানসী'তে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী 'মানসসুন্দরী'-তে তারই প্রতিমা রচিত হল।" বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির 'মানবসুন্দরী'। এই মানসপ্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, তাঁর আজন্ম-সাধনার ধন। এঁকে কেউ বলেছেন সৌন্দর্য দেবতা কেউ বা কাব্য দেবী, কেউ বা মানসপ্রতিমা। এ কবিতা কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী। কবিতাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। কবি শেলীর 'হিম টু ইনটেলুকচিয়াল বিউটি'র কথা মনে আসে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন'- কবিতাতেও অন্তরতমা আপন মানলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কথোপকথন উচ্চারিত।

'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন উপদেশশালায় 'তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ('সোনারতরী' কবিতা পাঠে দ্রষ্টব্য)

এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনারতরী' রচিত হ'য়েছিল। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশযাত্রা' রচিত হয়েছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসে। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দুটিতেই তরণীর 'নেয়ে' আছে। তবে 'সোনার তরী'-তে সে আছে আড়ালে, স্মৃতিবিস্মৃতির আলো আঁধারিতে কারণ কবির মনে হ'য়েছে "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।" নিরুদ্দেশযাত্রায় সে কবির পথনির্দেশিকা। অজানা সুন্দরী। রোম্যান্টিক কবিমানসের অকূলযাত্রাই এখানে সূচিত। 'সোনারতরী' লৌকিক প্রেমের কাব্য বলে পরিচিত। কবি সুগভীর প্রীতির বন্ধনে ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করছেন। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'অক্ষমা', 'আকাশের চাঁদ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দরিদ্রা' প্রভৃতি কবিতায় নানাভাবে এই মর্ত্যপ্রীতি সঞ্চারিত। 'বসুন্ধরা' কবিতায় একদিকে বসুন্ধরা, অন্যদিকে মানুষের মুখপাত্র কবি। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার একদিকে বিদায়কামী পিতা অন্যদিকে তার শিশুকন্যা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও এদের অন্তর্লীন সুর এক। দুটিতেই লৌকিক প্রেম, মর্তপ্রেমের মাধুরী প্রকাশিত। লৌকিক জীবনের চরমতম সত্য— বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে সবচেয়ে গভীর কথা 'যেতে নাহি দিব'। এই ভালোবাসার বন্ধন ও

আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনায় 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে করুণ লাবণ্যের মত ছড়িয়ে আছে। মর্ত্যপ্রীতির অনন্য নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে 'আকাশের চাঁদ', 'পরশপাথর' কবিতায়। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা, ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথরের সন্ধানে ঘুরে মরে— জীবনের মধ্যে লুকানো অমৃতপরশের সন্ধান পায়না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্তমাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিক্রমায় শেষ হ'য়ে যায়।

2.2.2 সোনার তরী কাব্যে প্রতিফলিত কবির মর্ত্যপ্রীতি

সোনার তরী কাব্যকে লৌকিক প্রেমের কাব্য বলা হয়। লৌকিক প্রেম সেই মনোভাব যা মানুষ আর একটি মানুষের প্রতি অনুভব করে থাকে। এটিই লৌকিক প্রেমের ঘনীভূত রূপ। কিন্তু এই প্রেম যখন দেশ ও কালের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায় তখনই তা লৌকিক সীমা অতিক্রমী এক অসীম অনুভবে বিলীন হয়। সোনার তরী কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে কবির মানবপ্রীতি, মর্ত্যপ্রীতি এক হয়ে মহত্তর এক অনুভূতিতে মুক্তি পেয়েছে। মানুষের প্রেম যখন ব্যক্তিপ্রেমের সীমা ছাড়িয়ে দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হ'য়ে যায় তখন তাকে অনেক সময় দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। 'বসুন্ধরা' কবিতাটিকে এজন্যই অনেকে অবাস্তব মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে মর্ত্যধারণীর প্রতি কবিচিত্তের অনন্ত আসক্তি, জন্মান্তরের বন্ধন-অনুভব এ বিতাটিকে এক সুগভীর তাৎপর্য দান করেছে। বসুন্ধরার প্রতি মিলনে ও বিচ্ছেদে মানুষের যে দুর্নিবার আকর্ষণ তা চিরসত্য। মর্তাগুলির ঘাসে ঘাসে যে কবিচিত্তের মুগ্ধ, ধরণী মায়ের শ্যামলাঞ্চলে যে স্নেহের ছায়া তা কবিতাটিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। সোনারতরী রচনার সমকালে লিখিত ছিন্নপত্রাবলীতেও কবিমানসের এই মর্ত্যপ্রীতির মধুরিমা উচ্ছলিত ধারায় প্রবাহিত। এই সময় মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে তাঁর মনকে জাগিয়ে রেখেছিল বলে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন।

সেই পরিচয় থেকেই মর্তামানুষ ও সামগ্রিক বসুন্ধরা কবিকে আকর্ষণ করেছে। সুগভীর প্রীতির বন্ধনে তিনি ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করেছেন। 'বসুন্ধরা' কবিতায় জন্মান্তরের এই বন্ধনকে যেমন প্রকাশ করেছেন, 'যেতে নাহি দিব', 'অক্ষমা', 'আকাশের চাঁদ,' 'দরিদ্রা' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাবলীতেও নানারূপে নানা ভাবে এই মর্ত্যপ্রীতিকে সঞ্চারিত করেছেন। এ কবিতাগুলির ভাববস্তু এক। 'বসুন্ধরা' ও 'যেতে নাহি দিব' কবিতাদুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও এদের অন্তর্লীন সুর একই। দুটিতেই মৌথিক প্রেম, মর্ত্যপ্রেমের অমলিন মাধুরী প্রকাশিত। লৌকিক জীবনের চরমতম সত্য— বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু।' যেতে নাহি দিব' এই উচ্চারণ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কিন্তু মানুষে মানুষে এই ভালোবাসার বন্ধন ও আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে লগ্নিত।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ক্ষণকালীন, সব স্নেহ-প্রেমেই অনিতা এই বোধ আমাদের চিত্তে বেদনা সঞ্চার করে। মানুষ এই ক্ষণকালীন চিরকালীন করে রাখতে চায়। সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি যা পার্থিব প্রেমের বিষয়—তা-ই অনুভব গভীরতার অনন্তে মুদ্রিত হ'য়ে থাকে। মানুষের চিরন্তন বাসনা ও বেদনা—

"আমি ভালোবাসি যারে

"সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?"

নিখিল মানবাত্মার এই অনন্ত আকর্ষণ মর্ত্যপ্রেমেরই একরূপ। ব্যক্তিগত প্রেম এভাবেই কখন বিশ্বচরাচরে নিখিল মানবাত্মার এই অনন্ত আকর্ষণ সম্পর্ক মৃত্যুর দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা ছিন্ন হ'য়ে যায়, তবু প্রেম পরাজয় মানে না। নিজের স্মৃতির মধ্যে প্রিয়জন চিরজীবী হ'য়ে থাকে। মরণপীড়িত সেই চিরজীবী প্রেমের কথাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় উচ্চারিত, যা মানবপ্রেমের ব্যক্তিক উৎস থেকে উৎসারিত হ'য়ে মর্ত্যপ্রীতির অনন্ত ভাবনায় মুক্তি পেয়েছে।

একদিকে কবির চার বৎসরের শিশুকন্যার অবুঝ বেদনা, অন্যদিকে ধরিত্রী জননীর চিরন্তন বেদনা কবিতাটিতে একই সঙ্গে অন্বিত। ছিন্নপত্রে দেখি—

> "পৃথিবীর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ
> লেগে আছে যেন এর মনে হ'চ্ছে..... আমি
> ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি না; জন্ম
> দিই, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনে।"

নিজ শিশু কন্যার বেদনাকে কবি এভাবেই মর্ত্যজননীর বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে দেন। এভাবেই মর্ত্যমাধুরী মর্ত্যপ্রীতি তাঁর কবিতার অবয়বে প্রাণসঞ্চার করে।

মর্ত্যপ্রীতির নিদর্শন 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে প্রতিফলিত। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা। লৌকিক জীবন সম্বন্ধে তার কৌতূহল বা আগ্রহ নেই। সে আকাশের চাঁদকে পেতে চায়। ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথরে সন্ধানে ঘুরে মরে জীবনের মধ্যে লুকানো অমৃত পরশের সন্ধান পায় না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্ত্য মাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিক্রমায় শেষ হয়ে যায়। জীবন অনিত্য তবু অবিস্মরণীয়, তা ভঙ্গুর তবু সুন্দর—এই জীবনতৃষ্ণাকে ভুলে অলৌকিক স্বর্গ কল্পনায় মানুষ জীবনকে ভুলে থাকে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ভালোবেসে এর সুখদুঃখের দোলায় দুলতে চান, সেখানেই তিনি খুঁজে পান জীবনের সার্থকতা।

এই বোধ থেকেই পরবর্তী 'চিত্রা' কাব্যের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটি রচিত হ'য়েছিল। মানুষের প্রচলিত সংস্কারে স্বর্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যাবতীয় কামনার পীঠস্থান। অন্যদিকে পৃথিবী দরিদ্রা, মানুষের সমস্ত কামনা পূরণের ক্ষমতা তার নেই। তাই স্বর্গই মানুষের আকাঙ্খিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে দরিদ্রা অক্ষমা পৃথিবী অধিকতর রমনার

ধন, কারণ তার মধ্যে আছে হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ। স্বর্গের মধ্যে কোথায় যেন হৃদয়হীন উদাসীনতা যা কবিকে বিমুখ করেছে। তাই তিনিই বলতে পারেন—

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।"

'অক্ষমা' কবিতায় দরিদ্রজননীর সঙ্গে সন্তানের স্নেহনিবিড় সম্পর্ক বা 'দরিদ্রজননীর সঙ্গে সন্তানের স্নেহনিবিড় সম্পর্ক বা 'দরিদ্রা' কবিতায় রিক্ত ধরণীর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে কবির মর্ত্যপ্রীতিই রূপ লাভ করেছে। অক্ষমা জননীর কাছে পরিপূর্ণ প্রত্যাশার অপূর্ণতা সত্ত্বেও যেমন সুগভীর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, এই ধূলিমলিন ধরিত্রীমাতার কাছে মানবসমাজও তেমনি আজন্ম-আমৃত্যু ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ। আমার পৃথিবী দরিদ্রা বলেই সে আমার এত প্রিয়, তার মুখের 'সুদূরব্যাপী' বিষাদ-এর মধ্যেই রয়েছে অসীম মমতার স্পর্শ। তাই স্বর্গসুখের ভোগঐশ্বর্যে নয়, আমার দারিদ্রা জননীর অক্ষম বেদনার স্নেহবন্ধনকেই মানবের চিরনির্ভরতা— এই বোধে সোনার তরীর কবিতাগুলির মর্ত্যপ্রীতির সুধারস উচ্ছলিত।

মানবজীবন ঘিরে প্রতিনিমেষের ভালোবাসাগুলি যেন ফুলের মত ফুটে আছে, তাদের স্নেহপ্রীতি সৌরভে এ জীবনে মধুময়। 'যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন'— এই বোধে উজ্জীবিত কবি তাই উচ্চারণ করেন—

"শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই
বারবার এ জীবন"

আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর, মধুর প্রীতিস্নিগ্ধ জীবনের মমতাঘেরা ক্ষণমুহূর্ত। বিশ্বব্যাপী যে ভালোবাসার লীলা নিত্য গতিশীল, পৃথিবীর মধ্যে সেই সৌন্দর্য, সেই প্রেম, সেই অনুরাগ অনুভব করার নামই জীবন।

কবির এই মর্ত্যমাধুরীর নির্যাস 'সোনার তরী' কাব্যের কবিতাগুলির অবয়বে প্রাণসঞ্চার করেছে। এখানেই তাঁর বিশিষ্ট মানবীয় প্রেমের ও লৌকিক সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

2.2.3 'সোনার তরী' নামকরণ এবং প্রথম ও শেষ কবিতা

সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী ১২৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নিজের কথায়—

"মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।.....বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

পদ্মার বুকে বোটে সঞ্চারমান কবির প্রত্যক্ষ জীবনানুভূতি কেমন করে বিশ্বানুভূতিতে মিলে মিশে গেছে— এ কাব্যে তাই দেখেছি। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য 'সোনার তরী'।

এর প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ

'শান্তিনিকেতন উপদেশমালায়' তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় বলেছেন— "সোনার তরী ' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত। ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। ..... তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল, তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতেপারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ'— তখন সংসার বলে— "তোমার জন্য জায়গা কোথায়?"

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে; সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাইছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।"

কবি মহাকালকেই সোনার তরীর নাবিক বা 'নেয়ে' বলেছেন, যে অনন্ত কাল ধরে প্রাণপ্রবাহ ও কর্মভারকে নিয়ে চলেছে। কালস্রোত কবির সোনার ধান— কবিতার অর্ঘ্য, সৃষ্টি সম্ভারকে নৌকো বোঝাই করে নিয়ে গেছে। তাঁর সাধনার সোনার ফসল মহাকালের সোনার তরীতে বোঝাই হ'য়েছে। এই সোনার তরীতে কবি-জীবনের ফসল ভরা। কবি যেন নিজেও মহাকালের তরণীতে উঠতে চান, কিন্তু সেখানে তাঁর ঠাঁই মেলে না কারণ তাঁর আরো অনেক ফসল ফলানো বাকী।

"যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনারতরী"— কিন্তু জীবন ও সাধনা সেখানে শেষ নয়; আরো নতুন ফসল ফলবে, তাই কবি শূন্য নদীর তীরে একা বসে রইলেন, আবার সোনার তরীর ফসল তিনি ফলাবেন। তাঁর জীবনের সাধনা ও সৃষ্টি অনন্ত কালপ্রবাহে চির প্রবহমান।

'সোনার তরী' নাম কবিতার এই তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা কবির দেওয়া ব্যাখ্যাতেই পরিচিত। এই নামকরণটি সার্থক, কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি বিচ্ছুরিত এই কাব্যে তাঁর মানসলোকের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই ধরা আছে। সোনার তরীতে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে কবির সৃষ্টিসম্ভার পরিপূর্ণ। মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এই কাব্যে ধ্বনিত।

মর্ত্যপ্রীতি ও বন্ধনের তাত্ত্বিকরূপ 'বসুন্ধরা', মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব', সীমা-অসীমের তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখি', চির অন্বেষাময় জীবনসাধনা 'পরশপাথর' অসামান্য মৃত্যুচেতনাঋদ্ধ 'ঝুলন' এবং মানবজীবনের অনন্ত সাধনা ও চিরন্তন যাত্রার রূপক 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'—সব কবিতাই সোনার তরীর স্বর্ণালী শস্য, যার দ্বারা মহাকালের তরণী সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। ভরা পদ্মার উপরকার বাদলদিনের ছবি স্বাভাবিকভাবেই 'সোনার তরী' নামকরণে সার্থক হয়ে উঠেছে। ভার বর্ষার অপরাহ্নে পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের নৌকো পারপারের এই রূপচিত্র কিন্তু কবিতারূপে প্রকাশ পেয়েছিল বসন্তকালে— ফাল্গুন মাসে। ভরা বসন্তে রচিত ভরা বর্ষার এই কবিতা সাহিত্যে অপরূপ সৃষ্টি।

কবির নিজের কথায় এ কবিতা সেই জাতের যা মুক্তদ্বার অনন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে রচিত তাই ভরা বসন্তে ভরা বর্ষার ছবি আঁকা হয়, আসলে কবির মনোভূমিই কবিতার আসল পটভূমি, 'সোনার তরী' তাই সার্থকনামা, কারণ কবির জীবনফসল এই তরীতেই পূর্ণ হ'য়েছে।

এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী' রচিত হয়েছিল ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ কবিতা

'নিরুদ্দেশযাত্রা' রচিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। দুটি কবিতার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দু'টিতেই তরণীর 'নেয়ে' আছে; তবে সোনার তরীতে সে আড়ালে আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়' সে কবির পথনির্দেশিকা অজানা সুন্দরী।

সোনার তরীর প্রথম কবিতার 'গান গেয়ে তরী বেয়ে যে আসে পারে', কবির মনে হয়েছিল সে যেন তাঁর চেনা। কিন্তু এই আধো রহস্য উন্মোচিত হয়নি—তাঁর সোনার ফসল নিয়ে সে চলে গেছে। নিরুদ্দেশ যাত্রায় কিন্তু তাঁর জীবন-দেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, যিনি কবির কাব্যপ্রেরণা, তিনিই তাঁকে চালিত করে নিয়ে চলেছেন অনন্ত যাত্রায়।

কবি প্রশ্ন করেন—

"আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী
বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?"

সুতরাং সোনার তরীর সঙ্গে এই কবিতার অভ্রান্ত যোগ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। প্রথম কবিতার সেই স্বর্ণতরীই শেষবেলায় অপরিচিতা সুন্দরীর নির্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে সঞ্চরমান। 'সোনার তরী' কবিতায় কবির জীবনের প্রভাত-বেলার শ্রী ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। জীবনের পথে কবির সৃষ্টি মহাকালের তরণীতে পূর্ণ হয়ে এগিয়ে চলেছে। নিরুদ্দেশযাত্রা' নামেই কিন্তু এক অনন্ত অফুরান যাত্রাপথের কথা আভাসিত। রোম্যান্টিক কবিমানসের একুল যাত্রাই এখানে সূচিত। কবি তাঁর মানসলক্ষ্মী কাব্যপ্রতিমার উদ্দেশ্যে চিরযাত্রা পথে সঞ্চরমান। এই অন্বেষা বা Quesi-এর শেষ নেই; প্রাপ্তি বা Conquest কখনোই ঘটে না। তাই কবির যাত্রা চিরকালের নিরুদ্দেশ যাত্রা। তাঁর জীবনদেবতা কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে জীবন থেকে জীবনের পথে অন্ত রহস্য যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে চলেন।

"দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে"

—মনে হয় এই অস্তগমন শেষ কথা, কিন্তু এই অস্ত তো অপর দিকের উদয়। তাই শেষের মধ্যেই আছে অশেষের ব্যঞ্জনা। পরিণতি, পরিতৃপ্তি, পরিশেষের পথে কবির এই যাত্রা আসলে অশেষ, দিকচিহ্নহীন। তাই কবি তাঁর জীবনতরণীর কর্ণধারকে অধরা রহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী রূপে দেখেছেন। আমাদের চলার মধ্যে রয়েছে সীমার বন্ধন থেকে মুক্তির সংকেত। চেনা কূলের সীমানা ছাড়িয়ে সীমাতীত, রূপাতীত জীবনাতীতের সন্ধানে মানবের চির অভিযাত্রা। এ যাত্রাই তাই নিরুদ্দেশ। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি অন্যত্র ব্যক্ত করেছেন— " এই যাত্রা..... সে কেবল অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, আরোর দিকে এই অভিসার যাত্রা প্রলয়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে"। এই অধরা রহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে দেখে মনে পড়ে যায় টেনিসনের কবিতার চরণ—

"Her face was evermore unseen
And fixt upon the far sea line
But each man murmured O my Queen
I follow till I make thee mine"

কবি তাঁর সাধনার পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন, কোথায় শেষ তিনি নিজেও জানেন না; অধরা কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে অনন্ত যাত্রাপথে অভিসার করান। চির অতৃপ্তির পথে চির অন্বেষার এই অকূল অভিসারই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

'সোনার তরী'র প্রথম কবিতায়কবির যাঁকে মনে হয়েছিল 'চিনি উহারে'-তিনিই ক্রমে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন 'নিরুদ্দেশযাত্রায়' কাব্যপ্রেরণা সৌন্দর্যমূর্তি রূপে– যিনি জীবন ও জীবনাতীতের সঙ্গমে কবিকে অনন্তের অভিযাত্রায় পথনির্দেশ করেন। এই নিরুদ্দেশযাত্রার পরই রবীন্দ্রকাব্যে দেখা দেয় 'চিত্রা' কাব্য, যেখানে অধরা অপরিচিতা সুন্দরী আত্মপ্রকাশ করেছেন কবির অন্তর্যামী জীবনদেবতা রূপে। এখানেই সোনার তরীব যাত্রা শেষে নিরুদ্দেশযাত্রার সার্থক ব্যঞ্জনা। দুটি কবিতা-প্রথম ও শেষ অনুভবে এভাবেই একসূত্রে বাঁধা পড়েছে।

2.2.4 মানসসুন্দরী

'সোনার তরী' কাব্যের 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'মানসী কাব্যে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী, মানসসুন্দরীতে তারই প্রতিমা রচিত হ'য়েছে। মানসীর প্রেমকবিতাতে সীমার বন্ধন থেকে সীমাতীত ব্যাপ্তি ও গভীরতাযুক্ত। তাই আঁখির দৃষ্টি ঘুচিয়ে রূপের সীমাকে অরূপে মুক্তি দিয়েছেন। সেখানে ছিল তাই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—

"কেন তুমি মূর্তি হ'য়ে এলে
রহিলে না ধ্যান ধারণায়?"

'সোনার তরী'তে এসে কবিতা অনুভূতির স্তর বিন্যাসে আরো এক ধাপ এগিয়েছে। প্রচলিত প্রেমের কবিতা হিসেবে মানসসুন্দরীকে চিহ্নিত করা যাবে না। এখানে 'মানস' কথাটি অধরা আবার 'সুন্দরী' শব্দটি রূপাশ্রয়ী অর্থাৎ মনোলোক থেকে রূপলোকের প্রতিমা নির্মাণ। অন্যএকবি গানে বলেছেন—

"মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় বাতাসে"

—বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির মানসসুন্দরী, এই মানসপ্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, তাঁর আজন্ম সাধনার ধন। একে কেউ বলেছেন সৌন্দর্যদেবতা, কেউ বা কাব্যলক্ষ্মী, কেউ বা মানসপ্রতিমা। আসলে কবিতার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বগতোচ্চারণের ফসল এই কবিতা। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা— কাব্যসাধনা। তাই কবিতাকে কল্পনার রূপারতি করে দেহধারিনী রূপে নাম দিয়েছেন— মানসসুন্দরী।

এ কবিতা নিঃসন্দেহে কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী, কিন্তু কবি যেন প্রেমিক-প্রেমিকার সুখাবেশ ও মিলনের রূপকে কবির সঙ্গে কবিতার মিলন ছবি এঁকেছেন। এই প্রেম সম্ভোগের বর্ণনায় কখনো কখনো বাস্তবের রং লেগেছে মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেমের দেহীরূপ সম্বন্ধে ছিল সংশয় তাই সবসময় এক তত্ত্ব বা রূপকের আবরণে তাকে আড়াল করতেন। এ কবিতায় আশ্চর্য রহস্য কুহেলির মধ্যে আমরা

প্রত্যক্ষ করছি প্রেমিক প্রেমিকার মিলন বাসনার রূপ, আবার পরমূহূর্তে সেই রূপ থেকে কাব্যের রূপাতীত জগতে মুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। কবিতাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে শেলীর "Hymn to Intellectual Beauty" কবিতাটির কথা মনে আসে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' (a soul within a soul)- এও এই অন্তরমা আপন মনোলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কবির কথোপকথন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী-আমার
ছেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী"

কবিতার সঙ্গে এই প্রেমবন্ধনের অপরূপ কাব্যের অন্তরালে দেখি মানবী প্রতিমার ছায়াভাস। কিন্তু কবি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অনুভবকে সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে সীমাতীত বিশ্ববোধে সর্বদাই নিয়ে গেছেন। 'মানসসুন্দরী'তে বাস্তব ও আদর্শ দুটি দিকই ধরা পড়েছে। বিশিষ্ট নারীমূর্তিতে কখনো ধরা দিয়েও সে পুরোপুরি ধরা দেয় না— বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে হারিয়ে যায়, অবয়বী কায়া শেষপর্যন্ত বিলীন হয় মানসীমায়ায়—

"গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়"

কবিতাটি যেন সীমা ও সীমাতীতের সঙ্গম। এ কবিতায় বাস্তব প্রেমছবি অন্তর্লীন কিন্তু কবি সচেতনভাবেই সেই বাস্তবে যুক্ত করেছেন অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুরী। বাস্তভূমি থেকে অমর্ত পটভূমিতে স্থাপিত এই মানসপ্রতিমা মানবীরূপে নয়, কাব্যলক্ষ্মীরূপে উদ্ভাসিতা।

সন্ধ্যাসংগীতের 'গান আরম্ভ', সোনার তরীর 'মানসসুন্দরী', চিত্রার 'সাধনা' ও কল্পনা কাব্যের 'অশেষ'— রবীন্দ্রনাথের এই চারটি কবিতার উদ্দিষ্টা একেবারে প্রত্যক্ষভাবে কবিতা, বলেছেন বুধদেব বসু। অথচ কবিতাটিতে 'তরুণ প্রভাতে নবীন বালিকা মূর্তি, 'জীবনের প্রথম প্রেয়সী', 'খেলার সঙ্গিনী'— শব্দগুলি বাস্তবের ছায়াকে সতত মনে করায়। অর তখনই তাকে প্রতিষ্ঠা করেন "মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী" রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন এই মানসসুন্দরী 'কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি'। এই অধরাকে সীমার বন্ধনে ধরার প্রয়াস 'মানসসুন্দরী' কবিতা— সে হৃদয়েই আছে, কিন্তু তাকে 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।' এই হৃদয়ের ধনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের জন্যই কবিতাটি শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' কবিতার সঙ্গে তুলনীয়- যার অর্থ "A soul within a soul"

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন এই কবিতাটি যেন বাস্তব ও আদর্শ দুই লোকের মধ্যে উভচর; কবির প্রেয়সী কল্পনা ও বাস্তব রাজ্যের সমন্বিত রূপশ্রী। কখনো সে সন্ধ্যার তারকা, কখনো পৃথিবীর দীপ কখনো এক বিশিষ্ট নারীমূর্তির আভাস, আবার কখনো বা বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে পরিব্যপ্ত মানসপ্রতিমা। ব্যক্তিগত বাস্তবস্পর্শ থেকে অনন্তে মুক্তি লাভ করে নৈর্ব্যক্তিক হ'য়ে ওঠে। গৃহের লক্ষী তখন নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য লক্ষ্মী হয়ে ওঠে।

তখনই অনুভব করা যায় কবি ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্বজীবনের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় মানসধারণাই— মানসসুন্দরী। একটি নারীমূর্তির মধ্যে সমগ্র সৌন্দর্যকে হৃদয়ে ধরবার ব্যাকুল বাসনা, প্রতি খণ্ডরূপের মধ্যে অখণ্ডরূপের প্রভা দেখার আগ্রহ, ধরণীর সৌন্দর্যকে মানসী-প্রিয়ারূপে কল্পনা এ কবিতার

মর্মবাণী। এটি কাব্যলক্ষ্মী অথবা কাব্যপ্রেরণার উদ্দেশ্যে প্রেম-সম্ভাষণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমভাবনায় তত্ত্বকে মিলিয়েছেন। রূপ-অরূপ, সীমা-অসীম মিলে তাঁর মানসলোক গড়ে উঠেছে। এই মানসসুন্দরী কবির কল্পনামূর্তি, কবির ভাবপ্রেরণা, তাঁর আজন্ম সাধনার ধন। কিন্তু এই কবিতার ভাবময়তার মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর মানসপ্রিয়ার রূপও মিলে গেছে— সেখানেই রূপের আলোয় অরূপ আরতি।

শেলীর কবিতাতেও এই রহস্যময়ী কাব্যপ্রেরণার সন্ধান মেলে। দুই কবিই রহস্যের মধ্যে, নির্জনতার মধ্যে সৌন্দর্যসত্তায় অবগাহন করতে চান। সৌন্দর্যের বিশিষ্ট মূর্তিকে দুই কবি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যপ্ত করতে চেয়েছেন।

শেলীর 'Alastor' কবিতায় যে নারীমূর্তির রূপছায়ার আভাস তা যেন তাঁর নিজেরই আত্মপ্রক্ষেপ।

"He dreamed a veiled maid
Sat near him talking in low solemn tone
Her voice was like the voice of his own soul
Heard in the calm of thought"

— রবীন্দ্রনাথও 'মানসসুন্দরী' কবিতায় বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যকে একটি বাস্তব নারীমূর্তির মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন, সে মূর্তি তাঁর অন্তরস্থ কাব্যপ্রেরণা

"মানসীরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো নীরবভাষিণী
পরজন্মে তুমি কে গো মূর্তিময়ী হ'য়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার।"

এই আন্তরপ্রেরণাই পরবর্তী পর্যায়ে 'চিত্রা' কাব্যে 'জীবনদেবতা' রূপে প্রতিষ্ঠা পাবে। মানসসুন্দরীতে যেন তারই আভাস। 'সোনার তরী' পর্বে জীবনদেবতা স্বমূর্তিতে প্রকাশিত ন'ন। তিনি যেন কবিতা ও কল্পনার যুগল মূর্তি আশ্রয় করে আছেন। তিনিই কবিজীবনের চালিকাশক্তি, নিয়ন্ত্রী।

"আজন্ম সাধন ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা লতা....."

কবিতাকে 'কল্পনা লতা' বলে সম্বোধন করে রোম্যান্টিক কবি কল্পনার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিলেন। সেই কল্পনা-প্রভাবিত কবির হৃদয়বাসিনী, প্রেরণারূপিনী সৌন্দর্যমূর্তিই মানসসুন্দরী। শেলী যাকে বলেছেন— 'Spirit of Beauty'- সেই সৌন্দর্যের আত্মা, যা মানুষের চিন্তাকে দ্যুতিময় করে তোলে, সেই শক্তিই মানসসুন্দরীর দিব্য প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতাই তাঁর বহুকালের প্রেয়সী, তাঁর কল্পনা। কাব্যপ্রেরণাই তাঁর অন্তরস্থিত জীবনদেবতা। মানসসুন্দরীই ক্রমাভিব্যক্তির পথে জীবনদেবতা হ'য়ে দেখা দেবেন। মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গাবিহরিণী সেই অনিন্দ্য ভাবকল্পনাই কবির প্রেরণা, মানসসুন্দরী।

2.2.5 বসুন্ধরা

'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির বিশ্বপ্রীতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাত্মবোধে উপনীত হয়েছে। কবির এই বিশাত্মবোধের মধ্যে অন্বিত আছে মর্ত্যমমতার উৎস। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তাবোদের, স্নেহপ্রীতির বন্ধন কবি অন্তর দিয়ে অনুভব করেন। এই প্রকৃতি-তন্ময়তা রবীন্দ্রকাব্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। 'বসুন্ধরা' কবিতায় পৃথিবীর সঙ্গে কবির আত্মিক বন্ধনের কথা প্রকাশিত।

'সোনার তরী' রচনাকালেই কবি লিখেছিলেন ছিন্নপত্রাবলী (১৮৮৫-৯৫) সেখানে এই মর্ত্যপ্রেমের সুর স্পষ্টই শোনা গেছে—

> "এই পৃথিবীটা আমার অনেকদিনকার ও
> অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মত
> আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমাদের
> দু'জনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং
> সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।"

—এই মর্ত্যমমতা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথমাবধি ছিল। 'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় সর্বপ্রথম এই বিশ্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে 'বসুন্ধরা' কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের রহস্য ও বন্ধনের কথা ধ্বনিত হয়। এ কবিতার শেষাংশে কবির মর্ত্যপ্রীতির কথাও আভাসিত। এ অনুরাগ অন্য কবিদের মত নিছক আনন্দদায়িনী নয়। এর গভীরে আছে ভাবসত্তার বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের অনুভূতি তীব্র গভীর। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি আদিম বন্ধন স্বীকার করেন। প্রকৃতি তাঁর জননীস্বরূপা। অন্যান্য কবিরা প্রকৃতিতে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করেন আর রবীন্দ্রনাথ প্রাণময়ী জননী রূপে তাকে উপলব্ধি করেন। বসুন্ধরার মধ্যে সহস্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে অঙ্কুরিত হ'চ্ছে বিচিত্র জীবনরসে। কবি সেই বসুন্ধরার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সূত্রে লগ্নিত।

এ কবিতায় তিনটি অংশে কবি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রথম অংশে তিনি নিজের বাসনাকে সর্বত্র প্রেরণ করেছেন। তাঁর বাসনার প্রস্রবণ যেন বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অংশে আছে বসুন্ধরার মাতৃমূর্তি। জননী বসুন্ধরার মাটির শিশু বলে কবি নিজেকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জননীর প্রাণরসের মতই বসুন্ধরার সঞ্জীবনী প্রাণরস সর্বত্র উচ্ছ্বসিত।

তৃতীয় অংশে কবি পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। কবিতাটিতে মর্ত্যপ্রীতি, আনন্দবোধ ও পৃথিবীর সঙ্গে জন্মান্তরীণ সম্পর্কজনিত বিরহবোধ একই সঙ্গে অন্বিত।

বসুন্ধরার মৃত্তিকামাসে কবি ব্যাপ্ত হ'বার আকুল বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি বলেন—

> "আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে
> কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
> ওগো মা মৃণ্ময়ি, তোমার মৃত্তিকামাঝে
> ব্যাপ্ত হয়ে রয়ি।"

মাতৃঅঞ্চল বিচ্ছিন্ন শিশুর মত তিনি ধরিত্রী মাতার শ্যামলাঞ্চলেই আশ্রয়ে পেতে চান। সর্বজীব ও বিষপ্রকৃতির সঙ্গে তার একাত্ম বার বাসনা জেগেছে, তাই ঘরে বসে তিনি গ্রন্থপাঠের মধ্যে বিশ্বপর্যটনের আনন্দ পেতে চান। এই পৃথিবীতে যে বিচিত্র জীবনধারা প্রাবহিত, কবি সেই জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে চান। তাঁর মনে হয় ধরিত্রীর সঙ্গে তাঁর জন্মজন্মান্তরের আত্মিক বন্ধন। তিনি একদিন মিশে ছিলেন এই ধূলায় ধূলায়; সেদিন তার সত্তা জলস্থল অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত ছিল। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে লিখছেন—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক
হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ
ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়তো, সূর্যকিরণে
আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক
রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত
হতে থাকতো, আমি উজ্জ্বল আকাশের নীচে
নিস্তব্ধভাবে শুয়ে থাকতুম।"

আজ আবার কবি সেই অতীতে ফিরে যেতে চান। বসুন্ধরার বিচিত্র আনন্দরসে অবগাহন করতে চান। অতীত থেকে বর্তমানে যে যোগসূত্র তারই সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন করতে চান তিনি। যেদিন তিনি থাকবেন না, সেদিনও তাঁর আনন্দানুভূতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে; আবার নতুন করে এই বসুন্ধরার কোলে ফিরে আসবেন তিনি— এই তাঁর ধ্রুব প্রত্যয়।

এ কবিতায় অভিব্যক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের (Theory of evolution) প্রকাশ ঘটেছে কাব্যিকরূপের মাধ্যমে। জগতের অণুপরমাণুর সঙ্গে চির একাত্মের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। যে বসুন্ধরার সঙ্গে মাতৃত্বের বন্ধন অনুভব করেন কবি, অথচ বিশ্বজগৎ থেকে এক বিচ্ছিন্নতার বেদনাও বোধও করেন। কল্পনা ও বাস্তবের এই ব্যবধান থেকেই জন্ম নিয়েছে অনির্দেশ্য বিরহব্যথার তীব্রতা। কবির জীবনানুরাগ, মর্ত্যমমতা ও বিশাত্মবোধ মিলে কবিতাটি হ'য়ে উঠেছে অনন্য রসমধুর। সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি এবং আদি জননী সমুদ্রের কন্যারূপে বসুধরাকে তুলে ধরেছেন। মানব, মর্ত্য ও মহাসমুদ্র— জীব থেকে নিসর্গ যেন একই সম্বন্ধসূত্রে প্রথিত। সেই বিশ্বানুভূতিই 'বসুধরা' কবিতায় প্রকাশিত।

জন্মজন্মান্তরের এই সম্বন্ধ কিন্তু বিচ্ছেদ-বিধুর। মনুষ্যজন্মই বসুধরার সঙ্গে কবির ব্যবধান ঘটিয়েছে, তাই তিনি সেই মাতৃক্রোড়েই আবার ফিরতে চান— 'সেথায় ফিরায়ে লহো, মোরের আরবার'

এই আকুল প্রার্থনা যেন কবিতাটিতে এনেছে অতীন্দ্রিয় মিস্টিক চেতনার আভাস। সীমার বন্ধন থেকে কবি ফিরতে চান সীমাতীতের মুক্তিতে ব্যাপ্ত হতে চান বিশ্বময়। কবির প্রকৃতি প্রেম মর্ত্যপ্রেম 'বসুধরা' কবিতায় অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা ও আধ্যাত্মিকতার শিখর স্পর্শ করেছে।

আকাশভরা সূর্যতারা ও বিশ্বভরা প্রাণস্পন্দন অনুভব করে কবি মর্ত্যভূমির স্নেহাঞ্চলেই আশ্রয় নিতে চান। 'বসুধরা' সেই নিসর্গ লালিত মর্ত্যপ্রেমের কবিতা।

2.2.6 সমুদ্রের প্রতি

'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বের সঙ্গে সুনিবিড় একাত্মতার যোগ ও সম্বন্ধ বন্ধনের কথা এ সময়কার রচনায় বারবার দেখা গেছে। সমকালে লিখিত ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে পাই—

> "পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা
> ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার
> সেই জলশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত
> হ'তে থাকত। সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার কলধ্বনি
> শুনলে তা বোঝা যায়।"

সমুদ্রের সঙ্গে এই জন্মান্তরের বন্ধন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতে প্রকাশিত। সেই সূত্রে গ্রথিত হ'য়েছে বসুন্ধরার সঙ্গে সম্পর্কও। কবিতাটির মধ্যে আছে তিনটি ভাবপর্যায়। প্রথমভাগে সমুদ্রকে কবি 'আদি জননী' বলে বন্দনা করেছেন। সমুদ্র জননী এবং মর্ত্যপৃথিবী তার কন্যা। দ্বিতীয় ভাগে দেখি কবি সেই বসুন্ধরার সন্তান। তৃতীয় ভাগে জননী বসুন্ধরার দুঃখে কাতর কবি আকুলভাবে আদি জননীর সিন্ধুর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।

কবিতাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রামপুর বোয়ালিয়ায় রচিত হ'য়েছিল; কিন্তু এটির উৎস পুরীর সমুদ্র। কবি কবিতার শুরুতেই লিখেছেন— 'পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া'। অর্থাৎ পুরীর সমুদ্র তাঁর স্মৃতিতে আগরুক। প্রত্যক্ষ থেকে অনুভব উপলব্ধি করে কবি সমুদ্রকে তাঁর কবিতায় শাশ্বত রূপে উত্তীর্ণ করেছেন। এখানেও দেখি Wordsworth কথিত "emotion recollected in tranquility". পুরীতে সমুদ্র দেখে তাঁর মনে যে আবেগের উচ্ছাস— তাই পরে স্মৃতিবাহিত হয়ে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

কবি কল্পনা করছেন সমুদ্র আদি জননী এবং বসুন্ধরা তার একমাত্র কন্যা। শিশু সন্তানের জন্য জননী যেমন উদ্বেগ আশঙ্কায় নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেন, তেমন ভাবেই আপন কন্যা ধরণীর জন্য জননী সিন্ধু সদা অতন্দ্র। তরঙ্গবন্ধনে বেঁধে শত চুম্বনে স্নেহপাশে আবদ্ধ করে বসুন্ধরাকে মমতাময় স্পর্শ দিয়ে ঘিরে রেখেছে সমুদ্র, জননী যেমন আপন সন্তানকে স্নেহবন্ধনে বাঁধে।

কবি নিজে বসুন্ধরার সন্তান। তাই সমুদ্রর সঙ্গে তাঁর আজন্ম সম্বন্ধ বন্ধন। তাঁর মনে হয় তাঁর দেহের শিরায়, নাড়ীতে রক্তধারায় প্রবাহিত সেই সম্বন্ধ বন্ধন।

> "অসীম কালের যে হিল্লোল
> জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে
> নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান"

তাই কবির কাছে সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন যেন আপন মর্মের স্নেহগুঞ্জন। তাঁর মনে হয় আদি জননী সিন্ধুর

কন্যা বসুন্ধরার সন্তান বলে তাঁর সঙ্গেও সমুদ্রের এক অচ্ছেদ্য রক্তসম্পর্ক বন্ধন আছে। তাই জন্মপূর্বের কথা যেন অস্ফুট আভাসে তাঁর চৈতন্যে জাগ্রত হয়—

"সেই জন্মপূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

সমগ্র কবিতাটিতে একই সঙ্গে মর্ত্যপ্রীতি ও নিসর্গ প্রীতি সঞ্চারিত। এই সর্বানুভূতি বা বিশ্বানুভূতি সোনারতরী কাব্যে লৌকিক প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন—

'এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটি নাড়ীর টান।
এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক
হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠতো।"

বসুন্ধরার সঙ্গে এই একাত্মতা—এই মর্তামমতাই আরো প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গে মিলে গেছে। অন্য একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে; নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কিছুতেই বোঝা যায়।"

সমুদ্রের মুখোমুখি বসে কবি সেই গভীর আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেছেন। এই জল, মাটি, বাতাস, গোটা পৃথিবী, সমুদ্র সৌরমণ্ডলী সব যেন জন্মজন্মান্তরের বন্ধনে কবিকে ঘিরে রয়েছে। পৃথিবীর শিশুরূপে তাঁর সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক যেন লক্ষ কোটি বছরের। এই সর্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় অনবদ্যরূপে প্রকাশিত।

2.2.7 সমুদ্রের প্রতি

'সোনার তরী' কাব্যের এক বিশিষ্ট কবিতা 'পরশ পাথর'। কবিতাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল। সোনার তরী কাব্যের মূল ভাব—মর্ত্যপ্রীতি। জীবন বিমুখ নিরাসক্ত ভাব নয়, জীবনের প্রতি মমতাই এ কাব্যের কবিতাবলীতে নানা রূপে ভাবে ধরা পড়েছে।

এই কবিতাটি লেখার একমাস পরে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাদেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে যেন কবিতাটির মর্মবাণী প্রকাশিত।

'বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি। .....এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনরে হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তাহলে আর কিছু অসাধ্য সাদন করতে চাইনে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই"

'পরশ পাথর' কবিতায় যে খ্যাপা সন্ন্যাসীর দেখা পাই সে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দ উপভোগ না করে অপ্রাপনীয়ের প্রতি আকরণ ছুটে চলেছে। জীবনের সমস্ত অঙ্গকে বর্জন করে পরশপাথরের সন্ধানে নিজেকে নিয়োগ করেছে সন্ন্যাসী; কিন্তু সে এমনই হতভাগ্য পরশপাথর পেয়েও তা ভোগ করতে পারলো না। কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে 'পরশ পাথর' তার হাতে এসেছিল, লোহার শিকল সোনা করে দিয়ে কখন যেন হারিয়ে গেছে—খ্যাপা তা বুঝতেও পারেনি। কবি বলতে চান যে প্রত্যহকে বাদ দিয়ে যেমন জীবনের সার্থকতা নেই তেমনি জীবনের সব কিছু বাদ দিয়ে একটি বস্তুর পিছনে ছুটে বেড়িয়েও সার্থকতা আসে না।

এই ভাবটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—এর কাহিনীর মিল আছে। সেও এমনই অলীক অবাস্তব আদর্শের সাধনা করে ভেবেছিল সিদ্ধিলাভ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যহের সংসারে এসে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে সন্ন্যাসী বুঝেছে যে এতকাল জীবনবিমুখ অবাস্তব ধ্যানে বৃথাই তার জীবন কেটে গেছে। প্রত্যহকে বাদ দিয়ে জীবনের সার্থকতা আসে না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ"।

সেই সন্ন্যাসীর মত পরশপাথরের সন্ন্যাসীও ব্যর্থ। জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে পরশপাথর খুঁজে বেড়িয়েছে। সে ভেবেছে স্পর্শমণি পেলে তার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। এই অবিরাম অন্বেষণের অভ্যাসের অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে তার জীবনের সহজ আনন্দের আলো। অথচ কখন যেন পরশপাথর উঠে এসেছিল তার হাতে—সেই স্পর্শে তার লোহার শিকল সোনা হয়ে গেছে—সে বুঝতেও পারেনি। অবিশ্রান্ত নুড়ি খোঁজার ব্যর্থ অন্বেষণে কখন যেন পরশপাথর হাতে পেয়েও অভ্যাসবশে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আসলে পরশ পাথরের সন্ধান যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, জীবন বিমুখ অন্বেষণে পরিণত হয়েছিল, তাই হাতে এসেও তাকে ধরে রাখা যায়নি।

যখন পথের বালক সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করে—

"সন্ন্যাসীঠাকুর একী
কাঁকালে ওকী ও দেখি
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে
সোনার শিকল বটে
লোহা সে হয়েছে সোনা জানেনা কখন"

তখনই সন্ন্যাসী বোঝে পরশপাথর তার করায়ত্ত হয়েও অনায়ত্তই রয়ে গেছে। তখনই 'খ্যাপা' শব্দটি হয়ে ওঠে তার আক্ষরিক অভিধা। আবার পিছনের ফেলে আসা পথে সে খুঁজে ফেরে হারানো রতন—

"সন্ন্যাসী আবার ধীরে
পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নতুন করে হারানো রতন।"

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যর্থ অন্বেষণ কালহরণ করেছে সন্ন্যাসী। জীবনের আনন্দকে উপভোগ না করে নিষ্ফল অন্বেষায় অর্ধেক জীবন কাটিয়ে আবার পিছন পথে তার ফিরে চলা। 'বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ' খ্যাপা তখন অবসন্ন। জীবন বিমুখ সাধনার কঠোরতায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর গানে শুনেছি—

"কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে"

জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আনন্দকণার মধ্যেই আছে সুধা। তাকে অবহেলা করে বিরাট কিছুর পিছনে ঘুরে মরে শক্তি ক্ষয় করা জীবনের অপচয়। আমরা জানতেও পারিনা আমাদের প্রার্থিত ধন কখন নাগালে এসেও হারিয়ে যায়। আমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে সে থাকে চিরনির্বাসিত।

একথাই মৈত্রেয়ী দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"সংসারে আমরা অনেক কিছু পাই, কিন্তু পেয়েছি বলে অনুভব করিনে। সেই পাওয়ার সীমাকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাই বলে পাওয়াকে দেখিনে—এই পেয়ে না পাওয়াই তো আমার 'পরশপাথর' কবিতার বিষয়।" জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেই। সমস্ত জীবন অভ্যাসের দাসত্ব করে আনন্দের অমৃতপরশ আমাদের অনায়ত্ত থেকে যায়। জীবনের টুকরো আনন্দের মুহূর্তগুলোই আসলে পরশপাথর। কিন্তু সেই সহজ আনন্দকে ভুলে আমার ছুটে চলি দুর্গমের উদ্দেশ্যে। রূপকের আভাসে এই জীবনসত্য ও পরতত্ত্বকেই কবি ব্যঞ্জিত করেছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীও মমতার বন্ধনকে ত্যাগ করে সাধনায় সিদ্ধি চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করেছে সীমার বন্ধনেই অসীমের আস্বাদ। পরশপাথর কবিতার খ্যাপা সন্ন্যাসীও অনায়ত্ত অসীমকে অন্বেষণ করে অর্ধেক জীবন কাটিয়েছে—সীমার মধ্যেই যে আনন্দ তা সে বোঝেনি। রবীন্দ্রনাথ বরাবর সীমার মধ্যে অসীমকে মেলাতে চেয়েছেন। বন্ধনের মাঝেই পেয়েছেন চরম ও পরম মুক্তির স্বাদ। যা আমাদের একান্ত কাছের তাকে মূল্য না দিয়ে আমরা যদি অপ্রাপনীয়ের সন্ধানে ব্যর্থ জীবন কাটাই তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত বস্তু আমাদের অনায়ত্তই থেকে যাবে। তখন হাজার চেষ্টাতেও তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অর্ধেক জীবন নিষ্ফল অন্বেষণ—বাকী অর্ধেক জীবন হতাশায় নিমগ্ন থেকে প্রাণধারণ—এই ব্যর্থ জীবন ট্র্যাজেডিই 'পরশপাথর' কবিতায় প্রকাশিত।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প' গ্রন্থে 'একরাত্রি' গল্পের আলোচনায় 'পরশপাথর' কবিতাটির প্রসঙ্গ এনেছেন। কবিতার খ্যাপা সন্ন্যাসীর মতো একরাত্রির নায়কও 'পরশপাথর' পেয়েও তাকে হারিয়েছে। নায়কের কাছে সুরবালাই পরশপাথর। সেই প্রেমের সোনার স্পর্শেই তার মাদুলি সোনা হয়ে গিয়েছিল, সে নিজেও বোঝেনি। অনেক পরে এক প্রলয় রাত্রি তার কাছে স্বর্ণ মাদুলি—সেই রাত্রির স্মৃতির দিকে তাকিয়েই তার বাকী জীবন কাটবে। পরশপাথরের সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানের সৌভাগ্য থেকেও সে বঞ্চিত, সে এমনি হতভাগ্য।

পরশপাথরের সন্ন্যাসীর ট্র্যাজিক বেদনা সত্ত্বেও সে নতুন আশায় আবার ফিরে চলে। মানুষ এভাবেই সারাজীবন ব্যাপী খুঁজে চলে পরশপাথর, চরম সুখের অভীষ্ট বস্তু; কিন্তু সেই পরম সুখ ও আনন্দ আছে তার প্রাত্যাহিক দিন যাপনের মধ্যেই। এই সহজ সত্যকে ভুলে আমরা ছুটে চলি আলেয়ার পিছনে-তা-এই আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি।

2.2.8 দুই পাখি

সোনারতরীর 'দুই পাখি' কবিতাটিতে মিশে আছে তত্ত্বভাবনা। পাণ্ডুলিপিতে ও সাধনায় কবিতাটির নাম ছিল 'নরনারী'; পরে অবশ্য 'দুই পাখি' নামেই এটি মুদ্রিত ও পরিচিত হয়।

রবীন্দ্রমানসে মুক্তি-বন্ধন তত্ত্ব প্রথমাবধি জাগ্রত ছিল। জীবনস্মৃতিতে এই বাইরের মুক্তি ও গৃহকোণের বন্দীদশা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "সে মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সে জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডী মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডী তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।"

মানবপ্রকৃতিতে আছে দুটি সত্তা—একটি গৃহবন্দী থাকতে চায়, অন্যটি মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে চায়। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে ..... একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি।
"

কবির নিজ মননের এই স্বীকারোক্তিতে ধরা পড়েছে 'দুই পাখি' কবিতার মর্মকথা। 'খাঁচার পাখি ও বনের পাখির রূপকে প্রকাশিত হয়েচে সীমা-অসীম, মুক্তি বন্ধন তত্ত্ব। এটিই প্রথমে 'নরনারী' নামে লিখিত হয়েছিল। নারী ঘরের দিকে আকর্ষণ করে, পুরুষ বাইরের আকর্ষণে পা বাড়ায়। একদিকে আসক্তি অন্যদিকে মুক্তি। মানব প্রকৃতিতেই আছে এই বিরোধাভাসের লীলা। পঞ্চভূতের একটি প্রবন্ধে কবি বলেছেন—"স্থিতি ও গতি, সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গেছে।"

সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে। তাদের স্বভাবের দ্বৈত ভাব মিলেই জীবনের পথ চলা। 'দুই পাখি' কবিতায় সেই জীবন রহস্যই আভাসিত। খাঁচার পাখি শেখানো বুলি গায়—সে প্রথার মধ্যে আবদ্ধ আর বনের পাখি মুক্ত বনের গান গায়। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এপারে মুখর হল কেকা ঐ ওপারে নীরব কেন
কুহু হায়
এক কহে আরেকটি একা কই, শুভযোগে কবে হব
দুঁহু হায়"

রবীন্দ্রনাথ তার শৈশবে ছিলেন চার দেওয়ালে বন্দী অথচ সুদূরের হাতছানি তাঁকে ডাক পাঠাতো।

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সেকথা যে যাই পাসরি"

দুই পাখি কবিতায় খাঁচার পাখির ডানা আছে। কিন্তু তার শক্তি নেই ওড়বার। শৃঙ্খলিত বন্দীদশায় সে হারিয়েছে ওড়ার ছন্দ। বনের পাখী বলে সে শিকলে ধরা দেবে না। ফলে মিলন পিয়াসী এই দ্বৈত সত্তা কোনোদিন পূর্ণ মিলিত হতে পারে না। একজনের মধ্যে আছে অসীম স্বাধীনতার মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা, অন্যজনের আছে সীমার বন্ধনে তৃপ্তি।

দুই পাখির রূপক বারবার কবির গানে কবিতায় এসেছে।

"অলখ পথের পাখি গেল ডাকি
সুদূর দিগন্তরে"

—তাই শুনে সোনার পিঞ্জরে বন্দী পাখি গায়—

"আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে
আমার মন কেমন করে।"

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না—সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা না সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জগতের প্রতি আসক্তি—কোনটি তাঁর প্রার্থিত? অর্থাৎ মানুষের অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেই আছে গৃহবিমুখ ও গৃহাভিমুখী পরস্পর বিরোধী দ্বৈত সত্তা।

"বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা"

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে দুই পাখির বিরোধী সত্তা। এই আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলাচাঞ্চল্যই মানবজীবনের পরিক্রমা। পুরুষ স্বভাবতই মুক্ত, তাই সে চায় গৃহকোণে কখনো আশ্রয়— আবার নারী স্বভাবতই বন্ধ, তাই কখনো কখনো সে চায় বাইরের জগতে মুক্তি। এই যুক্তি বন্ধন তত্ত্বই ভাবে ভাষাও ও পাখির রূপকে কবিতাটিতে ধরা পড়েছে।

সমগ্র সোনার তরী কাব্যতে এই সীমা অসীম তত্ত্ব বারবার আভাসিত। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় আসক্তি ও বন্ধন, বৈষ্ণবকবিতায় প্রেমের সীমা ও অসীমতা আবার 'দুই পাখি' কবিতায় মানবপ্রকৃতির মুক্তি বন্ধন ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

এই বোধ আরো স্পষ্ট হয়েছে 'ছবি ও গান' প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে

—"আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্খা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelley-র Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark (অর্থাৎ একটা হল বনের পাখি, অন্যটি খাঁচার)।

সহজ ছন্দে নিরলংকৃত 'দুই পাখি' কবিতায় এই তত্ত্বকেই রূপায়িত করেছেন কবি।

2.2.9 বৈষ্ণব কবিতা

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। তাঁর কাব্যে সাহিত্যে বারবার ছায়া ফেলে গেছে মধ্যযুগের অনবদ্য রসসৃষ্টি পদাবলীর প্রতি মুগ্ধতা। 'কল্পনা' কাব্যের একাধিক কবিতায় এই মুগ্ধতার স্বাক্ষর আছে। 'সোনার তরী' 'হৃদয় যমুনা' কবিতার নামের মধ্যেই বৈষ্ণবীয় অনুরাগ নিহিত। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সম্বধে তাঁর অনুরাগ স্নিগ্ধ সশ্রদ্ধ মনোভাব সর্বাধিক প্রকাশিত 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতায়।

আধুনিক রোম্যান্টিক কবি বৈষ্ণবপদাবলীর আধ্যাত্মিকতার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। সে প্রশ্ন অলৌকিক ভক্তি র কাছে জীবনের প্রশ্ন। মধ্যযুগ ছিল দেবতন্ত্রবাদ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বভাবনার তন্ময় সাধনার কাল। আধুনিক যুগ কিন্তু লৌকিক মানবিক হৃদয়াবেগের মন্ময় আরাধনার কাল। তাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের কাছে তাঁর প্রশ্ন রেখেছেন যে পদাবলীর বিরহমিলন বর্ণনা কি শুধুই তত্ত্বের কাব্যরূপায়ণ? মানবিক প্রেম কবি হৃদয়ের ব্যক্তিক অনুভূতি কি কোথাও ছায়া ফেলে যায়নি?

আসলে এই স্বগত প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে এর সদর্থক উত্তর। কবি বিশ্বাস করেন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বৈষ্ণবগীতির মধ্যে মিশেছিল কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতি। বৈষ্ণব কবি তাঁর নিজ জীবনের নায়িকার ছবিকেই আপন অজ্ঞাতে মিশিয়ে দিয়েছেন শ্রীরাধার প্রেমছবিতে।

গৌড়ীর বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্বকে সাধারণ লৌকিক প্রেম থেকে স্বরূপত পৃথক বলে চিহ্নিত করেছেন বৈষ্ণব ভক্ত। তাঁরা দূর থেকে লীলাশুকের মত রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, কোথাও নিজেদের সঙ্গে রাধার বেদনাকে একাত্ম করেননি। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন রেখেছেন এঁদেরই কাছে। তাঁর মতে বৈষ্ণবীয় প্রেমরস তথাকথিত অলৌকিক রস নয়, যার স্বরূপ লৌকিক প্রেম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে প্রেম আমাদের আপন থেকে অন্যের দিকে নিয়ে যায় এবং প্রিয়তমের মধ্যেই অনন্তের উপলব্ধি ঘটে। সেখানে প্রিয়তমের মধ্যে দেবতা এসে উপস্থিত হন এবং যে মালাটি বধুর গলায় দেবার জন্য গাঁথা হয়েছে তা-ই দেবতার গলায় পরায়। সীমা ও অসীমের এই স্বাজাত্যের মূলে আছে উপনিষদের দর্শন যা রবীন্দ্রমানসকে আলোকিত করেছে। তাই তিনি বৈষ্ণবপদাবলীকে নিছক গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় অলৌকিক রসের প্রতীক বলে মেনে নেননি। তাঁর কাছে ভালোবাসার মধ্যে আছে অনন্তের স্পর্শ। তিনি 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন—

"যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনি কি জীবের মধ্যে আমরা অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা। .....সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। .....বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। ..... বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।"

কবির মনে হয়েছে পদাবলীর প্রেছবির আড়ালে আছে কবির ব্যক্তিক অনুভবের বাস্তব প্রেমছবি। তাঁর মনে হয়েছে বৈষ্ণব পদকর্তা তাঁর আপন নায়িকার আঁখির মধ্যেই দেখেছেন রাধার নয়নের দ্যুতি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সীমা অসীমের মিলন তত্ত্ব আভাসিত। তাঁর মনে হয়েছে বৈষ্ণব কবি বৈকুণ্ঠের প্রেমলীলার যে অধ্যাত্মরসামৃত প্রবাহিত করেছেন, তাতে অবশ্যই মিলেছিল মানবিক প্রেমের লৌকিক ধারা। এভাবেই সীমার মধ্যে অসীমকে আবিষ্কার করে প্রেমিক হৃদয়। আপন হৃদয়ের নারীকে যখন কবি আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন, তখন তাকে মিলে যায় অর্মত্য মধুরিমা। এভাবেই বৈষ্ণবকবি সীমার মধ্যে অসীমের উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব তত্ত্বের বিরোধিতা করতে চাননি, কেবল আধুনিক রোম্যান্টিক মানস ও মননে অলৌকিক প্রেমতত্ত্বকে বাস্তব মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই বলেছেন প্রেমের মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা আছে যা সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে—

"দেবতার প্রিয় কবি, প্রিয়েরে দেবতা"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতাকে শুধু ভক্তিরসের আধার একটি বিশেষ ধর্মাশ্রিত আবরণে দেখতে চাননি, তাঁর মনে হয়েছে পদাবলীর পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান কেবল লোকোত্তর অধ্যাত্ম প্রেমের পরিচয়বাহী নয়ক্ত তাতে মিশে আছে জীবনের রক্তিম স্পর্শ। তাই পদাবলীর রাধিকার বেদনা বাস্তব নারীর অন্তর বেদনারই প্রকাশ বলে তাঁর ধারণা। ভালোবাসার মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা আছে, সে তুচ্ছকে অসাধারণ করে তুলতে পারে,—এই তার গৌরব। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ লীলাকে চান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সে আবেদন সর্বজনীন বলে মনে হয়েছে। ভক্তি নিরপেক্ষভাবে তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে অনন্য প্রেমকাব্য বলে মনে করেছেন। তাই তাঁর কাছে শুধু বৈষ্ণবের জন্য বৈকুণ্ঠের গান নয়; সে গান কেবল ভক্তিমার্গের দৈব সাধনা নয়— তা প্রেমপথের বাস্তব কামনা বিজাড়িত ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণব প্রেমগীতিহার প্রেমিকচিত্তের আত্মগত অরূপ প্রকাশ। আধুনিক মন্ময় কবির আত্মভাবনা এই প্রেমকে দিব্যভাবে উত্তীর্ণ করে। তাই তাঁর কাছে—

"যারে বলে ভালোবাসা
তারে বলে পূজা"

তাই প্রেমকে অতলান্ত অনুভবের গভীরে আত্মস্থ করে তিনি বলতে পারেন—

"প্রভু আমার প্রিয় আমার
পরম ধন হে"

এজন্যই রবীন্দ্রনাথের অনুভবে বৈষ্ণব কবিতা মানবহৃদয়ের গভীর প্রেমানুভবের মন্ময় গান।

2.2.10 যেতে নাহি দিব

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মূলভাব পৃথিবীর প্রতি জীবনের গভীর আসক্তি। এই কাব্যকে বলা হয়েছে লৌকিক প্রেমের কাব্য। প্রতি মানুষ পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব অনুভব করে, তা-ই লৌকিক প্রেমের ঘনীভূত রূপ। কিন্তু মানুষ মাত্রই জানে এই গভীর বন্ধন ছিন্ন করে একদিন চলে যেতে হবে। এই দুঃখের রহস্য এই ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনকেই ঘিরে আছে। সেজন্যই আমাদের এক জীবনাসক্তি, মর্ত্যপ্রীতি, যা লৌকিক প্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই পৃথিবীকে আমরা ভালোবাসি আবার ধরত্রি জননীও মানুষকে ভালোবাসে। কিন্তু পৃথিবীরূপী জননীও অসহায়। তিনিও তাঁর সন্তানদের ধরে রাখতে পারেন না। এই বোধ ও অনুভব সমকালে রচিত 'ছিন্নপত্রের' চিঠিতে প্রকাশিত।

সেখানে কবি বলছেন বসুন্ধরা যেন তাঁর প্রিয় মানব সন্তানদের প্রতি সকরুণ মমতা তাকিয়ে আছেন। যেন বলতে চাইছেন—

"আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনা, আরম্ভ করিসম্পূর্ণ করতে পারিনা; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি না।"

পৃথিবীর দিক থেকে একথা যেমন সত্য, মানুষের দিক থেকেও এই অনুভব তেমনই সত্য। প্রতি মানুষ চায় তার প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য কাছে পেতে, কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাকে একদিন প্রিয়তমকে ছেড়ে দিতে হয়। এই আসক্তি, এই প্রেম আসলে মর্ত্যমুখী।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কবির চার বছরের শিশুকন্যা পিতার যাত্রাকালে বলেছে 'যেতে নাহি দিব না তোমায়'— এ যেন প্রিয়জনের কাচে প্রিয়জনের চিরদিনের দাবী। এই ব্যক্তিগত স্নেহবন্ধনের আকর্ষণ সত্ত্বেও কবিকে চলে যেতে হয়েছে। সারা পথ তাঁর অবুঝ কন্যার স্নেহের দাবী তাঁর কান থেকে মনে প্রতিধ্বনিত হয়েচে। তখনই ক্রমে এই বেদনা থেকে উন্নীত হয়েছেন এক সুগবীর জীবনবোধে; বক্তিগত অনুভূতি বিশ্বগত উপলব্ধিরূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে সারা বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে চলেছে এই ধরে রাখার আকুলতা আর চলে যাবার বেদনা। পৃথিবী চাইছে তার সকল সৃষ্টিকে চিরকাল কাছে ধরে রাখতে, কিন্তু তা' সম্ভব নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই একটা সংগ্রাম চলেছে। একপক্ষ অনিবার্য গতিতে চলেছে জীবন থেকে মৃত্যুর পথে অন্যপক্ষ আঁকড়ে ধরতে চাইছে তাকে। এই ধরে রাখা আর চলে যাবার চিরন্তন লীলাই আভাসিত 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। এই আসক্তিঅনুরাগ ও বিপরীত সত্যের উপলব্ধির রূপই ধরা পড়েছে কবিতাটিতে এবং এ থেকেই কবির মনে জেগেছে মর্ত্যজীবন প্রীতি।

এক পিতৃসত্তার ব্যক্তিক অনুভূতিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাকে বিশ্বময় ছড়িয়েছেন। কবিতার কথক এক স্নেহময় পিতা। বাৎসল্যের সুগভীর বন্ধন ছিন্ন করে নিষ্ঠুর সংসার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে সারা

আকাশে যেন স্নেহ সুধ ছড়ানো, সকলের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি সকলকে কাছে ধরে রাখতে চাইছে। কিন্তু, এদের প্রত্যেককেই যেতে দিতে হবে, কারণ পৃথিবীতে সেটাই চরম সত্য।

"দিগন্ত বিস্তৃত ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস
কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী।"

কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত বেদনা যেন বিশ্বপ্রকৃতিতে আরোপিত। তিনি উপলব্ধি করেন সারা বিশ্বজুড়ে এই লীলাই চঞ্চল। মর্ত্যগুলির প্রতি সুগভীর আসক্তিই আমাদের প্রাণধর্ম। কবির বালিকা কন্যার অবুঝ উক্তি— 'যেতে আমি দিব না তোমায়' লৌকিক প্রেমের বন্ধনকেই প্রকাস করে। জাগতিক ক্ষেত্রে দেখি মর্ত্য থেকে বিদায় ঘনিয়ে আসে মৃত্যু মুহূর্তে। আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটি মাত্র দাবী— সে বলে 'মনে রেখো'। তবু মৃত্যু জীবনকে নিয়ে যায়। কিন্তু জীবনের প্রতি জীবনের যে প্রীতিময় অনুভব। তাকে নিয়ে যেতে পারে না। তাই 'মরণ পীড়িত চিরজীবী প্রেম' চিরদিনই বেঁচে থাকে। এখানেই পৃথিবীর প্রতি জীবনের প্রতি মানুষের মমতাময় আসক্তি।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় পিতা ও শিশু কন্যার রূপকাশ্রয়ী প্রকাশে চিত্রিত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের অন্তর্নিহিত প্রীতিমধুর সম্পর্ক। কবির শিশুকন্যার অমোঘ উচ্চারণ ভালোবাসার দাবীতে সুস্থিত।

"যেতে নাহি দিব না তোমায়"

তবু পিতাকে চলে যেতে হয়। তখনই তিনি উপলব্ধি করেন পৃথিবী জুড়ে চলেছে এই যাওয়া আসার লীলা। কবি দেখেছেন নিসর্গ পৃথিবীর সুদূরব্যাপী বিষাদমাখা মুখ, ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বজননীর হৃদয়ের চিরন্তন বেদনা। এই বেদনার মধ্য থেকেই তাঁর সুগভীর জীবনাসক্তি ও মর্ত্যমমতা উৎসারিত। কবি উপলব্ধি করেছেন যে পৃথিবীর খণ্ড খণ্ড বিচ্ছেদ একটি বৃহত্তর বিচ্ছেদ বলয়ে সমন্বিত, তাই আমরা ব্যক্তিগত বেদনার মধ্য দিয়েই বৃহত্তর বেদনাকে অনুভব করতে পারি। এই কবিতায় মানবজীবনের রূপক আশ্রয়ে চলে যাওয়া আর যেতে না দেওয়ার মধে দেখি বিশ্বের রসের লীলা জমে উঠেছে। আর সেই লীলা আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যপ্রীতিকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীকে ভালোবাসি বলেই তাকে ছেড়ে যেতে এত বেদনা।

এই সুগভীর মর্ত্যপ্রীতিই কবিতাটিকে অনন্য জীবনবোধ ও রসমাধুরী দান করেছে।

2.2.11 ঃ ঝুলন

'সোনার তরী' কাব্যের 'ঝুলন' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রিয় কবিতা। তাঁর সুকণ্ঠে এ কবিতা বহুবার আবৃত্ত হয়েছে। কবি নিজেই এই কবিতাটি বিষয়ে বলেছেন—

"আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে
বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে
তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই
সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই;
সেই পাওয়াতেই আনন্দ।"

কবি এখানেই আপনার নিঃসঙ্গ ও একান্ত সত্তাটিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। সমস্ত বিলাস বিভ্রমের আতিশয্যে অতিক্রম করে তিনি যাকে আবিষ্কার করেছেন সে কবির গভীরতর সত্তা বা "otherself" এতদিন বিলাসব্যসনে মুগ্ধ ও মত্ত থেকে কবি তাঁর গভীরতর সত্তাকে তুলে ছিলেন। দুর্যোগের রাত্রিতে সৌভাগ্যবশত তিনি সেই সত্তার মুখোমুখি হয়েছেন—

"প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ"

রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির নামকরণে রূপকার্থ প্রয়োগ করেছেন, তাঁর নিজের অন্যতর সত্তার সঙ্গেই তাঁর মিলন লীলা— দুজনের ঝুলন দোলায় আন্দোলিত হবার রূপক প্রয়োগ করেছেন। স্পষ্টতই বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা বা অনুষঙ্গেই এ রূপকল্পনা কবি চিত্তে জেগেছে। শ্রাবণ পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলায় ঝুলন উৎসব। সেখানে রাধা ও কৃষ্ণ এক দোলাতে দোলেন। বৈষ্ণবীর মতে রাধা ও কৃষ্ণ অভেদ, লীলা বিলাসের জন্যই তাদের পৃথক রূপভেদ। তাই তাঁদের ঝুলনলীলা আসলে একই আত্মার দুই রূপের মিলন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'ঝুলন' নামকরণে কবির নিজের অন্তরস্থিত দুটি সত্তার লীলাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যে অন্য সত্তা বা otherself কে তিনি ভুলে ছিলেন তাকেই ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মত্ত হয়েছেন।

কবি জীবনী থেকে জানা যায়, এই কবিতা লেখার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ পুরীতে দুর্যোগময় সমুদ্রদৃশ্য দেখেছিলেন। তারপরই রচিত হয় 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা যুগল। তাই এই কবিতার অবয়বে তআছে মত্ত তরঙ্গের ভীষণ লীলা। কবিতার শুরুতেই অতি দুর্যোগময়ী রাত্রির কথা বলা হয়েছে। 'সঘন বরষা গগন আঁধার' রাত্রিবেলায় কবি তাঁরই প্রাণের সঙ্গে মরণ খেলায় মত্ত হতে চাইছেন। কবির পূর্ণমানবসত্তা যেন জেগে উঠেছে— বাইরের প্রকৃতির উদ্দাম লীলাচাঞ্চল্য তাঁর অন্তরাত্মাকেও প্রবল বেগে আলোড়িত করেছে। সুখের বিলাসে কবির

অন্তরতম সত্তাকে ভুলে কবি এতদিন বাইরের আমিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু প্রবল দুঃখের ঝড়ে, দুর্দান্ত তরঙ্গাঘাতে তিনি সেই প্রাণবধূকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চান। এই ভাবকেই

তিনি আত্ম পরিচয় এ বলেছেন—

"মানুষ যখন আপন অধীন, তখন সে
সুখকেই চায়, প্রকৃতির সম্পদকেই চায়,
তখন তার শিশুর মত কেবল রসভোগের
তৃষ্ণা। তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে;
তখন সে দুঃখকে এড়ায় না, মৃত্যুকে
ডরায় না। এই অবস্থায় তার লক্ষ্য শ্রেয়। সেখানে
সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও
মৃত্যুর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে।"

জীবনমৃত্যুর এই মহামিলন লীলাই ঝুলন' কবিতায় আভাসিত। তাই বলেছেন—

"আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা"।

অন্তরতম সত্তার সঙ্গে ঝুলন লীলা অতি দুঃসাহসিক। অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার জন্যই এই ঝুলন খেলা। আসলে কবির অন্তলোকের লীলারহস্য দুই 'আমির' বিরহ মিলন 'ঝুলন' কবিতায় বর্ণিত। ললিতে কঠোরে বিপরীত এই দুই আমির লীলা রবীন্দ্রজীবনে নানা পর্যায়ে বিচিত্র রূপে বিলসিত। এক দুর্লভ লগ্নে কবিমানসের এই 'দুই পাগল' দুই সত্তা একত্রে মিলিত হয়। তাকেই কবি বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গে ঝুলননলীলার রূপকল্পে সার্থক প্রকাশ করেছেন।

2.2.12 ঃ নিরুদ্দেশ যাত্রা

"সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। প্রথম কবিতাতে 'গান গেয়ে তরী বেয়ে' যে এসেছিল— সে-ই কি 'নিরুদ্দেশযাত্রা'র নামহীনা সুন্দরী, যে কবিকে নিয়ে যায় অন্তহীন অভিযাত্রায়?

অস্ত সূর্যাভা ঝলসিত সাগরের সাগরের ওপর দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যার অভিমুখে সোনার তরণী অগ্রসরমান নিরুদ্দেশ যাত্রায়। উত্তম পুরুষে বিবৃত এই কবিতায় নেই প্রথম কবিতার জলঘেরা খেতে অপেক্ষমান কৃষকের রূপকাশ্রিত আড়াল। তরীর যাত্রী কবি—শঙ্কাব্যাকুল অথচ রহস্যমুগ্ধ। তরঙ্গাচঞ্চল জলরাশির ওপর দিয়ে ভেসে চলা তরণীর কর্ণধার এক নারী, রহস্যাবৃত মায়া কুহেলি ঘেরা অনাম্নী অঙ্গনা। গন্তব্যস্থল না জানলেও কবি সেই রহস্যময়ীর মোহনসঙ্গ স্বীকার করে তরীর যাত্রী হয়েছেন। তাই কবিতাটির নাম 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

অস্তসূর্যের রশ্মি আভায় দিগন্তে নেমেছে গোধূলির বর্ণাভা। আসন্ন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকারে আশঙ্কায় কবি ব্যাকুল। কিন্তু প্রভাতে যাত্রার শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাত্রার লক্ষ্য ও পরিণাম নিয়ে কবির প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলেনি কাণ্ডারী রমণীর কাছ থেকে। অজানা হাসিতে জড়ানো থাকে নিরুত্তর উত্তর।

এই কবিতার একদিকে আলো অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে পশ্চিম গগন কোণে সোনার আলো, অন্যদিকে অন্ধকারের ইঙ্গিত। কবিতার শেষ স্তবকে কবি জানিয়েছেন এই নিরুদ্দেশ যাত্রা হয়তো থাকবে অন্তহীন। অন্ধকারে ঢাকা পরিমণ্ডলেও কানে বাজবে জলকলধ্বনি। সেই আলোকে-আঁধারে কবি অনুভব করবেন অনামিকা সুন্দরীর কেশস্পর্শ। তিনি জানবেন সেই তাঁর যাত্রাপথের নিয়ন্ত্রী। কিন্তু নিরুত্তর সেই সুন্দরী কবিকে নিয়ে যাবে অন্তহীন অন্তহীন অভিযাত্রায়—তার যাত্রা নিরুদ্দেশ যাত্রা। প্রকৃতপক্ষে রহস্য অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের আকর্ষণে অজানা সৌন্দর্যলোকের দিকে কবির যাত্রা তাঁর ভূমিকা চিরপথিকের অন্তহীন অভিযাত্রা। রোম্যান্টিক কবি মনের eternal quest বা অনন্ত অন্বেষই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মূল ভাববস্তু।

কবিতার চতুর্থ স্তবকে জীবনপ্রভাত ও পঞ্চমস্তবকে জীবনসন্ধ্যার উল্লেখ সম্ভবত মৃত্যুর অন্ধকারের গভীর অনিঃশেষ যে যাত্রা তাকেই আভাসিত করেছে। জীবনে মরণে সৌন্দর্যের অজানা কল্পলোকে কবির অভিযাত্রা। আর এই কারণেই কবিতাটির নাম নিরুদ্দেশযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের দ্বিবিধ আকাঙ্খার দোলাচলতা নিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—মানুষের সুখদুঃখপূর্ণ ভালোবাসা অথবা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা কোন্‌টি তাঁর কাম্য, তা তিনি নিজেই বোঝেন না।

'সোনার তরী'র এই শেষ কবিতায় তাঁর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্য আকাঙ্খাই সত্য হয়ে উঠেছে।

আসলে রবীন্দ্রমানসের মূল সুর রোম্যান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতাই এ কবিতার 'থিম'। এই ব্যাকুলতা নিরুত্তর অনুভবের বেদনার সঙ্গে লগ্নিত, কারণ সেই অনির্দেশ্য সৌন্দর্য্যলোকে কল্পনাকেই পাঠানো যায়, সশরীরে উপস্থিত হওয়া যায় না। তাই জেগে থাকে বিরহ ও রোম্যান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতা। এজন্যেই কবিতাটির অবস্তরে ও অন্তর্বয়নে কয়েকটি প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, যার উত্তর থাকে অনুচ্চারিত। ফলে সমস্ত কবিতায় এক বিষাদ মধুর রহস্যকুহেলি ছায়া ফেলে যায়, মায়া জড়ায়। প্রতিটি স্তবকেই এই অচেনা মাধুরী জড়ানো। "Strangenses added to Beauty" নিরুদ্দেশ যাত্রার সেই নাবিক রমণী কবির মনোলোকের সৌন্দর্য প্রতিমা। তার হাসির রহস্য সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে কবিতার সর্বত্র। এ কবিতার ইংরেজি অনুবাদেও এই হাসির কথা বর্ণিত।

"The silence of the smile fell on my questions like
The silence of sunlight on waves"

নিরুদ্দেশযাত্রা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যস্বরূপ সন্ধানমূলক কবিতা। এর পূর্ববর্তী মানসীর 'মেঘদূত', 'সোনার তরী'র নামকবিতা ও 'মানসসুন্দরী'—প্রতিটিতেই কবির আকুল প্রশ্ন অথবা বেদনাবিধ উচ্চারণ ধ্বনিত।

কিন্তু 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় কোনো ক্ষোভ বা হতাশা নেই। কূলের জন্য ব্যাকুলতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা অবসিত। কবি উপলব্ধি করেছেন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি যখন নামবে তখনও তাঁর যাত্রা থাকবে অব্যাহত—রূপ হয়ে উঠবে অরূপ এবং এই পথেই তিনি পাবেন সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকের দুর্লভ সঙ্গ।

অস্তসূর্যের রশ্মি আভায় দিগন্তে নেমেছে গোধূলির বর্ণাভা। আসন্ন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকারে আশঙ্কায় কবি ব্যাকুল। কিন্তু প্রভাতে যাত্রার শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাত্রার লক্ষ্য ও পরিণাম নিয়ে কবির প্রশ্নের কোনো

অন্য রূপে ও অন্য নামে এ কতিায় দেখা যায়। "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী"— এতে ধ্বনিত হচ্ছে ভবিতব্য, এক অনতিক্রম্য নিয়তি। এর অন্তরালে আছে একটি অচেতন কিন্তু পূর্ব নির্দিষ্ট অভিপ্রায়, কাণ্ডারীটি কবির নিয়তিরই প্রতিভূস্বরূপ।"

'মানসসুন্দরী' কবিতার মতই 'নিরুদ্দেশযাত্রা'র ঘটনাকাল সন্ধ্যালগ্ন। নায়ক এখানেও জিজ্ঞাসু ও নায়িকা দুর্বোধ্য। এর নায়িকা 'বিদেশিনী' ও 'পশ্চিম' শব্দটির জন্য সমালোচক একে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত বলেন। টেনিসনের 'Voyage' কবিতার প্রতি তুলনাও অনেকে মনে আনেন, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা মনে করি এই 'সুন্দরী' কবির অন্যতম প্রেরণা যা তাঁকে নিয়ে চলেছে সৌন্দর্যলোকে অসীম নিরুদ্দেশযাত্রায়। অজানার উদ্দেশ্যে রোমান্টিক অভিসার যাত্রাই তার প্রেরণা।

2.2.13 ঃ অনুশীলনী

১। সোনার তরী কাব্যে প্রতিফলিত কবির মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় দিন।

২। সোনার তরী কাব্যের 'নামকরণ' আলোচনা প্রসঙ্গে এর নাম কবিতাটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'পরশপাথর' কবিতায় মূল ভাব ব্যক্ত করুন।

৪। 'দুই পাখি' কবিতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

৫। 'ঝুলন' কবিতাটির মমার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবিতাটির নামকরণের তাৎপর্য বোঝান।

৬। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় প্রতিফলিত রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৭। 'মানস সুন্দরী' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

2.2.14 ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথ পরিক্রমা— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

২। রবীন্দ্রনাথ প্রবাহ— প্রমথনাথ বিশী

৩। রবিরশ্মি ১ম — চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা— নীহাররঞ্জন রায়।

একক 3 ❑ শ্যামলী

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 পাঠ ও আলোচনা

3.2.1 শ্যামলী ঃ এই যে কালো মাটির বাসা

3.2.2 দ্বৈত

3.2.3 আমি

3.2.4 হঠাৎ দেখা

3.2.5 বাঁশিওয়ালা

3.2.6 চিরযাত্রী

3.2.7 অনুশীলনী

3.2.8 গ্রন্থপঞ্জি

3.1 ঃ প্রস্তাবনা

'পুনশ্চ' পূর্বে শ্যামলীর আত্মপ্রকাশ। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে সময়কালে 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', পত্রপুট ও 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ এই কাব্য চারটিতে দেখা গেল।

3.2 ঃ পাঠ ও আলোচনা

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে বিচিত্র স্বাদবাহী কবিতার দেখা মেলে। প্রেম মূলক দ্বৈত' ও বাঁশিওয়ালা গতিময়তার তত্ত্ববাহী 'চিরযাত্রী', আমিতাবোধক 'আমি' ও কাহিনীধর্মী 'হঠাৎ দেখা'।।

3.2.1 ঃ শ্যামলী ঃ এই যে কালো মাটির বাসা

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রকাব্য 'শ্যামলী'। সমকালীন এক কাব্যবৃত্তে এর অবস্থান। রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ কালে 'শ্যামলীর' আত্মপ্রকাশ। 'পুনশ্চ' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে,

'শেষসপ্তক' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে এবং শ্যামলীর সমকালে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল পত্রপুট। গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যচতুরঙ্গে।

বাংলা কাব্যে গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, লিপিকাতে তার সূচনা হয়েছিলো। পরে 'বলাকা' কাব্যের মুক্ত এক ছন্দে তার অস্ফুট আভাস মিশেছিল—পরবর্তী 'পলাতকা' ও 'মহুয়া'য় প্রবহমান ছিল তাঁর প্রবাহ এবং 'পুনশ্চ'তে এসে ঘটলো তার দ্বিধামুক্তি।

এই চারটি কাব্যে রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনও ঘটেছে। বহিরঙ্গ কাঠামোর এসেছে গদ্য ছন্দের নির্মাণ কৌশল এবং অন্তরঙ্গ ভাবনায় যুক্ত হয়েছে নন্দিত সৃষ্টির শিল্পসুষমা।

'পরিশেষে' কাব্যগ্রন্থ লিখে কবি একটি অধ্যায় বা পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সময়ের চলমানতায় নতুন পাথের বাঁকে দাঁড়িয়ে কবি মুখ ফেরালেন— দেখলেন সামনে দাঁড়ানো নতুন কালকে। তখনই কাব্যক্ষেত্রেহল 'পুনশ্চ সংযোজন। একাব্যের 'নতুন কাল' কবিতায় কবি নতুন সমাজের উপযোগী নতুন মনন কল্পনার কথা বললেন—

"আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে"

নতুনকালের বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তাদেরই দুঃখের ভাষায়, কথ্যরীতিতে, নিরলংকার সহজ সরল ছন্দে সাজালেন কাব্যকে; 'শ্যামলী' কাব্যে তার পূর্ণতর প্রকাশ ঘটলো।

'শ্যামলী' কবির শেষ বেলাকার মাটির ঘরের নাম। মাটির বাসার কথা তাঁর কবিতায়, গানে বারবার ফিরে এসেছে।

"এই যে কালোমাটির বাসা
শ্যামল সুখে ভরা"

বাংলাদেশের শ্যামল মাটি, সবুজ ঘাস, বনপ্রান্তর বর্ষার জসল শ্যামলিমার সঙ্গে বাংলার শ্যামলবরণ স্নিগ্ধ মেয়েকেও কবি ভালোবাসেন। 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থের 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'শ্যামলী'র দেখা পাই।

"জগৎ সামান্যতার, তারি ধূলি পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে"

'শেষ সপ্তক' কাব্যের ৪৪ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

"আমা শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী"

ধূলার ধরণীর 'শ্যামলী'ই তাঁর শেষ বেলাকার আশ্রয়। আয়ুর প্রদোষকালে আমাদের হৃদয়াকাশ স্মৃতির মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়; তখন সেই মানস স্থবিরতা থেকে মুক্তি মেলে নিসর্গের উদার আশ্রয়ে; প্রকৃতির মাঝখানে এই শ্যামলনীড় সেই নিসর্গ অনুধ্যান ও অবগাহনের পরম আশ্রয়। শ্যামলীর কবিতায় সেই নিসর্গ অবগাহন শেষ পর্য্যন্ত এক অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে পেয়েছে পরম মুক্তি। কবি জীবনের সায়াহ্নবেলায় অধ্যাত্মভাবনার পথে অনুকূল এই অনাড়ম্বর মাটির বাসা; তার নিরাসক্ত উদাসী বিবাগী হৃদয় এই গদ্যকাব্যে ধরা পড়েছে।

এ কাব্যের অনেক কবিতায় মানবসত্তার অনন্য উপলব্ধি গভীর সুরে মন্ত্রিত। 'আমি' 'চিরযাত্রী' 'প্রাণের রস' কবিতায় সেই অনুভব দ্যোতনা আছে।

কবির শেষ বেলাকার কাব্যের বিশিষ্ট ধারা— প্রেমভাবনা। এ কাব্যেও অনন্য কয়েকটি প্রেমকবিতার দেখা পাই যাদের মধ্যে আছে দ্বৈত, বাঁশিওয়ালা, হারানো মন।

গদ্য কবিতার মধ্যে আখ্যায়িকামূলক কবিতা 'পুনশ্চ' থেকেই রচিত হয়ে আসছে। স্মৃতিমেদুর কয়েকটি অসামান্য কাহিনীধর্মী কবিতা 'শ্যামলী' কাব্যের বিশিষ্ট সম্পদ—এদের মধ্যে আছে 'হঠাৎ দেখা', 'কবি', 'দুর্বোধ', 'অমৃত'। প্রেম কবিতা ও কাহিনী কবিতার মধ্যে অনেক সময়ই লেগেছে প্রথম যৌবনের প্রেমস্মৃতির বর্ণিমা।

জীবনের অপরাহ্নে কবি তাঁর মাটির বাসায় বসে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস ভরে নিচ্ছেন আপন চেতনায়, নিসর্গ ভাবনা কখন যেন মিশে যাচ্ছে অধ্যাত্মভাবনায়—সেই সঙ্গে 'তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া' ঘেরা মধুর প্রেমকেও নূতনভাবে উপলব্ধি করছেন। প্রাণেতে প্রেমেতে বিশ্বলীলার বাসা— শ্যামলী। একাব্যে আছে সেই অনুভবের শ্যামলিমা।

3.2.2 ঃ দ্বৈত

'শ্যামলী' কাব্যের প্রেম কবিতা, রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মী, রোম্যান্টিক মনোলোকের সৃষ্টি। প্রেমের চিরন্তন রহস্য নানাভাবে কবি কল্পনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবনের আবেগ উচ্ছলতা না থাকলেও মনন সমৃদ্ধ কল্পনার ঐশ্বর্যে কবিতাগুলি উজ্জ্বল। জীবনসায়াহ্নে অভিজ্ঞতালব্ধ কবি প্রেমের রহস্য ও জীবনদর্শন যেন দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন।

'শ্যামলী' কাব্যের প্রথম কবিতা-দ্বৈত। এর নামের মধ্যেই যুগল জীবনের লীলার আভাস। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রেমিকের আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই সৃষ্টি হয় প্রেমিকা। প্রেমের দৃষ্টিতে যে সৃজনীশক্তি তা-ই প্রেমিকাকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে।

এই ভাবনাকে কবি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে জানিয়েছেন। নিসর্গর রূপ মাধুরী বিশ্বলোক থেকে মর্ত্যলোকে যখন মুক্তি পায় তখনই তার চরিতার্থতা। উষার সোনার বিন্দু যখন ধরাতলে অরুণরাঙা আভাসে আলো আনে

তখন পৃথিবীর শ্যামলিমায়তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে। অসীম যখন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ে, তখনই তার পূর্ণতা। নারীর সুতনু সৌন্দর্য ও ললিত মাধুরীও তেমনি পূর্ণতা পায় প্রেমিক চিত্তের অনুধ্যানে। প্রেমের মধ্যে আছে সৃষ্টিশীল সত্তা যা তার মানসীকে তোলে নবসাজে। তাই প্রেমিক সত্তার স্বগত উচ্চারণ—

"দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।"

বিশ্বলীলার মোহনরূপ যখন মর্ত্যলীলায় বাঁধা পড়ে, তখনি তার প্রকৃত রূপের উদ্ভাসন। বিধাতার লীলা মানবমনে তেমনি নতুনরূপে প্রতিভাত হয়। প্রেমই সাধারণকে অসাধারণ, তুচ্ছকে মূল্যবান করে তোলে। রোম্যান্টিক লীলাবাদের মূল কথাই তাই। মানবী মূর্তি প্রেমের পরশেই 'মানসী'তে রূপান্তরিত হয়।

"আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে"

দ্বৈত ভাবনার এই লীলাই বলাকার ২৯ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে ভগবানের সঙ্গে মানুষের লীলা আধ্যাত্মভাবনায় আপনাকে প্রকাশ করেছিল। কবি বলেছেন ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করবার আগে তাঁর নিজের স্বরূপই উপলব্ধি করতে পারেননি।

"যেদিন তুমি আপনি ছিলেন একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

★★ ★★ ★★ ★★

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটলো আলোর আনন্দ কুসুম

★★ ★★ ★★ ★★

আমি এলেম তাই তো তুমি এলে
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।"

—এই অনুভবের আলোতে দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের লীলা সার্থক; সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। লীলাতত্ত্বের এই প্রকাশ 'বলাকা'য় দেখেছি।

'শ্যামলী' কাব্যের 'দ্বৈত' কবিতায় এই ভাবনাকে প্রেমিক-প্রেমিকার লীলারহস্যে আভাসিত করেছেন কবি। প্রেমিক চিত্তের অনুভবেই প্রেমিকার সর্বোত্তম প্রকাশ। এই অনুভবই গানের বাণীতে মুক্তি পেয়েছে—

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

তোমারে করেছি রচনা

তুমি আমারি তুমি আমারি"

বিধাতার সৃষ্টি যে নারী, প্রেমিকাচিত্ত তাকে নবরূপে সৃজন করে। যে ছিল একলা বিধাতার, প্রেমিক তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে দেয় পূর্ণতা। দুজনের আনন্দ, দুজনের বেদনা মিলেমিসে এক হয়ে যায়।

"দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে

কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে

নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোক

মোদের মিলিত নয়নে"

এই দ্বৈত জীবনের মাধুরীই কবিতাটিতে বর্ণিত। প্রেমের মধ্যে আছে সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে যা সাধারণকে করে তোলে অসাধারণ।

3.2.3 ঃ আমি

'আমি' কবিতায় যে 'অস্মিতাবোধের' প্রকাশ তা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির ঐশ্বর্যকে প্রকাশ পেয়েছে। কবি বিশ্বাস করেন ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই ঘটে অসীমের প্রতিফলন।

'মানুষের অহংকার—পটেই

বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প'

বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য বিকশিত, তার চরম প্রকাশ ও উপলব্ধি মানবসত্তার মধ্যেই। নিত্যসত্তা যে 'আমি' তা আসলে অখন্ড অসীমের অংশ। সেই অখণ্ড অনন্য অসীম খণ্ড জীবনের উপলব্ধিতেই বিশ্ব-সৃষ্টিকে দেখতে পায়। মানুষ না থাকলে অসীমের প্রকাশ এমন সার্থক হতো না। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা

আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা

মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"

'আমি' অর্থাৎ মানব সত্তার মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টা নিজেকে খুঁজে পান।

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হতো যে মিছে"

মানবসত্তার এই পরম উপলব্ধিই 'আমি' কবিতায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রমননে সীমা-অসীমের যে স্বাজাত্য বোধের উপনিষদিক প্রত্যয় তা বারবার তাঁর কাব্যে সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

'আমি' কবিতায় সীমার মধ্যে সেই অসীমের রম্যবাণীর প্রকাশ। মানবমনের উপলব্ধিতেই বিশ্বসৌন্দর্যের সার্থকতা। আমার চেতনার রঙে যখন পাথর হয়ে ওঠে মরকতমণি, ফুল হয়ে ওঠে সুন্দরের প্রতীক—তখনই সৃজনলীলার চরম ও পরম সার্থকতা। এ নয় কোনো তত্ত্বকথা, এ জীবনের সত্য। কবি বলেছেন—

" এ সত্য

তাই এ কাব্য।

এ আমার অহংকার

অহংকার সমস্ত মানুষের হ'য়ে।"

'একাকী গায়কের নহে তো গান'— শিল্পী শ্রোতার যুগল মিলনেই তো গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃজনসম্পদকে তখনই সার্থক বলে অনুভব করবেন, যখন মানবসত্তার মধ্যে তা প্রতিবিম্বিত হবে। কবিত্ব তখনই সার্থক যখন তা শ্রোতা-পাঠকের কানে প্রতিধ্বনিত হবে। বিধাতা যদি তাঁর সৃষ্টিকে মর্ত্য মানবের ব্যক্তিত্বে প্রতিবিম্বিত না দেখতে পান তাহলে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্ব নিয়ে তিনি একা হয়ে যাবেন।

রবীন্দ্র ভাবনায় সীমা-অসীম এভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছে।

"অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা

মানুষের সীমানায়,

তাকেই বলেই 'আমি'।।"

মানবসত্তা এবং জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ব ও অসীম সত্তা, সৃষ্টি ও মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর চিন্তা ও জিজ্ঞাসা এই কবিতায় রূপ নিয়েছে বিশ্বপ্রসারী কবিকল্পনা সীমা ও অসীমকে মিশিয়েছে একটি বিন্দুতে।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে যে 'সোহং' মনত্র তা' যেন কবির শ্লিপে লাভ করেছে বাণীরূপ। গভীর মননসম্পদে যে অধ্যাত্মবোধ ও জীবনদৃষ্টি কবি জীবনের শেষ পর্যায়ের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে তারই নিদর্শন এই কবিতা। সৃষ্টির মূলে আছে আনন্দ সেই আনন্দধারা থেকেই সৌন্দর্য লীলার প্রকাশ, আবার প্রেমের আলোতেই সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য পরমতম সম্পদ হয়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম ও শেষ রহস্য আলো ও ভালোবাসার চরম প্রকাশ ও চরিতার্থতা মানবসত্তার মিলনে। তাই সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যাবে রসপিপাসু, আনন্দ অন্বেষী, প্রেম প্রার্থী মানবসত্তার অনস্তিত্বে। স্রষ্টা আপন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবেন মানবসত্তার 'আমিত্বে'। বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মুগ্ধ ভালোবাসার মন্ত্রে, সুন্দরের অর্ভ্যথনায়। মানবসত্তার 'আমিত্বে'র মধ্যেই আছে তার যথার্থ প্রকাশ 'বিশ্বআমি'র রচনার আসরে। ব্যক্তি-আমি'ই যথার্থ শিল্পী। বিশ্বস্রষ্টার সৃজন সম্পদ যখন আমি 'আমি'-র উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত তখনই তার পরিপূর্ণতা।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর"

3.2.4 ঃ হঠাৎ দেখা

'শ্যামলী' কাব্যের প্রেমকবিতাগুলি আছে স্নিগ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীর সহজ প্রকাশ। আধুনিক যুগের নতুন হাওয়ায় প্রেমেকে কবি উপলব্ধি করেছেন রোম্যান্স ও বাস্তবের যুগ্ম দৃষ্টিতে। গদ্য ছন্দে রচিত এর গল্পিকাগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। এতে যেমন রোম্যান্টিক স্মৃতি মেদুরতা আছে, তেমনি আছে মোহমুগ্ধতার অতীত এক মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী।

'হঠাৎ দেখা' 'কবি' 'অমৃত' তিনটি অসামান্য কবিতা— যার মধ্যে প্রেমের সহজ আলো বিকীর্ণ অথচ কোনো তত্ত্ব বা দার্শনিকতার প্রলেপ নেই। প্রণয়মূলক ঘটনা বৈচিত্র্য এই কবিতাত্রয়ীর উৎস। এ প্রসঙ্গে 'পুনশ্চ'র গল্পিকাগুলির কথা মনে আসে, কিন্তু তাদের সঙ্গে 'শ্যামলী'র কবিতাগুলির মৌল পার্থক্য আছে। 'পুনশ্চ'র 'সাধারণ মেয়ে' বা 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' শেষ হয়েছে নৈরাশ্য ও বিষাদে। কিন্তু হঠাৎ দেখা, কবি বা অমৃত কবিত্রয়ীতে নায়ক-নায়িকার মিলন না ঘটলেও বিচ্ছেদের বর্ণহীনতা বা রিক্ত হতাশা নেই— বেদন মাধুরীতেই এগুলি অন্যতর মাত্রা পেয়েছে, পেয়েছে অনুভব গভীরতা। প্রেমের অমলিন মহিমা হঠাৎ দেখা' কবিতাকে ঘিরে আছে। যা হারিয়ে যায়, তা কি কোথাও থেকে যায় বুকের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে, আশার মধ্যে, ইচ্ছের মধ্যে, গোপন গানের মধ্যে? হারিয়ে গিয়েও যা হারায় না, শুধু সময়ের পলিমাটি ভেদ করে জেগে ওঠে স্মৃতির চর-প্রেমের নেই চিরস্মৃত মাধুরীই এ কবিতায় প্রকাশিত। চিরজীবী প্রেমানুভব নানাভাবে, রবীন্দ্রকাব্যে ফিরে ফিরে এসেছে।

আলোচ্য কবিতায় চলমান রেলগাড়ীর কামরায় হঠাৎ দেখা নায়ক-নায়িকার; অদূরে অতীতের টুকরো টুকরো স্মৃতির মালায় তাদের হারিয়ে যাওয়া দিন অনুভবের আয়নায় ধরা পড়ে। কবি এদের নির্দিষ্ট নামকরণে সুচিহ্নিত করেন নি, তাই বিশেষ হয়েও এরা বিস্তৃতি লাভ করেছে নির্বিশেষের মধ্যে।

'পুনশ্চ'র 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় দেখেছিলাম কমলা চিনতে চাইছে না বলে নায়কের উপলব্ধি—

"আমাকে সে যে চিনেছে

বুঝলেম

আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই"

'হঠাৎ দেখা'য় "সে রইল জানালায় বাইরের দিকে চেয়ে

যেন কাজের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে"

'পুনশ্চ'র পরবর্তী কাব্যধারায় রোম্যান্টিক কবি ভাবনার সঙ্গে মিলেছে রিয়ালিস্টিক সমাজভাবনা। তাই অনাদি কালের হৃদয় উৎস থেকে উৎসারিত দুটি হৃদয়ের সার্থক প্রেম এখানে বাস্তব পরিণতি পায়না। আধুনিক যুগের নির্মমতা প্রেমকে করে বিচ্ছিন্ন। তাই পরস্পরকে ভালোবাসার উত্তাপটুকু হৃদয়ে মেখে বিরহের বেদনায় তারা বিদ্ধ হয়। আবার প্রাত্যহিকতার দায় মেটাতে, জীবনের হিসেব মেলাতে মেলাতে প্রেম হয়ে যায় দূরস্মৃত কোনো অনুভব মাত্র।

তারপর হঠাৎ একদিন তাদের দেখা হয়ে যায় রেলগাড়ীর কামরায়। কবিতায় 'রেলগাড়ী' যেন কালের চলমানতার প্রতীক, অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভাবীকালের দিকে তার যাত্রা।

'রেলগাড়ীর কামরায় হঠাৎ দেখা

ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন'

অথচ সম্ভাবনার স্বপ্ন কোথায় যেন সুপ্ত ছিল; গতিশীল আধুনিক জীবন যেন রেলগাড়ীর ভ্রমণের মত নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি রেলস্টেশনে, অপেক্ষা করে আছি গন্তব্যে পৌঁছবো বলে। যাত্রীরা উঠছে, নামছে এমনই প্রাত্যহিকতার মধ্যে হঠাৎ নায়ক-কথক দেখা পেয়ে যায় তার হারানো দিনের মানসীর। বুকের কোন্ গোপন তারে যেন কাঁপন লাগে। 'হঠাৎ দেখা' যেন বহুমূল্য রত্নের মত এক আশ্চর্য সম্পদ, সে অসম্ভব ছিল বলেই অসম্ভব তার মূল্য।

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর এই হঠাৎ দেখা যেন নায়ককে নিয়ে যায় স্মৃতিচারণার মহাঙ্গনে। তাই মনে মনে অতীত কালের ছবি আঁকে নায়ক-ব্যর্থ বসন্ত যেন রক্তিম অনুভবে মঞ্জরিত হয়ে ফিরে আসে তার জীবনে। তার মনে পড়ে আগে ওকে বারবার দেখা গেছে লালরঙে শাড়িতে-দালিম ফুলের মতো রাঙা সেই রঙ লেগেছিল দুটি মুগ্ধ হৃদয়েও। অতীতের দিন আজ ধূসরিমায় আঁকা—তাই কালো রেশমের শাড়ীতে আঁচল তোলা মাথায় একটা

গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে আছে চারপাশে। রক্তরাঙা শাড়ির বদলে কালো রঙের প্রয়োগ কবি করেছেন সচেতন ভাবেই। প্রেমের রক্তিম স্পর্শ যেন বিরহ বেদনার কালিমায় ঢাকা পড়েছে।

"থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা

চেনা লোককে দেখলেন অচেনার গাম্ভীর্যে"

—এই অচেনার আভাস-ই প্রেমিক যুগলের মাঝে এনেছে অপরিচয়ের আড়াল ও দূরত্ব। কিন্তু এই ব্যবধান ও দূরত্ব আসলে সত্য নয়, কেবল দৃষ্টির অস্বচ্ছ সীমাবদ্ধতা। সাঁঝের আকাশেও সন্ধ্যাতারা যে আসলে ভোর আকাশের শুকতারা সেই অনুভবেই প্রেমমধুরিমার প্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

তাই স্বল্পায়তন গদ্য কবিতাটির দ্বিতীয় পর্বে নায়ক নায়িকার মধ্যে কথোপকথনের শুরু। রোম্যান্টিক কবিতায় লেগেছে সমাজ বাস্তবতার ছোঁওয়া। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে আলাপচারিতা শুরু।

"সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনিতে" আপাত বিস্মৃত প্রেমের চিরস্মৃত অনুভব কবিতাটির অবয়বে ছড়ানো। তাই অনেক না বলা কথার আভাস জড়ানো রইলো অস্ফুট কিছু টুকরো সংলাপে। যে কথা দুজনেরই মনে তুলেছিলো স্মৃতি তরঙ্গের দোলা সেই কথাটিই অমোঘ প্রশ্ন হয়ে উঠে এলো নায়িকার উক্তিতে যে প্রশ্নটির জবাব এতকাল থেমে আছে সেটাই নায়কের মুখে শুনতে চেয়ে মেয়েটি শুধায়—

"আমাদের গেছে যে দিন

একেবারেই কি গেছে

কিছুই কি নেই বাকি?"

এর জবাবে নায়কের উত্তর—

"রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।"

প্রেমের বিস্মৃত-চিরস্মৃত মহিমার অনন্য স্বীকারোক্তি। প্রেমের এই চিরজীবী শক্তিকেই এর আগে কবিপ্রকাশ করেছেন অন্যভাবে।

"ভুলে থাকা নয় তো ভোলা

বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা"

—রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে বহুবার প্রেমের শক্তি ও গৌরব স্বীকৃতি হয়েছে। 'হঠাৎ দেখা' কবিতাতেও সেই স্বীকৃতির পরিচয়। আকস্মিকতার কিরণে দীপ্ত স্মৃতিমন্থিত কবিতাটি যেন এক দীর্ঘশ্বাস। এক নিরুচ্চার বেদনা ও

স্মৃতিমাধুরী কবিতাটিকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। কিন্তু আধুনিক জীবনের সত্যরেখায়কবিতাটি উজ্জ্বল। তাই নায়কের স্বগতোক্তি তার দ্বিধা ও আত্মজিজ্ঞাসাকেই তুলে ধরে "খটকা লাগলো, কী জানি বানিয়ে বললেম নাকি"।

এই দ্বিধা আসলে অস্থির আধুনিক যুগযন্ত্রণার ফসল। স্মৃতি পিপীলিকা কি সত্যিই আজ আমার রন্ধ্রে মৃতমাধুরীর কণা সঞ্চিত করে নাকি চলমান জীবনধারায় স্মৃতিও আজ অচঞ্চল নয়—এই স্বগত প্রশ্নের দোলাচলতায় দ্বিধাজর্জর নায়কচিত্ত।

এই অস্থির চঞ্চল বর্তমান জীবন কি অতীত স্মৃতিকে চিরজীবী করে রাখতে পারে—এ প্রশ্ন আধুনিক কালের অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনুত্তর থেকে যায়।

তাই কবিতার শেষ চরণ—

"সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে

আমি চললেম একা।"

অতীত প্রেমের স্মৃতিমাধুরী নিয়ে এভাবেই প্রাত্যহিক দিন যাপনের পথে একাকী এগিয়ে চলে নিঃসঙ্গ মানবসত্তা। যে দুঃখকে ভুলে থাকার মত দুঃখ আর নেই প্রেমের সেই চিরস্মৃতি বেদনমাধুরীর গৌরবেই কবিতাটি শেষ হয়েছে। সেখানে সবাই নেমে গেলেও নায়ক অবিরাম এগিয়ে চলে—আধুনিক যুগ জীবনের একক নিঃসঙ্গ প্রেমিক সত্তা। 'অভাবনীয়র কচিৎ কিরণে দীপ্ত' এই 'হঠাৎ দেখা'য় তাই বাস্তব দৃষ্টি ও রোম্যান্টিক প্রেমানুভব একই সঙ্গে মিলে গেছে।

3.2.5 ঃ বাঁশিওয়ালা

'শ্যামলী' কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা 'বাঁশিওয়ালা' রবীন্দ্রপ্রেম কবিতায় ধারায় এক অনন্য সংযোজন। গল্প রসাশ্রয়ী এই কাহিনী কবিতার বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রমনোলোকের রোম্যান্টিক প্রেমভাবনায় পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব। দেহাশ্রিত প্রেম ক্ষণস্থায়ী মরণশীল, কিন্তু দেহাতীত প্রেম অক্ষয়, মরণজয়ী, মর্ত্যের মানুষকে মহিমান্বিত করে প্রেম—এই ভাবনাই তাঁর প্রৌঢ় বয়সে লেখা 'শ্যামলী' কাব্যেও অনুসৃত হয়েছে। 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় প্রেমের মর্ত্যলোক থেকে অমর্তলোকে যাত্রার কথা বলা হয়েছে।

কবিতাটিকে বলা যায় রূপক। নারীর মধ্যে যদি প্রেমের সঞ্চার ঘটে, যদি সে তার অন্তরের প্রেমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে সেই প্রেমের গৌরবে সে অন্তরে অমৃতময়ী হয়ে ওঠে।

সত্যিকারের প্রেম নারীকে করে তোলে কল্যাণী, করে তোলে শক্তিময়ী, করে তোলে বিদ্রোহিনী। এই অনুভবের কথাই রূপকের আড়ালে বাঁশিওয়ালা' কবিতায় আভাসিত। বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে নিজের মধ্যে যেন নতুনকে আবিষ্কার করতে চায়, পাঠকের মনে পড়তে পারে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'মালতী' নামের একটি মেয়ের কথা লিখেছিলেন; তাকেই যেন এই কবিতায় আবার খুঁজে পাওয়া গেল। কবির মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা বাংলাদেশের মেয়েকে পুরোপুরি গড়ে তোলেননি, রেখেছেন আধাআধি করে। গতানুগতিক জীবন কাটাতে কাটাতে তার দিন যায়। নিজের জীবনের ক্লান্তিতে যখন সে বিবর্ণ, তখনই যেন বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুর বেজে ওঠে। এই বাঁশি প্রেমের মোহনিয়া ডাক যা একসময়ে প্রতিটি মেয়ের জীবনে রোম্যান্টিক স্বপ্নাভিসারের আমন্ত্রণ বয়ে আনে। তার মরা নদীর মতো জীবনে ভরা জোয়ারের দুকূল ছাপানো প্লাবন তখনই আসে। এই ডাক আসলে নবযৌবনের আবাহনের ডাক। সাধারণ মেয়েও তখন নিজের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে ছুটে যেতে চায়। বাঁশিওয়ালার ডাকে যেন তার নতুন জন্ম হয়। তার অতিসাধারণ জীবনের গতানুগতিক প্রহরে বাঁশি শুনে জেগে ওঠে বিদ্রোহিনী নারী সত্তা। এতদিন যে ছিল ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে, যে কেবল লুকিয়ে কাঁদতে জানতো, নিজের মধ্যে আগুনের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠলো নতুন করে। রবীন্দ্রনাথ অতিসাধারণ নারীর জীবনেও প্রেমের স্পর্শে অসামান্য জাগরণের কথা বলেছেন এই কবিতায়, প্রেমের অসামান্য শক্তি সাধারণকেও করে তোলে অসাধারণ। তখন বিবর্ণ বর্তমান থেকে বর্ণময় ভবিষ্যতের স্বপ্নসম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নারীর অন্তরতর সত্তা। বাঁশিওয়ালা সেই অন্তর্লোকের চিরকালীন প্রেমের আহ্বান, যা মর্ত্যজীবনে আনে অমর্ত্য মাধুরীর অনির্বচনীয় অনুভব।

কবিতাটির সঙ্গে 'পুনশ্চ'র সাধারণ মেয়ে কবিতার কোথায় যেন আছে অন্তর্লীন সাদৃশ্য। সেখানে লেখক শরৎবাবুকে অন্তঃপুরের এক সাধারণ মেয়ে লিখেছিল খোলা চিঠি—তার একান্ত অনুরোধ ছিল দরদী লেখকের কাছে—তিনি যেন তাকে নিয়ে একটি গল্প লেখেন।

এখানে বাংলার শ্যামল মাটির শ্যামলী কন্যা বাঁশিওয়ালাকে লিখেছে চিঠি—তার বাঁশির সুরে সে শুনতে চায় তার নতুন নাম। দুটিতেই প্রেমের বেদনা, আনন্দ ও প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপে দুটি ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

সাধারণ মেয়ে মালতী তার মিলিয়ে যাওয়া প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের বঞ্চনাকে জয় করার অসম্ভব স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছে। দরদী লেখকের কাছে তার অনুরোধ সীমাবদ্ধতার সীমানা ছাড়িয়ে তিনি যেন তাকে মুক্তি দেন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। সে জানে তার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কৃপণ বিধাতার করুণা বর্ষিত হবে না সাধারণ মেয়ের জীবনে।

কিন্তু বাঁশিওয়ালার অনামিকা মেয়েটি প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী হতে চেয়েছে। অতি সামান্য মেয়েটি প্রেমের জোয়ারে যেন জেগে ওঠে; তার মরাজীবনের ভাঁটার টানে লাগে জোয়ারের কাঁপন—সেই প্রেমের জোয়ার যখন আসে তখন অতি সাধারণ মেয়েও হয়ে ওঠে আত্মশক্তিতে উদ্দীপিত। সেই সাধারণ মেয়ে আর এই

শ্যামলী কন্যা এক জায়গায় মিশে যায়। সাধারণ মেয়ে 'ফরাসি জার্মান না কাঁদতে শুধু জানে।'

শ্যামলীর মেয়েটিও একই উচ্চারণে বলে

'কঠিন করে জানিনে ভালোবাসতে

কাঁদতে শুধু জানি

জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।'

'সাধারণ মেয়ে' প্রেমের বঞ্চনা আর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে জেগে উঠেছিল; অসম্ভব স্বপ্ন পূরণের দুর্মর বাসনায় সে চেয়েছিল প্রাণশক্তিতে জেগে উঠতে;

'বাঁশিওয়ালা'র অনাম্নী অঙ্গনা জেগে ওঠে প্রেমের অভিষেকে। যৌবন নিকুঞ্জে যখন প্রেমের পাখী জাগরণের গান শোনায়—তখন সব দ্বিধা সঙ্কোচ ঘুচিয়ে 'ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে' জেগে ওঠে, তার বিদ্রোহিনী সত্তা তাকে বাঁধন ছেঁড়ার সাধন পথে ডাক পাঠায়। সব মেয়েই কোনো না কোনো পরম লগ্নে জেগে ওঠে আত্মপ্রত্যয় দীপ্ত প্রেমের মন্ত্রে, তার সুপ্তির ঘোর ভেঙে যায় বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে।

3.2.6 ঃ চিরযাত্রী

কবিতাটির নামকরণেই আছে গতিময়তার আভাস। বারবার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানবসত্তার চিরপথিক রূপ এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

'বলাকা' কাব্যে যে গতিবাদের তত্ত্ব প্রকাশিত, রবীন্দ্রমনে তার একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়ে গেছে। প্রকৃতির মধ্যে, বিশ্বছন্দে এক অশান্ত গতিবেগ বর্তমান। কবি মনে করেন এই চলমান গতিপ্রবাহের মধ্যে মানবজীবনেরও চরম সত্যরূপ নিহিত। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গতিময় বিবর্তনই মানবজীবনের সত্য। জড়ত্বের বন্ধন ঘুচিয়ে মৃত্যুভয় বিপদবাধা তুচ্ছ করে নবজীবনের চিরযাত্রা অবিরাম চলেছে। 'ফাল্গুনী' নাটকে এই চিরযাত্রার, নবায়মানতার, কথাই ধ্বনিত।

'শ্যামলী' কাব্যের 'চিরযাত্রী' কবিতায় এর চিরপথিক সত্তার কথা প্রকাশিত। 'বলাকা' কাব্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে অবিরাম চলার সুর—"হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে"

"চিরযাত্রী' কবিতায় দেখি—

"আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি

—পেরিয়ে চলো

পেরিয়ে চলো।"

মানবসভ্যতার ইতিহাস এই গতিময়তার ইতিহাস। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই চিরযাত্রা শুরু। প্রাক-পুরাণিক

কালের সিংহদ্বার দিয়ে সন্ধানী পর্যটক, সাধকের দল বেরিয়ে পড়েছে— নব আবিষ্কারের আনন্দ ও আশা তাদের অভিযাত্রাকে করেছে অব্যাহত।

অতীতকাল থেকে অনাগত কালের উদ্দেশ্যে চিরযাত্রী মানবের এই অনন্ত পথচলা অব্যাহত। যুদ্ধভেরী যেমন সৈনিকদের রাখে অতন্দ্র, তাদের ডাক পাঠায় সংগ্রামের উত্তেজনায়, তেমনভাবেই মানবসভ্যতার ইতিহাসে অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে নিত্যকালের দুন্দুভি। আরামের গৃহকোণ, নিরাপদ সুখশয্যা ছেড়ে অভিযাত্রীদল চলেছে সুদুর্গমের পথে। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার লক্ষ্যে দুর্গমের হাতছানিতে পথে নেমেছে মানুষ যুগে যুগে। অনাদিকাল থেকে অনাগত কালের দিকে তাদের অনন্ত যাত্রা।

—'কোনো আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে
পাথের ছিল পথেই।"

—এই চলমানতাই জীবনের সুর। মানবসত্তার মধ্যেই আছে এই অভিযাত্রার অভীমন্ত্র। তাই তার যাত্রার শেষ নেই। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়েও তার শান্তি নেই, সমস্ত জীবনই এক অনিশ্চিত রণাঙ্গন—

"যুদ্ধ হয়নি শেষ
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি"

তাই রক্তে লেগেছে মাতন, নতুন উদ্যমে আবার পথে নামার পালা।

কবির মনে হয়েছে মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে যে পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছিল, তার শেষ হয়নি, তার কোনো শেষ নেই। প্রতি মুহূর্তেই সজাগ থাকতে হবে, কবে আসবে আদেশ— "বন্দরের কাল হল শেষ"—এবার যাত্রীদলকে যেতে হবে।

যুদ্ধ জয় আসলে নতুন করে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতিকেই নির্দেশ করে। কালের রথচলা রাস্তায় জয়ের নিশানা তুললেও তা বারবার চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে, আবার জয়যাত্রায় নতুন অভিধানে যাবার জন্য চিরপথিক যাত্রীকে প্রস্তুত হয়।

মানুষের সমস্ত জীবন এই পথ চলার ইতিহাস। জীবনপ্রবাহ এই চলমানতার ছন্দে প্রথিত। থেমে থাকাই মৃত্যু। গতিই প্রাণের মন্ত্র। তাই মানুষের চিরযাত্রা অব্যাহত কারণ কালপ্রবাহ অনন্ত বহমান। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে পথিক দলের অভিযাত্রা তাই শাশ্বত—আকাশে বেজে চলেছে নিত্যকালের ভেরী—যাত্রী দলের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছে অবিরাম জীবনযাত্রা পথে।

3.2.7 ঃ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রকাব্য ধারায় শ্যামলীর স্থান নিরূপণ করুন।

২। 'দ্বৈত' কবিতার মমার্থ প্রকাশ করুন।

৩। "গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ 'হঠাৎ দেখা' প্রেমের স্মৃতি-মেদুর ভাষ্য—আলোচনা করুন।

৪। 'বাঁশিওয়ালা' কবিতার নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

৫। 'আমি' কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৬। 'চিরযাত্রী' কবিতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রভাবনার পরিচয় দিন।

3.2.8 ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাশ

৩। রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক 1 ❑ 'রক্তকরবী'

1.1 গ্রন্থ-পরিচিতি
1.2 নাটকের পূর্বসূত্র
1.3 কথাবস্তু-সংশ্লেষ
1.4 'রক্তকরবী' নাটকের ভাবরূপ
1.4.1 যক্ষপুরীর শ্রেণীবিভাজিত পরিকাঠামো
1.5 প্রতীক-সংকেতের প্রয়োগ ও 'রক্তকরবী'
1.6 'রক্তকরবী'র গান
1.7 চরিত্র বিশ্লেষণ
1.7.1 নন্দিনী
1.7.2 রঞ্জন
1.7.3 মকররাজ
1.7.4 বিশুপাগল
1.7.5 কিশোর
1.7.6 অন্যান্য চরিত্র
1.8 অনুশীলনী
1.8.1 বিস্তৃত প্রশ্ন
1.8.2 অবিস্তৃত প্রশ্ন
1.8.3 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
1.9 গ্রন্থপঞ্জি

1.1 গ্রন্থ-পরিচিতি ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের রচনাকাল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। ঐ বছরের মে থেকে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এটি মোট দশবার লিখেছেন, প্রতিবারেই কিছু-না-কিছু সংযোজন এবং পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। এরপরে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩১ বাংলা সনের আশ্বিনের সংখ্যার এটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, আরও কিছু পরিমার্জনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এখন যে চেহারায় 'রক্তকরবী' নাটকে দেখা যায়, সেটি ঐ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠেরই অনুসারী। গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯২৬-এ।

এই নাটকের তিনবার নামকরণ করেন কবি : 'যক্ষপুরী' (১ম-৩য় খসড়া); 'নন্দিনী' (৪র্থ-৭ম খসড়া) ও 'রক্তকরবী' (৮ম খসড়া থেকে)।

২য় খসড়া থেকে নায়িকার নাম প্রথমে সুনন্দা, তারপর নন্দিনী হয়েছে। ১ম খসড়ায় তার নাম ছিল খঞ্জন। তার গ্রামটি নিশানীপাড়া বলে উল্লেখিত হয়েছে ১ম-৪র্থ খসড়ায়; এরপর থেকে সেটি রূপান্তরিত হয়েছে ঈশানীপাড়া

বলে। প্রথম চারটি খসড়ায় গোকুল এবং চিকিৎসক— এ দুটি চরিত্র নেই। ৫ম পাঠে এই দুজনের এবং ৬ষ্ঠ পাঠে ছোট সর্দারের উপস্থিতি ঘটেছে সর্বপ্রথম। কিশোরকে দেখা যায় একেবারে ১০ম খসড়াতে। এইসব ছাড়াও, ১ম থেকে ১১শ— সবগুলি পাঠেই কিছু কিছু অদল-বদল হয়েছে সংলাপে, ভাষায় এবং বক্তব্যে।

নাটকটি পড়ার আগে এই ব্যাপারগুলির অন্তর্নিহিত কারণ যে-কী, সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। এই নাটকের এতগুলি পাঠ রচনার উপলক্ষ হিসেবে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে; রবীন্দ্রনাথ এর মাধ্যমে যা ব্যঞ্জিত বা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, সেটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা গেল না—এমনটাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলে বারংবার এই নাটক নিয়ে ভাঙাগড়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। এই এতগুলি পাঠ বা খসড়া রচনা তারই ফলশ্রুতি।

1.2 নাটকের পূর্বসূত্র ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের পূর্বসূত্র স্বরূপ ইতিহাসের সর্বপ্রধান দুটি বিপ্লব—ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) এবং রুশ বিপ্লব (১৯১৭) — এ দুয়ের অলক্ষ্য প্রেরণা ছিল, এমন একটি তত্ত্ব সাম্প্রতিককালে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নাটকের অভ্যন্তরীণ কিছু কিছু উপপক্ষের অন্বিষ্ট বিশ্লেষণের সূত্রে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'On the Cross-roads' নামে 'Modern Review' July, 1918) যে ইংরেজী প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তার সঙ্গে ভাবে, রূপে ও চিত্রকল্পে বহু জায়গায় সুনিশ্চিতভাবে অনুরূপক্ত এমন একটি কবিতাও তিনি লেখেন যার শিরোনাম 'বিজয়ী' ('প্রবাসী', মার্চ/এপ্রিল, ১৯১৮; চৈত্র ১৩২৪); পরে এটি 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। এই 'বিজয়ী কবিতার বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও আবার 'রক্তকরবী'-র অন্তর্গত নানা বিষয়ের সাদৃশ্য এবং ভাবরূপের সাম্য দেখা যায়। ফলত, 'On the cross-roads' প্রবন্ধ, 'বিজয়ী' কবিতা এবং 'রক্তকরবী' নাটকের চূড়ান্ত পাঠটি মিলিয়ে পড়লে একই প্রেরমার নূসত্রে যে তারা রচিত হয়েছে, সেকথা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। 'রক্তকরবী' নাটকের সাম্প্রতিক একটি সংস্করণে (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত) অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত এই বিষয়গুলি খুব বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন।

ফরাসি বিপ্লবকে মহিমান্বিত করে ১৯শ শতকের বিখ্যাত ফরাসি চিত্রশিল্পী ইউজিন দেলাক্রোয়া একটি ছবি আঁকেন ১৮৩০ সালে। 'রক্তকরবী' নাটকের শেষাংশের মধ্যে ঐ ছবির প্রেরণাগত অভিঘাতও দেখা যায় (এই নাটকের অচির-পূর্বে উল্লেখিত সংস্করণটি এই সূত্রেও দ্রষ্টব্য)।

সবটুকু মিলিয়ে, এই নাটকের পূর্বসূত্র হিসেবে ইতিহাসের যুগান্তকারী দুটি বিপ্লবের প্রেরণাকে কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

1.3 কথাবস্তু-সংশ্লেষ ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের পটভূমি যক্ষপুরী। খোদাইকর, করাতীদের যক্ষপুরীতে নিয়ে আসা হয়। তারা কৃষিজীবন ছেড়ে যক্ষপুরীর অন্ধকারে আসে। যক্ষপুরীতে সোনার প্রলোভনে আসা সহজ কিন্তু সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। কারিগরেরা দিনরাত সোনার তাল খোঁড়ে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিই শুদু বদলে দেওয়া হয় না, বদলে দেওয়া হয় তাদের ব্যক্তিপরিচয়ও। সেখানে আচমকা এসে পড়ে নন্দিনী। নন্দিনীর প্রাণের আলো হঠাৎ করে যক্ষপুরীর দাসত্ব স্বীকারে অভ্যস্ত মানুষগুলোকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। নন্দিনীকে নিয়ম-নিষেধে বাঁধতে সর্দারেরাও পারে না। তাইতেই তারা নন্দিনীর মধ্যে সর্বনাশের ছায়া দেখতে শুরু করে। নন্দিনী শ্রেণী বিভাজনের ধনতান্ত্রিক নিয়ম-নিষেধ মানে না। সে অনায়াসে রাজার কাছেও পৌঁছে যায়। রাজাকে ডাক দেয় বাইরে আসার জন্যে। রাজাকে ফসল কাটার গান শোনায়। যক্ষপুরীতে নন্দিনী খুঁজে পায় তার এক হারিয়ে যাওয়া সখা বিশু

পাগলকে। বিশু তাকে গান শোনায়। নন্দিনী তার সিঁথিতে, মণিবন্ধে রক্তকরবীর গয়না পরে। নন্দিনী যেমন রাজার কাছে, যক্ষপুরীর সর্দার এবং অন্যান্যদের কাছে দুর্বোধ্য, রক্তকরবীর লাল রঙের তত্ত্বটিও তারা বুঝতে পারে না। নন্দিনী কাছে রক্তকরবীর একটাই ব্যাখ্যা—তার রঞ্জন এই ফুল ভালোবাসে। নন্দিনী যক্ষপুরীর নিয়মের ভিত ক্রমাগতই টলিয়ে দেয় আর এই বিশ্বাস নিয়ে সে সকলকে খুশি বিলিয়ে বেড়ায় যে, রঞ্জন আসবে।

নন্দিনীর এই বিশ্বাস সর্দারদের বিস্মিত করে, বিশুকে খুশিতে ভরে দেয় আর রাজাকে ঈর্ষান্বিত করে। অবশেষে নীলকণ্ঠ পাখির পালক এসে পড়ে আর নন্দিনী সেদিন ঘোষণা করে, রঞ্জনের আসার লগ্ন এসে গেছে। সেই খুশির খবর সে বিলিয়ে দেয় যক্ষপুরীতে।

রঞ্জন আসে। কিন্তু সে তো দাসত্বের কোনও শর্ত মানে না। তার উদ্ধত ভঙ্গি শাসনযন্ত্রের চালকদের ভয় পাইয়ে দেয়। সর্দারও রঞ্জনের চোখে দেখতে পায় শাসনযন্ত্রের আসন্ন পতন। অতএব সর্দার রাজাকেও ঠকায়। নন্দিনীর প্রতি রাজার অনুভূতি এবং দুর্বলতার কথা সর্দারের জানা ছিল বলে রঞ্জনের আসল পরিচয় রাজাকে জানায় না। রাজা রঞ্জনের মুখে নন্দিনীর নাম শুনতে পেয়ে সব সংযম হারিয়ে ফেলে। রঞ্জনাকে হত্যা করে রাজা। নন্দিনী রঞ্জনের মৃতদেহ দেখে। কিন্তু ব্যক্তি রঞ্জনের মৃত্যু নন্দিনীর পথ অন্ধকার করে দিতে পারে না। বরং রঞ্জনের দেখানো পথেই নন্দিনী তার সখিদের নিয়ে এগিয়ে যায়। নন্দিনীর এই জয়ে 'রক্তকরবী' নাটকের সমাপ্তি। যেখানে রাজা ও জালের আড়াল ভেঙে ফাগুলাল, বিশুদের সাথি হয়, তাদের সঙ্গে বন্দিদশা ভাঙতে চলে। সর্দাররা আটকাতে আসে বটে কিন্তু তারাও তো নন্দিনীকে অস্বীকার করতে পারে না। নন্দিনীর দেওয়া কুঁদফুলের মালা বর্শার আগায় দুলিয়েই তাদের যক্ষপুরীর আগলবাঁধ অটুট রাখার ব্যর্থ চেষ্ট করতে হয়।

1.4 'রক্তকরবী' নাটকের ভাবরূপ ঃ

"এই নাটকটি সত্যমূলক।..... কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।"— 'রক্তকরবী' নাটকে নাট্যপরিচয় লিখতে গিয়ে এই স্বীকারোক্তি স্বয়ং নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে এরপর নাট্যপরিচয়কে কিছুটা অন্যরকম করে তুলেছেন। একটা প্রশ্ন কিন্তু তারপরও থেকে যায়। 'সত্যমূলক' এবং সেটা 'কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে'ও তাই-ই তো। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সেখানে বিপন্ন কৃষিজীবন, শ্রমিক শোষণ সেখানকার অর্থনীতির প্রথম এবং শেষ কথাও তেমন একটা ব্যবস্থা কী কবির কল্পনায়? সমকালীন ইউরোপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তার চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের আড়ালে মানবতার চরম অবমাননা তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাই যক্ষপুরীর কথা লিখতে গিয়ে এগারো বার নাড়াচাড়া করতে হয়, কাঁটাছেড়া করতে হয় কাহিনী বিন্যাসকে। নাটকের নামকরণ নিয়েও এমনটা ঘটে। কবি 'যক্ষপুরী' নাম নিয়ে— নিজেই উপলব্ধি করেন, নাটকের পটভূমি যক্ষপুরী হলেও যক্ষপুরীর কথা বলা তো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়াল থেকে নন্দিনী যে রাজাকে বার করে আনবে। একদিন যে রঞ্জন টলিয়ে দেবে মেজোসর্দারের ভণ্ডামির ভিতকে। পাগলভাইয়ের গানে নন্দিনীর বিশ্বাসে, রঞ্জনের প্রাণস্রোতে সেদিক যক্ষপুরীর মেকি ভদ্রতা আর লোভের শেকড়-বাকড় ছিঁড়ে যাবে। অতএব নাটকের নাম বদলে রাখলেন নন্দিনী। নন্দিনী তে শুধু একজন সাধারণ মানবী নয়, সে লালরঙের আভায় ভয় পাইয়ে দিতে পারে মোড়ল-সর্দারদের। নন্দিনীদের রঙ লাল— রক্তকরবীর আভরণে সে স্বপ্ন দেখে এবং দেখায়— একদিন তার রঞ্জন আসবে। এই যক্ষপুরীর সমস্ত অন্ধকার সেদিন ঝলমলিয়ে উঠবে সূর্যের আলোয়। অতএব 'নন্দিনী' নয়, 'রক্তকরবী'। নাটকের নাম হল 'রক্তকরবী'।

1.4.1 যক্ষপুরীর শ্রেণীবিভাজিত পরিকাঠামো

নন্দিনী যক্ষপুরীতে আসার আগে যক্ষপুরীর অবস্থা ঠিক কেমন ছিল সেকথা নাটকে নেই। কিন্তু সর্দারদের

এমনকী ফাগুলাল, গোকুল, চন্দ্রাদের কথায় তার আভাস মেলে। 'এই নাটব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী'। যক্ষপুরীতে শ্রমিকদের কাজ একটাই—দিনরাত তারা মাটির অন্ধকার গহ্বর থেকে তাল তাল সোনা খুঁড়ে চলে। সর্দাররা তদারক করেন যাতে খোদাইকরদের কাজে একটুও ফাঁকি না পড়ে। শুধু কাজই নয়, খোদাইকরদের অবসরেও তাদের পূর্ণদৃষ্টি। সেই অবসরের ফাঁকে দেশের কথা, ফসল বোনার—ফসল কাটার কথা, নবান্নের কথা, একরাশ মুক্তির কথা যাতে মনে না পড়ে সেই দিকেও সর্দাররা সমান সতর্ক। গোঁসাইদের বহাল করে দেওয়া হয় কারিগরদের শান্তিমন্ত্র দেবার জন্য। সর্দারদের ওপরে মকররাজ। মকররাজ থাকেন একটা জালের আড়ালে। তাঁরসঙ্গে মানুষের যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। খোদাইকররা এই যক্ষপুরীতে এসে সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। তারা এখানে ৭১ ট, ৬৯ ঙ, ৪৭ ফ, ৬৫ ণ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেলখানার কয়েদীদের মতন। অর্থাৎ এখানকার কারিগররা অন্যত্র কর্মরত শ্রমিক হিসেবে জীবনযাপন করে না, তারা বন্দি। চন্দ্রার মতো কারিগর এর স্ত্রীরা সর্দারদের খুশি করে স্বল্প দিনের ছুটি চায়। ছুটি কিন্তু যক্ষপুরীর নিয়মে নেই। অতএব—যা বলা গিয়েছিল, যক্ষপুরী কারিগরদের কাছে বন্দিশালা। সেইখানে একবার গেলে আর মুক্তি সহজে ঘটে না। সংখ্যাতত্ত্বের ছাপ মারা এইসব কারিগরদের দায়িত্বে আবার আছে মোড়লরা। তারাও কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবের মধ্যেই। যেমন ট-ঠ পাড়ায় ৭১ ট মোড়ল। অতএব শ্রেণীগত অবস্থান অনুযায়ী মোড়লরাও কারিগরদের সঙ্গেই। মজার ব্যাপার সর্দারদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে রয়েছে আরও এক পদাধিকারীরা। তাদের শ্রেণী প্রতিনিধি এখানে সেভাবে উপস্থিত নেই। একজন ছিল সে বিশু। তারা হল চর। যক্ষপুরীতে চরবৃত্তি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সামাজিকতার খাতিরে সর্দারদের সঙ্গে ওঠাবসা করে। প্রমাণ বিশুর স্ত্রী। সর্দারনিদের তাসখেলার আসরে সে নিমন্ত্রণ পেত যতদিন বিশু চরগিরিতে আসীন ছিল। আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চরবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ কেননা শ্রমিক বিদ্রোহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে তারা—যারা নিরন্তর শোষণ চালায়। তাই চরদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা। তাদের কাজ—একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা' (বিশুর কথায়) আর একজনের কথা বলা বাঞ্ছনীয়। সে হল গোঁসাই। শ্রেণীগত অবস্থান তার সর্দারদের সঙ্গে নয় কিন্তু মকরবাজের নেতৃত্বে যারা শোষকের ভূমিকায়, তাদেরই সহচর গোঁসাই। অতএব গোঁসাইও এই ব্যবস্থারই একটা অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নাট্যপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছেন। "এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।"

যক্ষপুরীর এই শ্রেণী বিন্যাসের ছকটা এভাবে দেওয়া যেতে পারে।

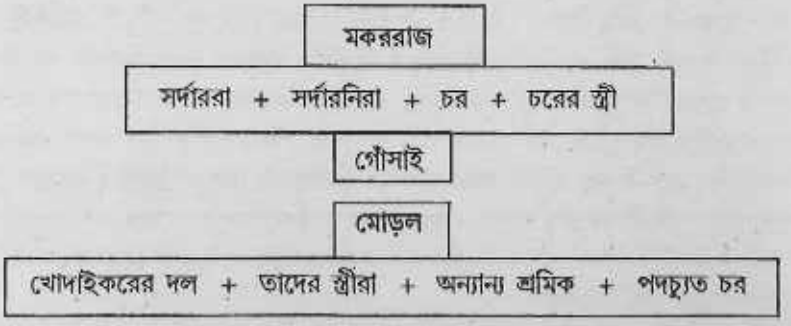

শ্রেণীবিন্যাসের এই ছকে মোড়লকে খোদাইকরদের শ্রেণীতে রেখেও যেমন আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেভাবে সর্দারদের শ্রেণীতে গোঁসাইকে রেখেও আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে সর্দাররা গোঁসাইকে 'প্রভু, প্রণাম' বলে সম্মান জানায় আবার গোঁসাই 'অন্ন গ্রহণ করেন সর্দারের'। এছাড়াও গোঁসাই কোন্

পাড়ায় গিয়ে কাজ করবেন, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ সর্দাররাই দেয়। অতএব শ্রেণীগত অবস্থানে গোঁসাই সর্দারদের সঙ্গে একই জায়গায় হলেও সম্মানে এক নয়। এই শ্রেণীসোপানের সর্বোচ্চে মকররাজ স্বয়ং। এই অবস্থানটা যদিও বিতর্কিত। যক্ষরাজ জালের আড়ালে থেকে বেরোন না। প্রত্যক্ষভাবে শাসনযন্ত্র কিন্তু সর্দারদেরই হাতে। অতএব এক অর্থে মকররাজ ক্ষমতার পুতুল। শ্রেণীবৈষম্যের এই ছক কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকে থেকেই রয়েছে। এবং নন্দিনী যে পরিকাঠামোকে ভেঙে দিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তরে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে। রঞ্জন যে বৈষম্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে অট্টহাসি হাসতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতটা সচেতনভাবে এই বৈষম্যের কথা বলেছেন, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু বলেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

> "শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে একজন মার্কসবাদী যেভাবে প্রত্যয়শীল—রবীন্দ্রনাথ সেভাবে ভাবতেন না যে, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এও তো আবার ঠিক যে, যে-বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটা সময়ে শ্রেণীসংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেটার স্বরূপ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। রুশ বিপ্লব তাঁর অনুধ্যানকে এড়িয়ে যায়নি, বরং একটা উৎসুক আগ্রহই দেখিয়েছেন তিনি সে-বিষয়ে। জীবনের শেষ পর্বে এসে, চিরকালের ধনতন্ত্রবিমুখতার সঙ্গে তিনি শ্রমজীবী মানুষের অভ্যুদয় সম্পর্কেও আগ্রহী হয়েছিলেন। এমনকী, একটি কমিউনিস্ট তরুণকে মূল চরিত্র হিসেবে রেখে 'অমৃত' নামে কাহিনী-কবিতাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেটি সংকলিত আছে তাঁর 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে।"
>
> ('রক্তকরবী'; মুখবন্ধ; এন.বি.এ. সংস্করণ, ২০০১)

ধনতান্ত্রিক এই কাঠামো তার নিজের স্বভাবেই স্পষ্ট হয় তারপর একদিন 'নিজের অন্তর্বিলীন স্ববিরোধিতার জন্য দীর্ণ হয়ে যায়'। তাই 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর রাজা একদিন শ্রমিকদের সঙ্গে বেরিয়ে আসে পথে। নন্দিনীর হাতে হাত দিয়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে রাজাও সামিল হয় রাজারই বন্দিশালা ভাঙতে।

"আজ আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিনী"।

১.৫ প্রতীক-সংকেতের প্রয়োগ ও 'রক্তকরবী' ঃ

মকররাজ স্বয়ং এখানে ধনতন্ত্রের প্রতীক। সঙ্গে রয়েছে সর্দারেরা। রাজা বাইরে আসেন না। শুধু তাই নয়, তিনি জালের মধ্যেও কাউকে আহ্বান করেন না। এই জালটা এই ব্যবস্থার পক্ষে খুবই জরুরি। নন্দিনীকে আটকানোর ক্ষমতা যদিও সেই জালের নেই। নন্দিনী জালের ভেতরে গিয়ে দেখেছে। তার স্বীকারোক্তি 'এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।' এইজন্যেই জালের আড়ালটা খুব জরুরি। মানুষের মনে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে এই ভয়টা জাগিয়ে রাখার স্বার্থেই রাজা জালের আড়ালে থাকেন। জালটা অতএব ক্ষমতারই প্রতীক। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকারে মূর্তিমতী বেনিয়ম। তাই ক্ষমতার প্রবল প্রকাশকে সে ভয় করে না। তার গহনা রক্তকরবীর। রক্তকরবীর লাল একদিকে যেমন বিদ্রোহের প্রতীক, অন্যদিকে যৌবনের প্রতীক। তার লাল রঙের ফুল নিয়ে তাই সকলের বিস্ময়। রাজা বিস্মিত, অধ্যাপক বিস্মিত। নন্দিনী কিন্তু সেই ফুল শুধুমাত্র রঞ্জনের জন্যেই রাখে। খুশি হয়ে সে অধ্যাপককে মালা দেয়, রাজাকেও দেয়; কিন্তু সে কুঁদফুলের মালা। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকারে একরাশ আলোর মতো হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে। ধনতন্ত্রের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে যে মেয়ে তার কাছে লাল রঙ অন্য মাত্রা পায়। নন্দিনী হাতে রক্তকরবীর কঙ্কন পরে, সিঁথিতে ঝোলায় রক্তকরবী, গলায় পরে রক্তকরবীর মালা। শুধু তাই নয়, তার অন্তরের সমস্ত কথা বলা হয়ে যায় এই রক্তকরবীর মধ্যে দিয়ে। নন্দিনী কিশোরকে বলেছে '....তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।" লালফুল চিরকালই নারী ও যৌবনের প্রতীক হিসেবে গণ্য। নন্দিনী প্রেমিকা এবং একই সঙ্গে গণ অভ্যুত্থানের নায়িকা। এই দুটো সত্তাই রক্তকরবীর লাল রঙে

আভাসিত। মকররাজকে সে টলিয়ে দিতে পেরেছিল। কিশোরের সব কাজ সব অবকাশ ভরে উঠত নন্দিনীকে রক্তকরবী এনে দিতে পারার ভাললাগায়। বিশুপাগলের গানে সুর লাগত নন্দিনীর এই রক্তরাগের ছোঁয়ায়। অধ্যাপক খুঁজে বেড়াতেন লাল রঙের তত্ত্বটি। আর সর্দাররা দেখতে পেত সর্বনাশের ছায়া। নীলকণ্ঠ পাখির পালকও এখানে আলাদা তাৎপর্যমণ্ডিত। একটা নিশ্চিত প্রত্যয় যেমন প্রতীকায়িত তেমনি অসীমের সংবাদ বয়ে আনে নীলকণ্ঠ পাখির পালক। নীলকণ্ঠ পাখির অনুষঙ্গ সাহিত্যে বারেবারেই অসীমের খবর বয়ে আনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শুভ সংবাদ। রূপকথার গল্পে নীলকণ্ঠ পাখির কথা আছে। যে পাখি পথ বলে দেয় রাজপুত্রকে, নন্দিনী এমনিতেই প্রত্যয়ী। নীলকণ্ঠ পাখির পালকে সে রঞ্জনের আসার খবর পায়। শুধু আভাসটুকুই নয়, সে নিশ্চিত, বিশুকে নন্দিনী বলে "মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁছেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে..... আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি, উত্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।"

নীলকণ্ঠ পাখি জয়যাত্রারও প্রতীক। বিশুর সংলাপে সেকথা উঠে এসেছে "লোকে বলে, নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।" ধাণী রঙে আছে ফসলের আভাস। ধাণী রঙ ফসলের প্রতীক। যক্ষপুরীতে যেখানে অন্ধকারের গহ্বর থেকে সোনা খুঁড়ে আনাই একমাত্র নেশা, সেখানে বন্ধ্যাত্বের আভাস সূচিত। মানুষের মনকেও সেখানে সৃষ্টির অবসর দেওয়া হয়না। নন্দিনীর ধাণী রঙের শাড়ি এই বন্ধ্যাত্বের প্রতিস্পর্ধী।

রাজার হাতে তিন হাজার বছর টিকে থাকা একটা মরা ব্যাঙ দেখেছিল নন্দিনী। লোকবিশ্বাসে ব্যাঙ যৌনতার প্রতীক, স্থবিরতারও বটে। তার কাছ থেকে মকররাজ শিখতে চেয়েছিলেন কেমন করে টিকে থাকতে হয়। আসলে এখানে টিকে থাকাটাও প্রতীকী। রাজাও কী আদৌ বেঁচে ছিলেন? যার জীবনে বিশ্রামের আরাম নেই, সৃষ্টির ইঙ্গিত নেই, তারও তো জীবন মানে শুধুই টিকে থাকা, মহাস্থবির ব্যাঙের মত। তবুও মকররাজ বুঝতে পারলেন যে, ব্যাঙটা শুধু টিকে থাকতেই শিখেছে, বাঁচতে শেখেনি, মরে গেছে সে। যেভাবে টিকে থাকতে অভ্যস্ত ধনতান্ত্রিক নিয়ম নিষেধের জালের আড়ালে ক্লান্ত রাজাও একদিন মরার আরাম পাবেন, মুক্তির খুশি তার প্রাণে লাগবে, তারও ইঙ্গিত এখানে সূচিত।

এভাবে সমগ্র নাটকে প্রতীকী ব্যাঞ্জনা রয়েছে। লোকায়ত বিশ্বাসের যে প্রতীক, নাট্যকার তাকেও যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় ভিন্ন মতাবলম্বীও হয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার এবং সাংকেতিকতার একটা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। সাহিত্য শিল্পে ভাব সাধারণত ভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সূক্ষ্ম ও অনির্দিষ্ট শুধুমাত্র অনুভবগম্য যে ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তারজন্য সংকেত ও প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয় কবিকে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক ও প্রতীকী নাটকগুলিও সেভাবেই সৃষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক-সাংকেতিক ও প্রতীকী নাটকগুলো মোটামুটিভাবে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্বে — প্রকৃতির প্রতিশোধ

দ্বিতীয় পর্বে — শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর

তৃতীয় পর্বে — ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা এবং তাসের দেশ।

১৮৮৪ তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লেখা, কবির বয়স তখন তেইশ। লেখার মধ্যে অপরিণতির ছাপ তখনও রয়েছে। ১৯৮০ এ শারদোৎসব থেকে শুরু করে তাঁর নাটকে প্রতীকের ব্যবহার একটা অন্যমাত্রা পেয়েছে। 'মুক্তধারা' ও

'রক্তকরবী' তে সভ্যতার সঙ্কট চিত্রিত হয়েছে প্রতীকের ব্যবহারে। 'মুক্তধারা'য় দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদ ও যন্ত্রবিদ্যা হাত মিলিয়ে মানুষের তৃষার জল রোধ করতে যায়। তখন ঝরণার তলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রাজকুমার অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে যন্ত্রের বাধা ভেঙে দেয়। প্রমাণ করে দেয়—যন্ত্র নয়, মানুষই বড়। 'রক্তকরবী' নাটকটি সেভাবেই আধুনিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক, মানসিক অশান্তি ও সংকটের পটভূমিকায় পরিকল্পিত হয়েছে। 'রাজা' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : "The Human sol has its inner drama." আসলে তাঁর সব প্রতীক নাটকগুলো সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। রক্তকরবী নাটকেও প্রতীক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 'inner drama of the human soul' কেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ এবং শেষে অবশ্যম্ভাবী অন্তর্ঘাতের মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রের পতনকে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

1.6 রক্তকরবীর গান ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের গানগুলির বিশেষ ধরনের কিছু তাৎপর্য রয়েছে। নাটকের প্রথম গানটি হল পৌষের উৎসবের গান—ফসলকাটার গান, "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয় আয় আয়—"; এই পৌষের গান নন্দিনী রাজাকেও শোনাতে চেয়েছে। যক্ষপুরীর মকররাজ, যাঁর সঙ্গে ফসল ফলানোর কোনো যোগ নেই, সৃষ্টির যোগ নেই, শুধু মাটির তলার মরা। ধন খুঁড়ে খুঁড়ে ঐশ্বর্যের পাহাড় বানায় আর মানুষের প্রাণশক্তিকে শোষণ করে। সেই রাজাকে ফসলের গান শোনায় নন্দিনী। গানের মাঝেই রাজাকে ডাক দেয় "তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।" ফসল ফলানো, ফসল কাটা, যেখানে সহজ সৃষ্টির আভাস আছে, মকররাজের কাছে সেই সহজের ডাক দুর্বোধ্য ঠেকে। নন্দিনীর মধ্যে যে খুশির প্রাচুর্য, যা রাজাকে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, সেই খুশি আসলে এই প্রকৃতির খুশি। যক্ষপুরীর অন্ধকারে যে খুশি পথ খুঁজে পায় না। নন্দিনী সেই খুশির সন্ধান দিতে চায় রাজাকে ".....আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক। আলোর খুশি উঠল জেগে/ধানের শিষে শিশির লেগে,/ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে, ...'রক্তকরবী' নাটকের গান আসলে নন্দিনীর পাগলভাইয়ের গান। যক্ষপুরী তাদের দুঃখের জায়গা। নন্দিনীর আনন্দের সাথি রঞ্জন আর তার মানবিক দুঃখ-বেদনার সন্ধান সে আগে কখনও পায়নি। বিশুর নিবেদন যে ঠিক্ কোনখানে, যক্ষপুরীর সকলেই তা বুঝতে পারে। তাই বিশু যখন গান গায়, 'মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।' তখন চন্দ্রা বলে ওঠে "তোমার স্বপন-তরীর নেয়েটি কে, সে আমি জানি" আসলে বিশু পাগল যেমন নন্দিনীকে দুঃখের সন্ধান দেয়, সেই দুঃখ তো তার মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাজে। যক্ষপুরীতে তার জীবিকা ছিল চরের। তার বিবেকের নির্দেশে সেই কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে কারিগরদের ভূমিকায় বিশু আসীন। মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা দেখতে দেখতে প্রত্যেক মুহূর্তেই সে মরমে মরে যায়। যক্ষপুরীতে এসে তাদের আকাশ হারিয়ে গেছে, অবকাশ হারিয়ে গেছে। মানুষকে তার বোধ; বিবেক, বুদ্ধি, অবকাশ সবশুদ্ধ কিনে নেওয়া যক্ষপুরীর নিয়ম। সেই নিয়মে পাগল ভাইয়ের মন ছটফটিয়ে ওঠে মুক্তির জন্য। সেকথা বিশুর গানের মধ্যে প্রতিফলিত।

"তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে।
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথি,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে।"

নন্দিনী আসলে বিশুপাগলার 'দুখজাগানিয়া'। তাই বিশু তার 'সমুদ্রের আগম পারের দূতী'কে গান শোনায়। আসলে নন্দিনী আর বিসু যক্ষপুরীর নিয়মের দুই মূর্তিমান ব্যতিক্রম। যক্ষপুরীর অন্ধকার মানুষের হৃদয়কেও অন্ধকারে ভরিয়ে দেয়। নন্দিনীর সেটা উপলব্ধি করতে পারে। তার পাগল ভাইকে সেকথা বলে, "পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।" বিশু ও সেকথা বোঝে। বোঝে বলেই তো নন্দিনী তার 'দুখজাগানিয়া'। "সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।"—এই কথার সূত্র ধরেই এই গানটি আসে "তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ/ওগো ঘুম ভাঙানিয়া" গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।" নন্দিনী-রঞ্জনের প্রাণের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার যে খেলা, সেখানে একদিন বিশুও ছিল সাথের সাথি। তাপর সে চলে গেছে একলা বেরিয়ে। এই নিরুদ্দেশে ভেসে যাওয়ার খবর নন্দিনী জানতে চায় বিশুপাগলের কাছে। বিশু সেই উত্তর দেয় গানে গানে "আমার তরী ছিল চেনার কূলে,/বাঁধন তাহার গেল খুলে,/তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল/কোন্ অচেনার ধারে।"

রক্তকরবী নাটকের গানে একাধিকবার চাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে। 'চোখের জলের লাগল জোয়ার' গানটিতে চাঁদের পরিক্রমণের কথাই মূলত উঠে এসেছে। চাঁদকে সম্বোধন করেই এ গানের শুরু। 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে' গানটিতেও চাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে। আসলে যক্ষপুরীর অন্ধকারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যেমন চাঁদের কথা উঠে আসে তেমনি চাঁদের পরিক্রমণ শেষে নতুন দিনের ইঙ্গিতও আছে। নন্দিনীর মুখচন্দ্রও হয়ত বা তাঁর পাগলভাইকে মনে পড়িয়ে দেয় আকাশের চাঁদের কথা। যে আকাসে একাকার হয়ে গেছে চন্দ্রমুখী নন্দিনী, তার ধ্রুবতারা রঞ্জন আর তার পাগলভাই।

"আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে
রাতের মুখে আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে
দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।"

'রক্তকরবী' নাটকের শেষে বিশুর গলায় যে গান সোনা যায়, তা ফসলের গান। সে জয়ধ্বনি দেয় 'নন্দিনীর জয়' নন্দিনীর জয় মানেই রঞ্জনের জয় তথা মুক্তির জয়। যক্ষপুরীর বন্ধ দশা ঘুচিয়ে দেবার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের জয়।

এই নাটকে নন্দিনীর কণ্ঠে আরও একটা গান শোনা গেছে। সেই গান নন্দিনী রাজাকে শুনিয়েছে। নন্দিনীকে সে গান শিখিয়েছে তার পাগলভাই। সেই গানে আছে আকাশের কথা, জল-স্থলের কথা, ছুটির কথা, মুক্তির কথা। সেই যে নন্দিনী বিশুকে বলেছিল, যক্ষপুরীতে আকাশ লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু তার আর পাগলভাইয়ের মনে আকাশ বেঁচে আছে, সেই আকাশেই মুক্তির খবর আসে, ভালবাসার খবর আসে, বেদনারও খবর আসে।

"ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যাথা বাজে
দিগন্তে কার কালো আঁখির জলে যায় গো ভাসি।"

এই মুক্তির গানে যে বেদনার সুর বেজেছে, সেই সার রাজাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে হৃদয় নামক বস্তুটিকে সযত্নে খিল এঁটে রেখে দিয়ে মানুষ মারার কল চালায় যে রাজা, সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তাকে থাকতেই হবে। বুকের লৌহ কপাট খুলে গেলে দেবতা বেরিয়ে এসে রাজশাসনের বিপদ ঘটাতে পারে। নন্দিনী জানে রাজা গানকে ভয় পায় "পাগল ভাই, ঐ-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়েকখনল পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভায় পায়"

রবীন্দ্রনাথের গানেনেই আছে, "গানে গানে সব বন্ধন থাক টুটে"। তাঁর সমস্ত নাটকেই গান প্রতিবাদে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের মূল বক্তব্য কখনও গানেই উঠে আসে। 'মুক্তধারা', 'রথের রশি' ইত্যাদি সমস্ত নাটকেই গান একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আসলে সুরের যে আবেদন, তার কাছেই পরাজিত হতে পারে মানুষের অন্যায়। পৃথিবীর সব বিদ্রোহ-বিপ্লবে গান মানুষকে লড়াইয়ের শক্তি জুগিয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে থেকে ফিরে আসা যায় সুরের হাত ধরে "তোমার কাছে এ বর মাগিশ্মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।" সেভাবেই 'রক্তকরবী' নাটকের গান প্রতিবাদের গান। কৃষিসভ্যাতর জয়গানও বটে। আবার ব্যথিত মানুষের পারস্পরিক সমবেদনারও গান।

1.7 চরিত্র-বিশ্লেষণ ঃ

1.7.1 নন্দিনী ঃ

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যনেত্রর আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টায় তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দি করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপরষ প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগরকে ভেঙে ফেলে প্রামের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।" যাত্রী গ্রন্থে পশ্চিমী যাত্রীর ডায়ারি অংশে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে এই উক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নারী শক্তির প্রাবল্যে যক্ষপুরীর কারগার ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে রাজার জালের আড়াল। নন্দিনী সেই নারীশক্তির প্রতীক। যক্ষপুরীর অন্ধকারে সে হঠাৎ এসে পড়েছে একরাশ আলোর মতো। সোনরা তাল খোঁড়ে যে কারিগরেরা, পুঁরি মধ্যে তত্ত্বের অনুসন্ধানে ক্লান্ত যে অধ্যাপক, মানুষের মনুষ্যত্বকে অবদমিত, অবলুপ্ত করার তদারকতিে ব্যস্ত যে সর্দারোর, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের চুড়োয় বসে যে রাজা, তাদের সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে রক্তকরবীর আভায়। নন্দিনীর রক্তকরবীর আভরণ দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে অধ্যাপককে। আকর্ষণ করে রাজাকেও। অধ্যাপক কিশোর, পাগলভাইদের মতই সেই আকর্ষণকে সহজ বলে স্বীকার করে নেয়। রাজা পারে না। অথচ নন্দিনীর অনিবার্য আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্যও রাজার নেই।

নন্দিনী অধ্যাপকের তত্ত্বভিড়করা মগজের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ভাবনা জাগিয়ে তোলে। অধ্যাপক বুঝতে পারে না সেই অচেনা অনুভূতিকে। তার তত্ত্ব কথায় সেই বিস্ময়ের আভাস মেলে। "সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।......" নন্দিনী যে আলোর খবর বয়ে নিয়ে এনেছে যক্ষপুরে, সেই আলোর নিশানা চিনে রঞ্জনও আসবে, নন্দিনী অধ্যাপককে সে কথা জানায়। নন্দিনী আসলে যক্ষপুরীর মৃত আত্মাকে দেখতে পায়। সেই

মৃতপ্রায় ব্যবস্থার গায়ে যৌবনের পরশমনি স্পর্শ করিয়ে তাকে উজ্জীবিত করতে চায়। তার বিশ্বাস অটল। অধ্যাপককে তাই বলে, "আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।" নন্দিনীর বিশ্বাসের কাছে, তার প্রাণশক্তির কাছে অধ্যাপকের মনও ভিক্ষুকের মতই প্রার্থনা করে, নন্দিনীর ডান হাতে রক্ত করবীর কঙ্কন থেকে খসানো একটা পুল। নন্দিনীকে বুঝতে পারে না অধ্যাপক। বুঝতে পারে না তার রক্ত করবীররঙে তত্ত্ব। রাজার কাছেও নন্দিনী অগাধ বিস্ময়। তাকে আর পাঁচজন মানুষের মতো ভয় দেখাতেও ব্যর্থ হয় মকররাজ। রাজার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাবলে সে নারীকে অনায়াসে সেবাদাসী করে রাখতে পারে, নন্দিনী কিন্তু নির্ভয়। রাজার ক্ষমতা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। নন্দিনীর যৌবন, তার পূর্ণতা, তার রক্তকরবীর ঐশ্বর্য সব কিছুর সামনেই মকররাজের নিজেকে অকিঞ্চিতকর বলে মনে হয়। নন্দিনী আসলে কৃষিসভ্যতার উর্বরতাকে বয়ে এনেছে। যক্ষপুরীর বন্ধ্যাত্বর মধ্যে তাই সে পদে পদে অসঙ্গতি দেখতে পায়। ধনতন্ত্রেরএই মেকি ক্ষমতার বিন্যাসের মধ্যেই যে অন্তর্ঘাত এবং অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে আছে, তা সে রাজাকে দেখিয়ে দিতে চায়। "দেখছ না?—এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে।" নন্দিনী রাজাকে শোনায় ফসল কাটার গান। নন্দিনী উচ্ছল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সে, তবুও তার মধ্যে একটা আশ্রয় রয়েছে। যে আশ্রয় রাজাকে লোভ দেখায় বিশ্রামের। রঞ্জন যে খুশি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই খুশির রসদ যে নন্দিনীই জোগায়, সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই রাজা রঞ্জনকে ঈর্ষা করতে শুরু করে। নন্দিনীকে ছিনিয়ে আনা যায় না, তাকে সেবাদাসী করে রাখার সামর্থ রাজার নেই, সেই অক্ষমতায় পুড়তে থাকে রাজা। আর নন্দিনীর পাগল ভাই তাকে গান শুনিয়েই তৃপ্ত। নন্দিনী শুধু বিশুর কাছেই ব্যক্ত করে নিজেকে। রাজা রঞ্জনকে প্রতিস্পর্ধী ভাবে। নন্দিনী কিন্তু বিশুকেই একমাত্র স্বীকার করে নেয় রঞ্জনের দোসর হিসেবে। বিশু তাকে গান শোনায়। সেই গানের মধ্যে দিয়ে নন্দিনী যেমন মুক্তির স্বাদ পায়, তেমনি দুঃখেরও স্বাদ পায়। নন্দিনী বিশুকে বলে, "তোমাকে একটা কথা বলি পাগল! যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।" রঞ্জনের কাছে সে যৌবনের সবটুকু আনন্দ পেয়েছে, কিন্তু নন্দিনীকে দুঃখের স্বাদ শুধু তার পাগলভাইই দিতে পারে। নন্দিনীর মনের মধ্যে আলো-ছায়ার মতো পাশাপাশি এবং অনিবার্য রঞ্জন আর বিশুর অস্তিত্ব। নন্দিনী আলোর শিখার মতো তার যাওয়ার পথের সব অন্ধকারকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে যাওয়া তার ধর্ম। সেভাবেই সে রাজার মিথ্যের অন্ধকারকে, অধ্যাপকের তত্ত্বের জমাট অন্ধকারকে আলোয় ভরে দিয়ে যায়। আলোর মধ্যেই তার অস্তিত্বের কণা কণা রেখে যায় নন্দিনী। কিন্তু সেই অলোকে উজ্জ্বলতর, অনির্বাণ করে তোলে রঞ্জন, বিশু। এই তুলনা এবং প্রতিতুলনা শোনা যায় নন্দিনীর নিজের কণ্ঠেই।

"দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিল, কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম নাক্তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।"

নন্দিনীর সঙ্গে তার পাগলভাইয়ের পরিচয় যক্ষপুরীতে এসেই নয়। নন্দিনীর সাথি যেমন রঞ্জন, তেমনিই বিশু। নন্দিনী যেদিন রঞ্জনের আসবার খবর পেয়েছিল নীলকণ্ঠ পাখির পালকে, সেই খবর বিশুকে দিয়েছে। সেদিন থেকেই নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর আপেক্ষার শুরু। রঞ্জন আসবে। নন্দিনীর মধ্যে যে রক্তকরবীর আভা, তাতে গোকুল, চন্দ্রারা দেখেছিল সর্বনাশের মশাল, মকররাজ দেখতে পেয়েছিল তার শনিগ্রহ আর অধ্যাপক শুনতে পেয়েছিল

বিপ্লবের দূরাগত পদধ্বনি নন্দিনী বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছে।তার রঞ্জন যক্ষপুরীতে নন্দিনীর মধ্যে যে রাঙা আলোর মশাল রয়েছেন সেই মশাল একদিন যক্ষপুরীতে সত্যিই আলোয় ভরে দিয়েছে। নন্দিনী বুঝতে পেরেছে লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। বন্দিশালার দরজা ভাঙার, রাজাকে জালের আড়ালে থেকে বার করে আনার, রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলনের। রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ লাল। তার ভালোবাসায় ফুল রক্তকরবী। সেকারণেই নন্দিনী রক্তকরবীর গয়না পরে। রঞ্জনকে পাওয়ার খুশিতে হয়ত কখনও কখনও প্রার্থীর বাড়িয়ে দেওয়া হাতে একটা-আধটা রক্তকরবী উপহারও দেয়। যদিও সে নিজে থেকে সর্দার, রাজা সকলকেই শুভ্র কুঁদফুলের মালাই উপাহর দেয়। আর রক্ত করবীর ফুল উপহার নেয় তার প্রাণের আর এক সখা কিশোরের কাছ থেকে। যে কিশোর নন্দিনীর কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের উত্তীয় যেমন শ্যামার কাছে নিজেকে সমর্পন করার জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল, কিশোরও নন্দিনীর তেমন সখা। তার হাত থেকে রক্তকরবীর ফুল নেয় নন্দিনী। অবসেষে রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলনের পরম লগ্ন যখন ঘনিয়ে আসে, নন্দিনী দেখতে পায়, তার রক্ত করবীর লাল আভা যক্ষপুরীর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। "দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।" নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের যে সম্পর্ক ব্যক্তিমৃত্যু তার ওপর ছায়া ফেলতে পারে না। নন্দিনী রঞ্জন আসার খুশিতে তাই অকৃপণ হাতে কুঁদফুল, রক্তকরবী উপহার দিয়েছিল। রঞ্জন আসবে খবর পেয়েই সে ঘোষণা করেছিল, সময় হয়ে গেছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত সে করে ফেলেছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই দেখা যায় নন্দিনী মকররাজের জালের আড়াল ভেঙেছে। যক্ষপুরীর রাস্তায় একই সঙ্গে রাজা এসে দাঁড়িয়েছে ফাগুলাল, বিশু তথা বন্দিশালার অন্যান্য কারিগরদের মধ্যে। রঞ্জনকে তার আগেই রাজা হত্যা করেছে। নন্দিনীকে যে রাজা ভালবেসেছিল, সেই ভালবাসা সঞ্জাত ঈর্ষাই প্রণোদিত করেছিল রঞ্জনকে হত্যা করতে। রঞ্জনের মুখে নন্দিনীর নাম শুনে রাজা 'সইতে' পারেনি। তার 'নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল'। নন্দিনী চোখের সামনে রঞ্জনের মৃতদেহ দেখেছে। তার বিশ্বাস থেকে নন্দিনী কিন্তু সরে আসেনি। সে জানে, রঞ্জনকে মেরে ফেলা যায় না। তাই তার প্রথম প্রতিক্রিয়া— "বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি— "এরপরই নন্দিনী শেষ যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। রাজা সেখানে নন্দিনীর সাথি। ফাগুলাল বিসমিমত হয়ে নন্দিনীকে প্রশ্ন করেছেয নন্দিনী বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা জানতে চেয়েছে ফাগুলাল। আসলে ফাগুলাল গোকুল বাচস্পার ক্ষুদ্র সংসারবুধিতে নন্দিনীর পরিমাপ করা যাচ্ছিল না। সে কারণেই তার দিকে সন্দেহের আঙুল। যে মকররাজের রাজতন্ত্র তথা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাজের লড়াই, সেই লড়াইয়ে কেমন করে রাজাকেও সঙ্গী করে নেওয়া যায়, নন্দিনী কোন্ মন্ত্রবলে রাজাকে পথে টেনে নামায় তাই বুঝতে পারেনি ফাগুলাল। নন্দিনী ফাগুলালকে বুঝিয়েছে, রঞ্জনের পথ ধরে মৃত্যুর পথে তারা সকলে সাথি হবে। মৃত্যুর পথ ধরেই মৃত্যুত্তীর্ণ হবার সাধনা তাদের। ফাগুলাল নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের এই বিচ্ছেদকে সাধারণ মানুষের মতই মানবিক দৃষ্টিতে দেখে। রঞ্জনের রক্তাক্ত ধুলিলুণ্ঠিত দেহ চোখের সামনে দেখে তাই সে হাহাকার করে ওঠে "হায়রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার। এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষ করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।" নন্দিনীর অপেক্ষা আসলে তো শুধুই ব্যক্তিরঞ্জনের জন্যে নয়। নন্দিনী আসলে রঞ্জনের হাত ধরে একটা শ্রেণী শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়ে যায় এক থেকে বহুতে। তাই রঞ্জন থেকে যায়, নন্দিনীও বেঁচে থাকে স্বপ্নের মধ্যে। নন্দিনীর বিশ্বাস তাই কখনও ভেঙে যায় না। "মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না।" আসলে বিপ্লব দীর্ঘ-দীর্ঘ- দীর্ঘজীবন লাভ করে। মানুষকে লড়াইয়ে প্রণোদিত করে। অন্ধকারের পথ বেয়ে রঞ্জনরা আসে, নন্দিনীদের সঙ্গে নিয়ে আলোর সন্ধানে পাড়ি দেয়। নন্দিনী সেকথা বোঝে। তাই তার সখা, তার প্রিয় মানুষ তার অপেক্ষাকে নিঃসাড়ে পথের ধুলোয় পড়ে থাকতে দেখেও তার হাহাকার নেই। বরং একটা সুদৃঢ় প্রত্যয় খেলা করে নন্দিনীর কণ্ঠে

আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।"

নন্দিনী ক্লাসলে বিপ্লবের দূত। অক্ষয়যৌবন নিয়ে সে ব্যর্থ প্রাণের সব আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে জীবনের সন্ধান দেয় সে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া'র 'সবলা' কবিতায় যেভাবে নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'বীর হস্তে বরমালা লব একদিন', তেমনি করেই রঞ্জনদের কাছ থেকে বরমাল্য নেবার জন্য নন্দিনীরা অনেক-অনেক কাল অপেক্ষা করে থাকে আর রঞ্জনরা নন্দিনীদের দেওয়া মিলনের রক্তরাখী হাতে বেঁধে চলে যায় আবার আসবে বলে।

১.৭.২ রঞ্জন

রঞ্জন রক্তকরবী নাটকে অনুপস্থিত। যক্ষপুরী এই নাটকের পটভূমি। যক্ষপুরীতে রঞ্জন এসে পৌঁছেছে নাটকের শেষ দৃশ্যে। কিন্তু রঞ্জন ছিল। রঞ্জন ছিল নন্দিনীর মধ্যে, বিশুপাগলার উচ্চারণে, রাজার ঈর্ষায়, অধ্যাপকের বিস্ময়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ। নাটকের নায়ক হওয়ার দাবি তারই। কিন্তু মকররাজের চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে রঞ্জন। নন্দিনীর চোখে, নন্দিনীর স্বপ্নে রঞ্জনের প্রবতারার মতো উপস্থিতি রাজাকে আত্মদর্শনে সাহায্য করেছে। রঞ্জনের যৌবনের দাবি, সুন্দরের দাবি, প্রাণপ্রাচুর্যের দাবি, এই সবের কাছে রাজা যে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই উপলব্ধি রাজাকে ক্রমাগত ভেঙেছে, বিক্ষত করেছে। রঞ্জন নন্দিনীকে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিল। নন্দিনী যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে নাড়িয়ে দিয়েছিল শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে যে, রঞ্জন আসবে। নন্দিনীকে রাজা শক্তি আর ঐশ্বর্যের ভয় দেখায় নন্দিনী রঞ্জন সম্পর্কে রাজাকেও সাবধান করে দেয় "আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকের অভিজিৎ যন্ত্রের বাধা ভেঙে দিয়ে মানুষের কাছে সৃষ্টির সহজ দানকে পৌঁছে দিয়েছিল। নিজে সে ভেসে গিয়েছিল সেই জলের তোড়ে। সেভাবেই ব্যক্তি রঞ্জনকে হয়ত মকররাজ হত্যা করতে পারে কিন্তু রঞ্জন আবার আসে, বারবার সে ঘুরেফিরে আসে শোষণযন্ত্রকে ভেঙে গুড়িয়ে দেবে বলে।

১.৭.৩ মকররাজ ঃ

যক্ষপুরীর রাজার নাম মকররাজ। তিনি জালের আড়ালে থাকেন। যক্ষপুরীতে যে সুস্পষ্ট সিঁড়ি রয়েছে, তার সর্বোচ্চ ধাপে মকররাজের অবস্থান অথচ তিনিও বন্দি। যক্ষপুরীর নিয়মের বাইরে একপাও হাঁটতে পারেন না রাজা। নন্দিনী এসে জালের দরজায় ঘা দেয়। নন্দিনী প্রাণের খুশি নিয়ে রাজার কাছে যেতে চায়। রাজা প্রাণপণে নিজেকে আড়াল করে রাখে আর তাতেই নন্দিনীর কাছে রাজার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। নন্দিনীর কাছে নিজের দুর্বলতা যাতে প্রকাশ না পায় তাই নিজেকে আরও বেশি করে ঘোষণা করে রাজা। প্রত্যাখান করে নন্দিনীর কুন্দফুলের মালা। "আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।" নন্দিনীর প্রাণ-প্রাচুর্য রাজাকে অবাক করে, ভেতরে ভেতরে পরাজিত হতে হতে জিতে যেতে চায় রাজা "আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী?" রাজার ক্ষমতা আছে, আছে সুপ্রচুর ঐশ্বর্য। যক্ষপুরীতে যে ক্ষমতার বিন্যাস, তাতে রাজা ক্ষমতা বলে যেমন করে পৃথিবীর বুক চিরে তার ঐশ্বর্য ছিনিয়ে আনে, মানবীও তেমন করে ছিনিয়ে আনবারই। অন্তত পৃথিবীর উঁচু লোকেদের তেমনই দাবি। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে জয় করে নেওয়ার কথা রাজা বোঝে না। নন্দিনীকে মুঠোয় ভরতে না পেরে রাজা তাই ছটফটিয়ে ওঠে একটা অনভ্যস্ত পরাজয়ের অনুভূতিতে। "নন্দিনী, তুমি কী জান?—বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।" রাজা মানবীকে ভোগ্য হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। নারী তার কাছে সহজলভ্যা। নন্দিনীও খুব সাধারণ, কোমল একটা মেয়ে অথচ

"ও তার কাঠিন্যে রাজাকে পরাজিত করে দেয় প্রতি পলে। রাজার কাছে নন্দিনী এলে রাজা তাকে অত্যন্ত রুক্ষস্বরে ব্যস্ততার কথা শোনায়, ফিরে যেতে আদেশ দেয়। অথচ নন্দিনী যখন বিদায় নিতে চায়, রাজা তখন বিরহী প্রেমিকের মতো অস্থির হয়ে ওঠে। রঞ্জনকে দেখে নন্দিনীর হৃদয়ে যে ছন্দ জাগে, রাজাকে দেখেও তেমন হয় কিনা রাজা জানতে চায়। যক্ষপুরীর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি নিজেকে তুলনা করে রঞ্জনের সঙ্গে। নন্দিনীকে অধিকার কের নেবার দাবি জানিয়ে, তাকে শক্তির পরীক্ষায় জিনেত নেবর কথা বলতে বলতে রাজা কখন যেন রঞ্জনের, বিশুর, কিশোরের সমতলে নেমে আসে। মকররাজ ভুলে যায়, সে যক্ষপুরীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর মানুষ আর নন্দিনী খোদাইকরদের শ্রেণীর। নন্দিনীর কাছে রাজা জানতে চায়, ".....বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না। ....রঞ্জনের মতোই?" নন্দিনী বুঝতে পেরেছিল, যক্ষপুরীর সকলে রাজাকে ভয় করে, তাকে দূর থেকে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে দেখে বলেই। রাজা যে জালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়, সে শুধুই দুর্বলতাকে গোপন করার চেষ্টা, নন্দিনীর কাছে তা খুব সহজেই ধরা পড়ে গিয়েছিল, ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তোলা বুদ্‌বুদের মতো একদিন সে সব যে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে, সেদিন যে সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে, নন্দিনী রাজাকে তার ইঙ্গিতও দিয়েছে। রাজা কিন্তু নন্দিনীর কাছে একদিন নিজেকে মেলে ধরেছে। যক্ষপুরীর মকররাজ যে আসলে নিজেই জালের আড়ালে বন্দি, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় রাজার স্বীকারোক্তিতে। তার যৌবন বিগত আর সেখানেই তার পরাজয় রঞ্জনদের কাছে। নন্দিনী, রঞ্জনরা 'নতুন যৌবনেরই দূত'। রাজা সেখানে বেমানান। এত ঐশ্বর্য, এত ক্ষমতা, সবটাই যে আসলে একটা ফাঁকি, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজার কথায়। "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমিক্ত তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছিক্ত আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।" রাজা একদিন নন্দিনীকে বলেছিল যে, শূন্যতাই তার শোভা। রাজার মধ্যেকার শূন্যতা শক্তির ভারে, ঐশ্বর্যের বারেকবেলই বেড়ে উঠেছে। রাজার মনে হয়েছে শূন্যতা রাজার শোভা কিন্তু আসলে রাজা ক্রমাগতই সেই বিশ্বাস থেকে সরে এসে নতুন করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, পূর্ণতার ভিক্ষুক সে। যে হাত দাবি করে, ছিনিয়ে আনে কেবলই, সেই হাতে প্রার্থীরমতো অঞ্জলি পেতে সামনে দাঁড়িয়েছে নন্দিনীর। নন্দিনীর মধ্যে রাজা খুঁজে পেয়েছে ছন্দ। রাজার হিসেবী মন নেচে উঠেছে সেই ছন্দে। "বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ" নন্দিনীর মধ্যে। রাজা সেই ছন্দের কাছে নিজের সব বোঝা অর্পন করে মুক্ত হতে চায়। আর সেটা পারে না বলেই নন্দিনীর রক্তকরবীর আভা ছেঁকে নিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে দুচোখে পরতে চায়। রঞ্জনের জন্যে নন্দিনীর অপেক্ষাকে, তার পূর্ণ নিবেদনকে বিশু শ্রদ্ধা করে, পূর্ণতার কামনা করে কিন্তু রাজা পারে না। রাজা কেবলই রঞ্জনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নিজেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। মনে মনে পরাজিত হয়ে যায় বলেই ঈর্ষায় অধীর হয়ে যায়। "সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।"

রাজা জানে, যে হাত দিয়ে সে শোষণের আর শাসনের চাবুক তুলে এনেছে, যে হাত দিয়ে পৃথিবীর সম্পদ জোর করে হরণ করে এনেছে, সেই হাত দিয়ে বিধাতার সহজ দানের মুঠি সে কখনও খুলতে পারবে না। রাজার মধ্যে পরাজয় আর জয়ের আকাঙ্খা প্রতিমুহূর্তে ক্রিয়াশীল হয়। অবশেষে রাজাকে পরাজিত হতে হবে, বঞ্চিত হতে হতে বিশ্বাস করতে শুরু করে, একদিন ক্ষমতার মিথ্যে বুদ্‌বুদ্ ভেঙে যাবে। রাজা বুঝতে পারে, খণ্ড খণ্ড চাওয়া আর দস্যুবৃত্তির জন্যই তার মধ্যে কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণা। রাজার সেই চাওয়ার দস্যু হার মেনে নেয় নন্দিনীর কাছে।

"তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কী জানি নে? নন্দিনী, তুমি তো আমাকে ফাকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?"

ধনতন্ত্র বিকশিত হতে হতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়, 'নিজের অন্তর্বিলীন স্ববিরোধিতার জন্য'। রাজা যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সর্বোচ্চে সে কিন্তু এই প্রথম নন্দিনীর কাছে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেই। 'সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়' অর্থাৎ নন্দিনীকে রঞ্জনই ভরিয়ে রাখতে পারে অথবা নন্দিনী রঞ্জনকে। একথা বলার মধ্যে দিয়ে রাজার হার মানতে শেখার শুরু। পরাজয় স্বীকার করার স্বস্তি যেমন রাজার কণ্ঠ জুড়ে তেমনি প্রাথমিক পরাজয়ের সূত্র ধরে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, রাজা তাও বুঝতে পারে। যে জালের আড়ালে নিজেকে ভয়ানক করে রেখেছিল মকররাজ, নন্দিনীর কাছে সেই ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। ধরা পড়ে যাবে সকলের কাছেই আর তখনই শ্রেণী বৈষম্যের সুযোগে গড়ে তোলা শাসনযন্ত্র ভেঙে যাবে— সেকথা রাজা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। নন্দিনীর রক্তকরবীর আভায় তাই রাজা ধ্বংসের আভাস খুঁজে পায় "ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি;" রাজা কেড়ে নিতে পারে। তার হাতে শক্তি আছে, রয়েছে রাজতন্ত্রের মারণশক্তিও। সেই শক্তি বলে রঞ্জনকে রাজা হত্যা করতে পারে। নন্দিনী যে বিপ্লবের ডাক দেয়, রঞ্জন যে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে যক্ষপুরীতে আসে, মকররাজের মিথ্যে ভয় দেখানোকে সেই বিপ্লবের গান নিষ্ক্রিয় করে দেয়। রাজা নন্দিনীকে ভয় দেখালে নন্দিনী তাই রাজাকে গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠের মতো মনে হয়। শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে। সেই সাজে ছেলের দল ভয় পায় তার রাক্ষসরূপী শ্রীকণ্ঠ তাতে ভারি খুশি হয়। রাজাকেও রাক্ষসরূপী শ্রীকণ্ঠের মতই মনে হয় নন্দিনীর। জালের আড়ালে, ক্ষমতার দর্প—সবটাই যাত্রার সাজের মতই। সেই সাজ খুলে ফেললেই রক্ত-মাংসের মানুষটি তার ক্লান্তি, রিক্ততা নিয়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে। রাজার ভয় দেখানোর খেলাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নন্দিনী তাই প্রশ্ন করে "এই ভুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!"

একদিন মকররাজ পাথরের আড়ালে আটকে থাকা তিন হাজার বছরের একটা মরা ব্যাঙের থেকে শিখতে চাইছিল কি করে টিকে থাকতে হয়। এই যক্ষপুরীতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে টিকে থাকা , মানুষকে সংখ্যায় পরিণত করে, তাদের আকাশ—তাদের আনন্দ-উৎসবকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে তাদের দিয়ে সোনার তাল খোঁড়ানো, প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠ রোধ করা—এই ছিল মকররাজের দিনযাপনের নিয়ম। নন্দিনী প্রথম রাজাকে বুঝিয়ে দেয়, রাজার সব অক্ষমতা তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। রাজার ক্ষমতার প্রদর্শনকে তাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠের যাত্রায় রাক্ষস সাজার মতই মিথ্যে সাজ বলে নন্দিনীর মনে হয়। রাজা নিজের ক্লান্তির কথা, রিক্ততার কথা আস্তে আস্তে নন্দিনীর কাছে ব্যক্ত করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মকররাজেরও আত্মোপলব্ধি শুরু হয়। নন্দিনীর স্বচ্ছ হৃদয়ে নিজের সত্যকার ছবি প্রতিফলিত হতে দেখে মকররাজ বুঝতে পারেন, তিনি মানুষকে ক্রমাগত বঞ্চিত করতে গিয়ে নিজেকেই বঞ্চিত করেছেন। এতটাই রিক্ত, এতটাই অকিঞ্চিতকর হয়ে গেছে যে নন্দিনীকে পাবার জন্য আকুল হলেও নিজে যে আসলে সে অসুন্দরের প্রতিমূর্তি, সেকথাইবারবার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে। রাজা নন্দিনীকে বলে, "সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্ণা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি।" যে রাজা তিন হাজার বছরের মরে যাওয়া ব্যাঙের কাছ থেকে টিকে থাকার রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করছিল, সেই রাজা 'মরবার আরাম' যখন খুঁজে পায়, তখনই নন্দিনীর জিতে যাওয়ার শুরু। রঞ্জন আসার আগেই নন্দিনী যক্ষপুরীতে রঞ্জনের বার্তা নিয়ে এসেছিল। সে এসেছিল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। রাজা স্বয়ং নন্দিনীর প্রধান সহচর হয়ে উঠতে চলেছে, সেই সংবাদ রাজা নিজেই পৌঁছে দেয়। অবশেষে রঞ্জন এসে পৌঁছয় যক্ষপুরীতে। মকররাজ চিনতে পারে না রঞ্জনকে হত্যা করে রাজা। যুবকের স্পর্ধিত আগমনকে ভয় করে রাজা ও তার সর্দারেরা তারা মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখতে চায়। স্পর্ধাকে তাই ক্ষমা করে না। ভেঙে পড়ার আগে মকররাজ শেষ বারের জন্য নন্দিনীকে

ভয় দেখাতে চায়। নন্দিনী রাজার ঘরে এসে দেখতে পায় রঞ্জনের মৃতদেহ। আর-মকররাজের কাছে তখন ধরা পড়ে যায়, তার ক্ষমতার দম্ভ একটা বড় মিথ্যে। তাকে ঠকায় তার নিজের শাসনযন্ত্রই "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।—" মকররাজ হাহাকার করে ওঠে যৌবনের প্রকাশকে নিজের হাতে হত্যা করার যন্ত্রণায়" আমি যৌবনকে মেরেছি—" এরপরই ধনতন্ত্রের অনিবার্য সেই অন্তর্ঘাত প্রকাশ্যে এসে যায়। রাজা নন্দিনীর সঙ্গে চলে যক্ষপুরীর কারাগারের দেওয়াল ভাঙতে "আজ থেকে আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন।.... এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক—তাতেই আমার মুক্তি।" নন্দিনী, ফাগুলালদের সঙ্গে রাজা লড়াইয়ে নামে পথে। রাজা সামিল হয় যৌবনের মিছিলে, জীবনের সন্ধানে। তারপরই বুঝতে পারে, এতদিন যক্ষপুরীর কারিগরদের মতই রাজা ও স্বয়ং বন্দি ছিল। ক্ষমতার সর্বোচ্চে নয়, ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পুতুলের মতো তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তাই রাজার সৈন্য, তার শাসন যন্ত্র, কিছুই রাজার আজ্ঞাবহ নয়, সেসব চলে সর্দারদের আদেশমতো। "ঐ যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।" রাজা নন্দিনীর ডাক শুনে নড়েচড়ে উঠেছিল। তারপরে সেই আহ্বান রাজার মর্মস্থলে পৌঁছে গেছে। যে ভণ্ডামিকে রাজা শক্তি বলে মনে করত, তার ফাঁকি নন্দিনীই রাজাকে ধরিয়ে দিয়েছে। রাজা তাই একদিন নিজেই পথে নেমে এসেছে জালের আড়াল ভেঙে। নন্দিনীই যে জীবনকে চিনতে শিখিয়েছে, মকররাজ যে সেই চেনাকেই জীবনের চরম বলে গ্রহণ করেছেন ফাগুলালের কথায় তা স্পষ্ট। অধ্যাপক তার পুঁথিপত্র ফেলে রাজার পথের পথিক হতে এলে ফাগুলাল তাই বলে, "রাজা তো ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।"

১.৭.৪ বিশু পাগল ঃ

'রক্তকরবী' নাটকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের রূপ নাটকার যে সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। শ্রেণী বৈষম্যের কথা এই নাটকে রয়েছে। নন্দিনীর শ্রেণীগত অবস্থান যদিও শ্রমিকদের স্তরেই কিন্তু তাকে সংখ্যাতত্ত্বের ঘেরাটোপে নিষ্প্রাণ, নির্বোধ পুতুল করে দেওয়ার ক্ষমতা সর্দারদের নেই। অতএব নন্দিনী অনায়াসে রাজার কাছেও পৌঁছে যেতে পারে। যক্ষপুরীতে নন্দিনীর প্রধান সহচর বিশু। নন্দিনীর 'পাগল ভাই'। বিশুর সামাজিক অবস্থান সমগ্র নাট্যঘটনায় গোকুল, ফাগুলালদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে, কিন্তু বিশুর কথাতেই জানা যায়, তার 'ডি-ক্লাসমেন্ট' হয়েছে। তাকে যক্ষপুরীতে আনা হয়েছিল চর হিসেবে। শ্রমিক অসন্তোষ তাদের সমস্ত খুঁটিনাটির খবর সর্দারদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তার কাজ। বিশুর স্বচ্ছ প্রাণ যে গানের সুরে ডুবে থাকে, সেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল এই কাজ। তাই সে নিজেই নেমে এসেছে ক-খ-ট ঠ দের পাড়ায়। সেই অপরাধে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। বিশু তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। সে জানে যক্ষরাজ এবং তাঁর সর্দারদের কড়া শাসনে মানুষের প্রাণের রস শুকিয়ে যায়। "আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ—তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।" ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রার হিসেবী মন বিশুর এই নির্বুদ্ধিতায় অবাক হয়। "এমন আরামের কাজেও টিকতে পারলে না বেয়াই?" কিন্তু বিশুর প্রাণের তার যে অন্যসুরে বাঁধা। মানুষকে যেখানে সংখ্যায় পরিণত করা হয়, তার কাছ থেকে প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করা হয়, সেই ব্যবস্থার অংশীদার বিশু হতে পারে না। যে মানুষগুলোর সবুজ গ্রাম ছিল, ফসল ফলানো ছিল, অভাব ছিল ঠিকই কিন্তু অবকাশও ছিল, নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। গাঁয়ের সেই মানুষগুলো যক্ষপুরীতে এসে 'দশ-পঁচিশের ছক' হয়েছে। তাদের কাজের যেমন সর্দারদের প্রখর দৃষ্টি, তাদের অবকাশেও ততটাই শ্যেন দৃষ্টি। বিশুর গান সেই যক্ষপুরীর দমবন্ধকরা গুমোটে প্রাণ পায় না। নন্দিনী সেখানে মুক্তির খবর এনেছে বলেই বিশুর সব বিষণ্ণতা

গানে গানে ভরে উঠেছে। নন্দিনী এবং বিশু পরস্পরের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পায়।

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাঙা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল শুনেছিলে?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব? এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটাই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু

আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।"

—অতএব বিশু এবং নন্দিনী পরস্পরের কাছে মুক্তির আশ্বাস বয়ে আনে। যক্ষপুরীর অবরোধে বিশু ছটফটিয়ে মরছিল। নন্দিনীকে অবরুদ্ধ করার মতো আয়োজন যক্ষপুরীতেও নেই। নন্দিনী তাই বিশুর 'দুখজাগানিয়া', তার 'ঘুম-ভাঙানিয়া'। নন্দিনী বিশুর আয়নাও বটে। নন্দিনী যেমন বিশুর কাছে এলে 'উঁচুতে উঠে বাহিরকে' দেখতে পায়, বিশু ও তেমনি নন্দিনীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পায় নিজেকে। তার স্ত্রী চলে গেছে তাকে ছেড়ে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ থেকে সে ৬৯ ও তে পরিণত হয়েছে। 'একজন সংবেদনশীল মানুষের আত্মবিশ্বাস হারানোর পক্ষে এ যথেষ্ট। বিশু ও তেমনি নিজেকে ভুলতে বসেছিল। অবশেষে নন্দিনীর চোখেই নতুন করে দেখতে পেয়েছে তার আলোকমুখ প্রাণের প্রতিবিম্ব। "যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঠেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুম এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।" নন্দিনীর সমস্ত খুশি, তার সব উচ্ছলতা, অন্তরের আগুন, রক্তকরবীর আভরণ সব-সব নিয়ে সে শুদুই রঞ্জনের। যৌবন প্লাবিত করে নন্দিনীকে। নন্দিনী সেই ভেসে যাওয়ার খবর বিশুকে অকপটে দেয়। রাজাকেও দেয়। তবুও বিশুর কাছ থেকে প্রাণের যে রসদ সে পায়, সেখানে রঞ্জন অনুপস্থিত। তার পাগল ভাইয়ের কাছে সেখানেই তার মনের অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। তাদের খুশির আকাশে আলো ঝলমলিয়ে ওঠে যক্ষপুরীর অন্ধকারকে আরও ম্লান করে দিয়ে। "তোমাকে একটা কথা বলি পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।" বিশু ও নন্দিনীকেই তাই জানাতে পারে তার যন্ত্রণার কথা। কেমন করে একটি মেয়ে সর্দারের সোনার চূড়া দেখে পাগল হয়েছিল আর বিশুকেও টেনে এনেছিল সেই স্বর্ণচূড়ার আকর্ষণে। যেখান থেকে যক্ষপুরীর বন্দি জীবনে হাহাকার করে উঠেছে বিশুর সুর। একটি মেয়ে সোনার স্বপ্ন দেখিয়ে বিশুকে বন্দীজীবনে টেনে এনেছিল, আর নন্দিনী স্বপ্ন দেখায় মুক্তির। বিশুর কাছেই নন্দিনী মকররাজের কথা বলে। আসলে নন্দিনীর সঙ্গে তার পাগলভাইয়ের সম্পর্ক দুঃখের, মুক্তির আকাঙ্খায় অধীর হয়ে ওঠার মধ্যে। সেই সম্পর্ককে বুঝতে ফাগুলাল, চন্দ্রারা তাই ভুল করে, ভুল করে সর্দারও। নন্দিনীর সঙ্গে বিশুকে প্রাণের আলাপ করতে দেখে বিশুকে সর্দার প্রশ্ন করে "কী গো ৬৯৩, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছ-বিচার নেই?" নন্দিনীর সঙ্গে তার পাগলভাইয়ের সম্পর্কের শুরু যক্ষপুরীতে এসে নয়,

তাদের গাঁয়েই। সেখানে রঞ্জন-নন্দিনীর দুরন্তপনায় বিশুও যে সাথি ছিল, নন্দিনীর কথায়, তার আঁচ পাওয়া যায়। তারপর একদিন 'মনে কী দ্বিধা রেখে' চলে এসেছিল বিশু। নন্দিনীর মনে 'যেতে যেতে তুয়ার হতে' কী ভেবে মুখখানি ফিরিয়ে চেয়ে আসার একটা ছোট্ট বেদনায় রয়ে গিয়েছিল। অতএব নন্দিনী বা রঞ্জনের মতই বিশুও আলোকমুখী প্রাণ। নন্দিনী যেমন করে যক্ষপুরীর নিয়মের জাল ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে পারে, বিশু ও পারে সর্দারের মুখের ওপর বলে দিতে, "তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।" শাস্তির ভয়, মৃত্যুর ভয় সমস্তই অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারে নন্দিনীর পাগলভাই। কিশোরের মতই। নন্দিনী-সর্দারকে কুন্দফুলের মালা উপহার দিলে তাই বিশুর স্পর্ধিত উচ্চারণ সর্দারের সামনেই "ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন?" বিশুর সঙ্গে নন্দিনীর যোগাযোগ নিবিড় ভালবাসায় বাঁধা. রাজার কাছেও তা ধরা পড়ে যায়। নন্দিনীকে ভালবাসে তার পাগলভাই। অথচ নন্দিনীর ভালবাসার জন্যও তার অগাধ ভালবাসা। রঞ্জনের কথা উঠলে বিশুরও কথার বান ডেকে যায়। তার প্রাণের কাছাকাছি যে নারী, তার প্রিয়তম পুরুষটিও বিশুর ভালবাসার পাত্র। রঞ্জনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিতেও কোথাও কুণ্ঠা নেই তার। রাজার কাছে তাই নন্দিনী যেমন অকপটে স্বীকার করে নেয় বিশু তার সাথের সাথি, বিশুও সমস্ত সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়ে রাজাকে স্পষ্টই জানায় "না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা"। বিশুর গানও নন্দিনীর মতই যক্ষপুরীর শোষণযন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে। বিশু পাগলের গান শুধুই নন্দিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর সর্দারদের ভয় পাইয়ে দেয়। ভয় পাওয়ায় রাজাকেও। আসলে শ্রমিক শোষণের নিয়ম এতই ফাঁকা যে সর্দাররা এবং রাজাও ভয়ে ভয়ে থাকে। তাদের ভয় নন্দিনী-রঞ্জন-বিশু-কিশোরদের। রাজা জানে, মানবহৃদয়ের অবশ্যম্ভাবী মনুষ্যত্ববোধ লোহার কপাট দিয়ে আটকানো। সেই লৌহকপাটে নন্দিনী ঘা দেয় বলেই রাজার নিয়ম এলোমেলো হয়ে যায়। বিশু নন্দিকীকে গান শিখিয়েছে 'ভালবাসি ভালবাসি' আর সে গান শুনে রাজা চিৎকার করে ওঠে "থাক্ থাক্ থামো তুমি, আর গেয়ো না"। বিশুর কাছে সেই ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। সামান্য খোদাইকরের দলের হয়েও তাই রাজার সম্পর্কে যেন করুণা প্রকাশ পায় পাগলভাইয়ের কথায় "ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে—" নন্দিনীকে সঙ্গে করে তাই বিশু যেন যক্ষপুরীর হাওয়ায় তার গানের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়, ভয় পাইয়ে দেয় মকররাজ আর তার সর্দারদের। বিশুর মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় যক্ষপুরীর বাতাসে, তার শাস্তি পেতেই হয় তাকে; রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্য ডাক পড়ে তার। পাগল ভাইয়ের প্রাণের সখী নন্দিনীর প্রিয়তম রঞ্জন যক্ষপুরীর শোষণযন্ত্রকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, এই বিশ্বাস যার শ্বাসপ্রশ্বাসে, স্বভাবতই সে সর্দারদের রক্তচোখকে ভয় করবে না। ফলস্বরূপ বিশুর কপালে অমানবিক অত্যাচার জোটে, তাকে বিচারশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তাক্ত সেই মানুষটি নন্দিনীকে গান শোনাতে শোনাতে বিদায় নেয় প্রহরীর বাঁধনের যন্ত্রণা নিয়ে। যক্ষপুরীতে যেখানে ফসলের আভাস নেই, মাটির মরা ধন তুলতে তুলতে যাদের মনুষ্যত্বও মরে গেছে, তাদের শুনিয়ে যায় ফসল কাটার গান। প্রিয় মানবীর জন্য উচ্চারণ করে যায় শুভেচ্ছা, "এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।"

নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যে বিশু আসে বিদ্রোহের স্পষ্ট খবর নিয়ে। বিদ্রোহের রঙ যে রমনী তাকে স্পষ্ট করে চিনিয়েছিল, সেই নন্দিনীকেই দিতে আসে বিদ্রোহের সংবাদ, তাকে সাথি করতে চায়। "আমাদের কারিগররা বন্দি শালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?" রঞ্জনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে সে পথের ধুলোয়। বুঝতে পারে, যে নন্দিনী তার প্রাণে সুর জোগাতো, তাকে বিদ্রোহের শক্তি জোগাত, সে চলে গেছে তার রক্তকরবীর উন্মাদনা যক্ষপুরীর প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে। নন্দিনীর পাগলভাই উপলব্ধি করে, তার একলা লড়াইয়ের শুরু। তার পাগলি তাকে যক্ষপুরীর বন্দিশালা ভাঙবার ভার দিয়ে গেছে। কৃষিজীবী

মানুষগুলোকে সেখান দিয়েই নিয়ে যেতে হবে সবুজের কাছে। ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের সংস্কৃতি। সেসব উপলব্ধি করেই বিশুর শ্লোগান "নন্দিনীর জয়"।

১.৭.৫. কিশোর ঃ

'রক্তকরবী' নাটকের প্রাণশক্তি নন্দিনী। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকারে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আসা একফালি রোদের মতো। যেখানে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয় প্রতি মুহূর্তে, সেখানে নন্দিনী নিজেই একটা প্রতিবাদের নাম। নন্দিনী খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে কিশোরের প্রাণে, বিশু পাগলার প্রাণে, অধ্যাপকের তাত্ত্বিক জীবনে এমনকি রাজাকেও সে কাজ ভুলিয়েছে। নন্দিনীকে অস্বীকার করাও যায় না। নন্দিনীকে রক্তকরবীর ফুল এনে দিতে গিয়ে কিশোর তাই মার খায়। মার খেয়েও ধন্য হয়ে ওঠে। অথচ কিশোর তো নন্দিনীর সঙ্গে চেনাজানা সামাজিকতার কোন নিয়মে বাঁধা নয়। নন্দিনীর প্রণয়ীও নয় সে। তবুও এতটাই সম্পর্কিত যে নন্দিনীর জন্যে প্রাণ দিতেও পারে। "একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।" আসলে নন্দিনীর সঙ্গে কিশোরের যোগ অন্য জায়গায়। যেখানে মানবের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে মানুষ ভয় পায় না। কিশোরও তো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণ এবং অত্যাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তার প্রতিস্পর্ধী হওয়ার সাহস তার আছে। নন্দিনী মানবীসুলভ বন্ধুত্ব আর দুর্বলতা নিয়ে কিশোরকে 'একটু সামলে' চলার পরামর্শ দিলে কিশোর তাই বলে ওঠে, "না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবে।" এখানেই কিশোর, বিশু, রঞ্জন, নন্দিনী সবাই একাকার হয়ে যায়। এক হয়ে যায় তাদের স্বপ্ন দেখা। একদিন একটা পৃথিবী আসবে যেদিন কিশোর নন্দিনীকে ফুল এনে দিতে গেলে তাকে অত্যাচার সইতে হবে না। তারা একই স্বপ্ন দেখতে পারে বলেই কিশোরের সঙ্গে নন্দিনীর প্রাণের যোগ।

১.৭.৬ অন্যান্য চরিত্র

'রক্তকরবী' নাটকের মূল চরিত্র নন্দিনী, বিশু, রঞ্জন এবং মকররাজ। এই নাটকের পটভূমি যক্ষপুরী। যক্ষপুরীতে কাজ করতে আসা খোদাইকররা এখানে এসে সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। ফাগুলাল, গোকুল এমনই চরিত্র। জীবনকে খুব সাধারণভাবে দেখে তারা। যক্ষপুরীতে সোনার টানে তারা এসেছে। সেদিন যে ঐশ্বর্য তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, সেটা যে আসলে বন্দিশালা, সেখান থেকে যে আর 'ফিরিবার পথ নাই', সেকথা তারা বুঝতে পারেনি। কিন্তু এই বন্ধনদশাকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিল তারা যতদিন যক্ষপুরীতে নন্দিনী আসেনি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রজা শোষণ হয় কিন্তু প্রভুর কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে শ্রমিকরা যাত্রার আসর বসাবে, না গান গাইবে নাচ করবে, সেখানে সামন্তপ্রভু হস্তক্ষেপ করেন না। ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি হয় চর্চিত হয় লোক সাধারণের নিজস্ব নিয়মে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু লোকসাধারণের সংস্কৃতি বন্ধ্যা হয়ে যায়। কেননা সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চালিকাশক্তি যাদের হাতে, সেই সর্দারেরা চর রাখে, গোঁসাই রাখে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করবার জন্য। শুধু তাই নয়, সেখানে সুপ্রচুর মদ বরাদ্দ থাকে বিশু, ফাগুলালদের জন্য। ফাগুলাল মদের মধ্যে ডুবে থেকে তার যন্ত্রণাকে ভুলতে চায়। তার শেকড় ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, সংখ্যায় পরিণত হওয়ার যন্ত্রণা। কেনারাম গোঁসাইকে তাই ভালো কথা শুনিয়ে ফাগুলালদের মন শান্ত করার কথা বললে ফাগুলালের ভেতরকার সেই চাপা দেওয়া বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে "নানা, সে হবে না সর্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়োজোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।" গোঁসাইয়ের শান্তিমন্ত্রে চন্দ্রা বিগলিত হলে ফাগুলাল কিন্তু বলে "এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামি আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভঙামি সইব না।" ফাগুলালের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার করে নেবার মধ্যেও যে খুব সংগোপনে বিদ্রোহের বীজ সুপ্ত ছিল, তার প্রমাণ তার পথে নামার মধ্যে। নাটকের শেষে নন্দিনী, বিশুর সঙ্গে বন্দিশালার দরজা

ভাঙতে বিপ্লবের নিশান তুলে ধরেছে ফাগুলালই। সেই তুলনায় চন্দ্রা অনেকবেশি আপোস করতে অভ্যস্ত। সে সর্দারের ওপর ভরসা করে, ছুটির জন্য দরবার করে। নন্দিনীর প্রতি একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা যেমন চন্দ্রার মধ্যে আছে, তেমনি চন্দ্রা সত্যিই বিশ্বাস করে, একদিন নন্দিনী যক্ষপুরীর সর্বনাশ ঘটবে। আসলে চন্দ্রা আর পাঁচটা গড়পরতা মেয়ের মতই মোটা ভাত-কাপড়ের আরামটুকু হারাতে চায় না। তাই বিশুর 'ডি ক্লাসমেন্ট' তার কাছে আক্ষেপের বিষয়।

যক্ষপুরীর সর্দারেরা আসলে রাজাকেও বন্দি করে রাখে। সর্দাররাই আসলে চালিকাশক্তি হাতে নিয়ে শ্রমিক শোষণের ছক কষে। মুখে তাদের অমায়িক হাসি। চন্দ্রাদের সম্পর্কিত করার মতো উদারতাও দেখায়। মোড়লদের সম্পর্কে যেমন, গোঁসাই সম্পর্কেও তেমন একটা দেখনসই উদারতার মুখোশ পরে থাকে। কিন্তু নন্দিনীতো সর্দারকেও কুঁদফুলের মালা উপহার দেয়। সর্দারের সঙ্গে মেজো সর্দারের একটা মানবসুলভ পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে। মেজো সর্দার আবার রাজার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায়। কিন্তু সর্দার জানায়, 'রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়।" নন্দিনীকে সামনে রেখে সর্দারের সঙ্গে মেজো সর্দারের যে দ্বন্দ্ব, তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, একটা ঘোর অবিশ্বাসের বাতাবরণ যক্ষপুরীকে ঘিরে রয়েছে। রাজা, সর্দার, মেজো সর্দার—সকলেই সকলের অবিশ্বাসের পাত্র।

'রক্তকরবী' নাটকে দুটি ইন্টেলেকচুয়াল চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; অধ্যাপক এব পুরাণবাগীশ। সংলাপের প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, প্রথম জন হলেন বিজ্ঞানী (তথা বাস্তবাগীশ) এবং দ্বিতীয় ইতিহাস, দর্শন, পুরাণ ইত্যাদির পণ্ডিত। পুরাণবাগীশের গুরুত্ব এ নাটকে নেই বললেই চলে, যা পার্শ্বচরিতর হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক সম্পর্কে বলা যাবে না। এই মানুষটিকে টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর প্রতিভূরূপে গড়েছেন কবি। তাঁর আবেগ খনিশ্রমিকের প্রতি আছে বটে, কিন্তু সতর্ক স্বার্থবুদ্ধি। তাকে মালিপক্ষের সঙ্গেই থাকতে বাধ্য করে। যক্ষপুরীর আর সব পুরুষের মতোই নন্দিনীর সম্পর্কে তাঁরও একটা অনির্দেশ্য আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে কখনও গোঁসাইয়ের মতন তার সম্বন্ধে অর্ধস্ফুট লোলুপতা দেখায় না, বা সর্দারের মতো বিরূপতার মোড়কে আকাঙ্খাকে ঢেকে রাখে না। অধ্যাপক নাটকের শেষ পর্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে এসেছেন। গণবিপ্লবের অগ্রনায়িকা হয়ে নন্দিনী যখন ছুটে গেছে বন্দিশালা ভাঙার নেতৃত্ব দিতে, তার পিছনে ছুটে গেছে যক্ষপুরীর শ্রমিকের দল, আশেপাশের গাঁয়ের কৃষকেরা; আর এই মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকও সামিল হয়েছে সেই মিছিলে। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষও না-এলে যে যথা অর্থে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করে না, ইতিহাসে সেই সত্য বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। এখানে যক্ষপুরীর ধনতান্ত্রিক শোষণকে মোকাবিলা করতে শ্রমিক-কৃষকের পাশাপাসি মদ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশ যদি যোগ না দেয়, তাহলে বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিস্ফোরণ যে ঘটতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ সেটা উপলব্ধি করেচেন। তার সেই পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই তিনি অধ্যাপককেও নিয়ে গেছেন "কারার ঐ লৌহকপাট" ভাঙার সংগ্রামে। ফরাসি বিপ্লবে বাস্তিলের কারাগার ভাঙা কিংবা রুশ বিপ্লবে জারে উইন্টার প্যালেস অধিকার করার লড়াইতেও এই তিন সামাজিক শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব ছিল কমবেশি, সেকথা এখানে মনে রাখতে হবে।

'রক্তকরবী'র পার্শ্বচরিত্রগুলির সামগ্রিক মূল্যায়নে এটাই দেখি যে, এরা যক্ষপুরীর সামাজিক বিন্যাসে একে অন্যের সঙ্গে বিচিত্র কিছু দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আবদ্ধ হয়ে আছে। ফাগুলাল, গোকুল, চন্দ্রা এরা ঐ যক্ষনগরীর শ্রমজীবী নারীপুরুষদের প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। বড়-মেজো-ছোট তিন সর্দার, মোড়ল, গোঁসাই—এরা যক্ষপুরীর শাসনব্যবস্থার যে নির্মম যন্ত্ররূপ, তারই ছোট-বড় সব স্ক্রু-নাট-বল্টু-হ্যান্ডেল-লেভার স্বরূপ। কিন্তু, বস্তুতপক্ষে এরা তো কেউই যন্ত্র নয়, মানুষ—তাই মানবীয় প্রবৃত্তি, প্রবণতা সবই এদের মধ্যে আছে। মেজো সর্দার তাই যক্ষনগরীর শাসক-শোষকের দলভুক্ত হয়েও সেই ব্যবস্তাকে ঘৃণা করে। গোঁসাই নিজেও জানে সে মিথ্যাচারী। এমন কী বড় সর্দারও দ্বিধায় ভোগে। চর ব্যবস্থা নির্ভর, এক্সপ্লয়টেশন-সর্বস্ব সামাজিক পরিকাঠামো যে ভঙ্গুর—তা এদের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সংশয় থেকেই বোঝা যায়। তাই কাহিনীর শেষে যখন ধনতন্ত্রের সহজাত স্ব-বিরোধের লব্ধফল হিসেবে রাজা এবং তাঁর (অচিরপূর্ব পর্যন্ত অনুগত) সর্দার বাহিনীর মধ্যে সঙ্ঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে দেখা যায়, তখন এই সব

পার্শ্বচরিত্রগুলি ইতিহাসের কুশীলব হয়ে শেষ সংগ্রামের এপক্ষ-ওপক্ষে সামিল হয়, দেখি। 'রক্তকরবী' নাটকেই সেইটাই হল এই চরিত্রগুলির সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব।

1.8 অনুশীলনী :

1.8.1 বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

১। 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণ কতটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা করুন। প্রসঙ্গক্রমে, এর আগের নামদুটি— 'যক্ষপুরী' এবং 'নন্দিনী' রাতখানি মানান্‌সই ছিল তাও বলুন।

২। 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রেণী-বৈষম্যের যে ছবি আছে, নাটক অবলম্বনে তা আলোচনা করুন। এ নাটক কি সত্যিই শ্রেণিসংগ্রামজাত গণবিপ্লবের চিত্রায়ন করেছে? আলোচনা করুন।

৩। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার চূড়ায় বসে ছিলেন যে মকররাজ, তিনিই একদিন পথে নেমেছেন শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে—রাজার এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করুন।

৪। "নন্দিনীই রক্তকরবী নাটকের প্রাণশক্তি"—আলোচনা করুন। নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেম এ নাটকে কতখানি সঞ্জীবনী— প্রসঙ্গক্রমে তা-ও বলুন।

৫। বিশুপাগল চরিত্রটি এই নাটকের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নাটক অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৬। 'রক্তকরবী' নাটকে সংকেত এবং প্রতীকের ব্যবহারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—এই বক্তব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাটকে প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য লিখুন।

৭। "রক্তকরবী নাটকের গানগুলিও এক অর্থে যেন প্রতিবাদেরই অস্ত্র"—এই কথার যাথার্থ্য আলোচনা করুন।

৮। কিশোর চরিত্রটি এই নাটকে কতটা অনিবার্য বলে আপনার মনে হয়?— যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৯। রক্তকরবী ফুল এই নাটকে কীভাবে এসেছে? এর সাংকেতিক বিশ্লেষণ করুন।

১০। এই নাটকের অপ্রধান চরিত্রগুলির গুরুত্ব আলোচনা করুন। নাটকের কোন্ কোন্ প্রয়োজন তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছে তাও দেখান।

১১। "রঞ্জন এই নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত"—আলোচনা করুন। রঞ্জন-বিশ-রাজা সর্বত্র তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগত অবস্থান সম্পর্কেও আলোকপাত করুন।

১২। "সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে।"—কার উক্তি? উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

১৩। "মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে।"— কার সম্পর্কে, কোন্ প্রসঙ্গে, কার এই উক্তি?

১৪। "ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।—" এই কথার বিস্তৃত ব্যাখা করুন।

১৫। "সবার আগে ঐ ডাইনিকে পুড়িয়ে মারতে হবে"— কার সম্পর্কে কার এই উচ্চারণ? এই ভুল কেমন করে ভেঙেছে? নাটকের পরিণামে সেই ভুল ভাঙার অভিঘাত কতখানি পড়েছে— দেখান।

১৬। "রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার জয়ের সূচনা—আলোচনা করুন।

18.2 অবিস্কৃত প্রশ্ন ঃ

১। 'রক্তকরবী' নাটক রবীন্দ্রনাথ খসড়া হিসেবে কতবার লেখেন? বিভিন্ন পাঠের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি কী কী নির্দেশ করুন।

২। "নাটকটি সত্যমূলক"। 'রক্তকরবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই এই উক্তির তাৎপর্য আলোচনা করুন।
৩। 'মরা ব্যাঙ' এবং 'নীলকণ্ঠপাখির পালক', 'রক্তকরবী' নাটকে কোন্-কোন্ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে? বলুন।
৪। 'রক্তকরবী' নাটকে একটি 'অশ্রুত' গানে প্রসঙ্গ আছে; সেটি কখন, কার গাওয়া?
৫। 'দুখ জাগানিয়া' এবং 'ঘুম ভাঙানিয়া' কথাদুটির তাৎপর্য কী বলুন।
৬। রক্তকরবী এব কুন্দ—এই দুটি ফুল 'রক্তকরবী' নাটকে কী কী ভাবের ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে, বলুন।
৭। অধ্যাপক এবং গোঁসাই—এই দুজন 'রক্তকরবী' নাটকের কোন্-কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করেছে, বলুন।
৮। 'পৌষের গান'টির গুরুত্ব এ-নাটকে কতখানি বলুন।

18.3 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। নন্দিনী কোন্ গাঁয়ের মেয়ে?
২। নন্দিনীর ছোটবেলার সাথিদের নাম কী-কী?
৩। যক্ষপুরীতে ফাগুলাল নাটকের কোন্ খসড়ায় দেওয়া হয়?
৪। 'নন্দিনী' নামকরণ নাটকের কোন্ খসড়ায় দেওয়া হয়?
৫। 'রক্তকরবী' নাটকের পরোক্ষ প্রেরণা হিসেবে মান-ইতিহাসের কোন্ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নির্দেশ করা যায়?
৬। লালটুপি পরা লোকেরা রঞ্জনকে কার বাড়িয়ে দেখেছিল?
৭। মার খাওয়ার পর পালোয়ানের বাসা স্থির হয়েছিল কোথায়?
৮। পাহাড়তলার সরোবরে কোথা থেকে জল এসে জমা হত?
৯। "দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল"—কীসের উপমা?
১০। বিশুর বউকে কারা, কেন নিমন্ত্রণ করত?
১১। "নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগী" মানে কী?
১২। "রাজার এঁটো" কারা?
১৩। "ধ্বজদন্ত' সম্পর্কে যক্ষপুরীর মানুষের ধারণা কী?
১৪। বজ্রগড়ে কী হত? কুবেরগড় কোথায়?
১৫। "এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার"— কার কথা?
১৬। ৩২১ যক্ষপুরীতে কোন্ ব্যক্তির সংকেতসংখ্যা?
১৭। অধ্যাপক "প্রলয়গোধূলির মেঘ" বলে কীসের উল্লেখ করেছিলেন?

18.4 গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. রক্তকরবী □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী, ২০০২)
২. 'রক্তকরবী' □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সংস্করণ □ সম্পাদনা □ পল্লব সেনগুপ্ত, ২০০১)
৩. 'রক্তকরবী' □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী □ সম্পাদনা □ প্রণয়কুমার কুণ্ডু; ১৯৯৮)
৪. 'রক্তকরবী' লোকায়ত ভাবনা □ দীনেন্দ্রকুমার সরকার (পুস্তক বিপণি; ১৯৮৩)
৫. রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী ; সমাজ-বাস্তবতা □ অজয়কুমার ঘোষ (ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৪)
৬. 'রক্তকরবী' : অন্যভাবনায় □ সৌমিত্র বসু (রত্নাবলী, ২০০০)

একক 2 ❑ 'সে'

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 রবীন্দ্র-রচনাধারায় 'সে'

2.3 'সে' গ্রন্থটি উৎকল্পনায় হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ: 'সে গ্রন্থটি উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ কী'—এই জিজ্ঞাসার.....। এইভাবে হবে।

2.4 "আলাপে, গল্পে, রসিকতায় 'সে' বড়োদের বই"।

2.5 রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং চিত্রিত 'সে'—কয়েকটি কথা।

2.6 অনুশীলনী

2.7 সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা ঃ

'সে' গ্রন্থটির প্রকাশকাল বৈশাখ, ১৩৪৪ (ইং ১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের ধারায় 'সে' একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। ১৪ অধ্যায় বিন্যস্ত 'সে' গ্রন্থের প্রধান গল্পকথক 'আমি' শ্রোত পুপদি, আর 'সে' কখনও অপ্রধান গল্পকথকের ভূমিকায় এসেছে। এই 'সে' হল মূলক লেখকের আজগুবি গল্পের মূল অবলম্বন, অসম্ভব গল্পের বহুরূপী। লেখকের ভাষায় 'সে' হল 'নামহারা বানানো মানুষ' 'কেবল বাক্য দিয়ে তৈরি'। রবীন্দ্র মানসে যেসব অসম্ভব কল্পনা ভিড় করে এসেছে 'সর্বনামধারী' এই 'সে' চরিত্রটিকে আশ্রয় করে তাকে গল্পরূপ দিয়ে লেখক পুপুদিকে আর পাঠকসমাজকে শুনিয়েছেন।

২.২ রবীন্দ্র-রচনাধারায় 'সে' ঃ

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা রাজশেখর বসু অসম্ভবকল্পনার সুদক্ষ ক্রীড়াশিল্পী। এই অসম্ভব কল্পনার সুদক্ষ ক্রীড়াশিল্পী। এই অসম্ভব কল্পনার জগতে সাবলীল বিচরণই ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান পরিচয়, রাজশেখর বসুর ক্ষেত্রে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মাঝে মাঝে কল্পনার উদ্ভট মুখ উঁকি দিলেও জীবনের শেষ দশকে তিনি এইধরনের রচনায় লেখনী ধারণ করেছিলেন। যদিও তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি লেখায়— 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে, 'হিং টিং ছট' কিংবা 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় কল্পনার উদ্ভট লক্ষণ দেখা গেছে। কিন্তু তা রূপকের বাইরে 'রূপ' হয়ে আসতে পারেনি। ১৯৩৬-৩৭ সালে যখন 'খাপছাড়া' কিংবা 'সে' লেখা হচ্ছে, তখন এই অসম্ভব কল্পনা একটা 'রূপ' হয়ে ধরা দিল।

অবশ্য প্রথমপর্বের রচনায় উৎকল্পনার হাস্যরসের অনুপস্থিতির একটা কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন 'জীবনস্মৃতিতে। বলেছেন— 'এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে।..... সেইসময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম আপনার কৌলিন্য প্রমাণ করবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ....আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই আন্দেলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতকবা ব্যঙ্গ কাব্যে; কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার 'সঞ্জীবনী' কাগজ পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিতে তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।' স্বভাবতই এযুগে হাস্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ব্যঙ্গ ও আঘাত প্রবণতার

পথেই হেঁটেছেন। এমনকি কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছেন নিজরুচির বাইরে গিয়ে। হিন্দুয়ানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে আগ্রহের আতিশয্য অন্ধগোঁড়ামি, বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব এব পান্ডিত্যপ্রকাশের ভান রবীন্দ্রনাথকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। বিশেষ করে শশধর তর্কচূড়ামণি এব চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নব্যহিন্দুর ধর্ম আন্দোলন সেদিন কবিকে বাধ্য করেছিল বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপে তাঁদের প্রতিহত করতে। 'কড়ি ও কোমল'-এ, 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কবিতায় 'হাস্যকৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে', 'বালক' 'ভারতী' 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি তীব্র ব্যাঙ্গের যুগই রচনা করেছেন।

উৎকল্পনা এখানে এসেছে আঘাত-বিদ্রূপের রূপে, যেমন হিং টিং ছট (সোনার তরী) কবিতাটি। প্রত্নতত্ত্ব (১২৯৮ সন) প্রবন্ধের গদ্যরূপে যে আঘাত কবি সমকালীন বিষয়কে করেছেন, ১২৯৯-এ লেখা উক্ত কবিতাটি তারই পদ্যরূপ মাত্র। এ কবিতায় রাজা হবুচন্দ্রের স্বপ্নদর্শন একটি উদ্ভট হাস্যকর উদ্ভাবনা। কিন্তু তার আড়ালে জগৎ-বিখ্যাত অমার 'ধর্মপ্রাণ' জাতির পরমত অসহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির ঊনতার ওপর স্পষ্ট বিদ্রূপ। গৌড়ীয় সাধু হিং টিং ছট-এর ব্যাখ্যায় বলেছে—

ত্র্যাম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি।
আর্ণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ীশক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে—হিং টিং ছট"।

এবং এই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই তৎকালীন পণ্ডিতদের অর্থহীন বাক্‌সর্বস্ব ভণ্ডামির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্গাত্মক আঘাত।

তবে এই ধরনের ব্যাঙ্গবিদ্রূপ কবির স্বক্ষেত্র ছিল না, ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ আর তাঁর চারিত্রিক কমনীয়তাও যেন এখানে আবৃত হয়েছিল। যদিও এ আসরে অবতীর্ণ রবীন্দ্রনাথ প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই। তাই ১২৯৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ব্যাঙ্গবিদ্রূপের বিরাট মুখব্যাদানের মধ্যেই কবি কখনো আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন কৌতুকের মধ্যে। শ্রাবণের পত্র (মানসী), ছিন্নপত্রের পত্রালাপ 'হাস্যকৌতুক'-এ ব্যাঙ্গশ্লেষের তীক্ষ্ণ কশাঘাতের মধ্যেও কয়েকটি নাটিকায় কবি বিশুদ্ধ আমোদ পরিবেশন করেছেন। একসময় তাঁর মনে হয়েছিল 'সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।" ক্রমশ নিষ্ঠুর আঘাত ও শ্লেষ বিদ্রূপ থেকে বিমুক্ত কৌতুকহাস্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন হল 'গোড়ায় গলদ' (১২৯১)। পরে এই মার্জিত সংস্করণ 'শেষরক্ষা' (১৩৩৫)। আর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩) ও 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২), প্রহাসিনী (১৩৪৫) গল্পস্বল্প (১৩৪৭) ইত্যাদি রচনায় কৌতুকহাস্যই মুখ্য ফলপরিণাম রচনা করেছে। কিন্তু জীবনের শেষ দশকের হাস্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধিকে খেলিয়ে 'খ্যাপামি' করবার, ৭৬

বছরের প্রবীন কবি তখন কৈশোরকে চাপল্যে উচ্ছলিত। আর এর পাশাপাশি রয়েছে মহান স্রষ্টার কল্পনা ও শৈল্পিক চাতুর্য, কবিমন আবার চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী, বারবার এক স্থান থেকে অন্য কোথা অন্য কোনোখানে তার বিরামহীন যাত্রা। 'খাপছাড়া' ও 'সে' রচনাকালে রবীন্দ্রচিত্ত চিত্ররচনায় উৎসুক। সাদা পৃষ্ঠায় খেয়ালী আঁচড় টানায় অথবা লেখাকে কাটাকুটি করে কোনো বিশেষ রূপদান করার খেয়ালী মন থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির সৃষ্টি। বস্তুত, বিধিবদ্ধ শিক্ষা থেকে দূরে অনুশীলনহীন আঙুলের সৃষ্টি বলেই আঙ্গিক ও শৈলীর দিক থেকে দুঃসাহসিকতায় আঁকা বিচিত্র রহস্যময়তার প্রকাশ এই মৌলিক ছবিগুলির ভিন্ন এক আকর্ষণও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবির যুগ তাঁর শেষ আধার বছরের ভাষিক সৃষ্টি—কাব্য-গান-নাটক-গল্প-উপন্যাস সবকিছুকেই বহিরঙ্গ যুগপৎ অন্তরঙ্গে তা অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা কোনো গড়ে-তোলা সামগ্রী নয়, হয়ে-ওঠা জিনিস। হয়তো তা খেয়াল কিন্তু অসংলগ্ন নয়; রেখাঙ্কনের বৈজড়ানিক নিষ্ঠা সেখানেও একভাবে কাজ করেছে। রেখা নিয়ে এই সময়ে কবির এই খেলা-ই তাঁকে 'খাপছাড়া' কিংবা 'সে'-র খেয়ালী লেখায় প্রবৃত্ত করেছিল। 'সে' গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—"একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি.....দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়, সেই লেকাটি।" তখন রেখার খেলা থামিয়ে রেখে কবি উদ্ভট চরিত্রের সেই লোকটার গান শুনতে বসলেন। অর্থাৎ এটাই স্পষ্ট হল যে, রেখার খেয়াল খেলাই রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে লেখার খেয়াল খেলায় নামিয়েছে। তাছাড়া, তাঁর ছবির শরীরে সনাতনী রীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ রয়েছে, সে বিদ্রোহই কবিকে বহু-অনুশীলিত উপন্যাস-কাব্য-নাটক-প্রবন্ধের পরিচিত সরণি থেকে খাপছাড়া উদ্ভটের রাজ্যে উত্তীর্ণ করেছে। এই খেয়ালের সঙ্গে কবিমনের প্রবল কৌতুক হাস্যপ্রবণতা, স্বভাবের উদারতা ও কোমলতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিস্ময়কর কল্পনাশক্তি যুক্ত হয়ে উৎকেন্দ্রিকতার প্রসন্ন হাস্যের রূপ নিল 'সে' এবং খাপছাড়া'তে। এর সঙ্গেযুক্ত হয়েছে কবির সমকালীন বিজ্ঞানচর্চা—রবীন্দ্রনাথ তখন পড়ছেন আইনস্টাইন, জীনস্, এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞান-ভিত্তিক 'বিশ্বপরিচয়' এই একই বছরে প্রকাশিত হল সে। যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো বলেই দেশে-বিদেশে যারা এই ধরনের অসম্ভব কল্পকথা লিখেছেন—Edward Lear, Raspe, h.G. Wells, Carroll কিংবা এদেশে ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়, কিংবা রাজশেখর বসু—সকলেই বিজ্ঞানীমনের অধিকারী ছিলেন। এইসূত্রেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা, চিত্রচর্চা এবং 'খাপছাড়া' ও 'সে' কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একই মানসসূত্রে এরা পরস্পর গ্রথিত।

শুধু এই বই দুখানি সহজ জন্মসূত্রে বাঁধা নয়—দুটি বইয়ের উদ্দেশ্যও এক। কী সেই উদ্দেশ্য? 'একেবারে যা-ইচ্ছে তাই, মাথা নেই, মুন্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই এমন একটা কিছু।" ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায় তার রূপ—শরতের আকাশ হালকা মেঘ যেমন কখনো পালতোলা নৌকা, কখনো শুঁড়তোলা হাতি, কখনো রূপকথার দৈত্য। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সারাদিনের গুরুগম্ভীর বাঁধা নিয়মের সৃষ্টির পর সন্ধ্যার ঘুমে মুক্তি আর চিন্তার পারম্পর্যহীন স্বপ্নের জাল বুনে চলেন—তাঁর সেই স্বপ্নগুলোর মতো দায়হীন ভারহীন কিছু গড়ে তোলা। 'সে'র উৎসর্গে তো বলাই হয়েছে—

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘকালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি,
রয়েছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে

ছবির খেয়ালে রাশি রাশি
মিশেছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেব পিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গনতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে—

এখানে যে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছে গভীর সুরে, তারই লঘু প্রতিধ্বনি যেন 'খাপছাড়া'র উৎসর্গে—চতুর্মুখ ব্রহ্মার তিনটি মুখে দর্শন, বেদ এবং কবিতার অবস্থান; আর চতুর্থমুখে—

নিশ্চয় জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগ্‌লামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।

অর্থাৎ 'সে'-তে ব্রহ্মার খেয়ালের স্বপ্ন আর 'খাপছাড়া'য় তাঁর পাগলামির অট্টহাসি—একদিক থেকে দুই-ই এক—অবসরের আনন্দে খেয়ালখুশি স্বপ্নজাল বোনায় এদের সৃষ্টি।

'খাপছাড়া'র কবিতাগুলির বহিরঙ্গে যেমন শিশুদের জন্য কৌতুক আর অন্তরঙ্গে বড়োদের জন্য রূপক; তেমনই 'সে' যেন বড়োদের দৃষ্টি দিয়ে ছোটদের মনের রহস্য বোঝবার চেষ্টা; ছোটদের গল্প কী হতে পারে তাই নিয়ে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষ, নির্মাণ-বিনির্মাণ, প্রসঙ্গত আধুনিক সাহিত্যে আর একালের মানসিকতাকে কিছু কিছু নির্মল কৌতুকের আঘাত দেওয়া, হাস্যরসের স্বরূপ-সন্ধান আর সবশেষে সুকুমারআর পুপে দিদিকে নিয়ে একটি গভীর গল্পের ব্যঞ্জনা—জীবনের সমস্ত হাসিই যে অশ্রুর বৃন্তে মুকুলিত সেই গূঢ় সত্যকে দ্যোতিত করা।

এই বইটিতে গল্প গড়বার কাজে ভুমিকা তিনজনের। লেখক আছেন, ন'বছরের নাতনি পুপে আছে, আর আছে 'সে'। রাজপুত্র নয়, সওদাগরপুত্র নয়, কোটালপুত্র নয়—একেবারে কাছের রক্তমাংসের মানুষ—খিদে পেলে যে 'ফরমাস করে মুড়োর ঘন্ট, লাউ-চিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি, বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুছে খায়।' বর্ষার দিনে সারা গায়ে জল-কাদা মেখে ঘরে ঢুকেই বিকট বেসুরো গলায় গান ধরে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভবান্ত হবে ভবে।

এই 'সে'-কে নায়ক করেই বেশির ভাগ গল্প—অন্য গল্পও দু-একটি আছে। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে একভাবে কিন্তু গল্পের নায়কের প্রচলতি চেহারাটা ভেঙে দিচ্ছেন। লেখক একথাও বলে নিয়েছেন যে, 'সে' আসলে বাস্তব মানুষ, সুপুরুষ, সুগম্ভীর। 'রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা।

ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মসকরায় ওকে জখম করতেপারে না। এইরকম একজন আপাদমস্তক বাস্তব মানুষকে এরকম উদ্ভট গল্পের নায়ক করা হয়েছে কেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মান হানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর সঙ্গে ওর স্বভাবের মিল হয়ে যায়।'

অতএব শুরু হল ন' বছরের একটি মেয়ের জন্য গল্প তৈরির কাজে দুটি বয়স্ক পুরুষের সরস আলোচনা, বিচার আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা। প্রথমেই লেখক তৈরি করলেন হুঁ হাঁউ দ্বীপের সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক রসিকতা— যেখানে নির্বাক পণ্ডিতেরা হৃদযন্ত্রকে বৈকল্য থেকে বাঁচাবার তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, আর ঘাসের থেকে সবুজ সার নিষ্কাশিত করে তারই নস্যি মুঠো মুঠো নাকের ভেতরে ঠেসে দিতে থাকে। দেখা গেল এ গল্প তেমন জমল না— কাহিনীটা পুপোদিদির একেবারেই পছন্দ হয়নি। কিন্তু গল্প-শেষে সিদ্ধান্তটি লেখকের মনের কথা— 'আমি ভাবছি, হুঁ হাঁউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপ বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছিনে।

দ্বিতীয় গল্প—'শিবাশোধন সমিতি'র রিপোর্ট। হৌ হৌ নামের একটি উচ্চাভিলাষী শেয়াল-এ গল্পের নায়ক— সে আত্মিক উন্নতির জন্য মানুষ হতে চেয়েছিল। এই মহতী লক্ষ্যে প্রথমেই নাম-বদল করতে হয়, সুতরাং 'হৌ হৌ' হল শিবুরাম—পছন্দ না হলেও শেয়ালকে তা মেনে নিতে হল। তারপর এল ল্যাজ কাটবার পালা—শেয়ালের মুখ গেল শুকিয়ে। ঐ ল্যাজের জন্যেই তো 'সাধারণ শেয়ালেরা ওর নাম দিয়েছিল ''খাসা লেজুড়ি'' আর যারা 'শেয়ালি সংস্কৃত' জানত তারা বলত ''সুলোম-লাঙ্গুলী''- 'মানুষ' হওয়ার আশায় সেই 'প্রিয়' ল্যাজও তাকে কেটে ফেলতে হবে। এরপরেও অপেক্ষা করে থাকে আর এক নির্মম সত্য—গায়ের লোম ছেঁটে ফেলতে হবে, তবেই না মানুষের মধ্যে গণ্য হবে? সেই রোঁয়া চাঁছার নিদারুণ পর্ব এবং পরিণামে মোহমুক্ত শেয়ালের মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বেড়ানো

ওরে ল্যাজ, হারা ল্যাজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া।

কিন্তু এ গল্প জমল না। কেননা, ছোটদের গল্পে তত্ত্ব আর বুদ্ধির চাতুর্য খাটে না (লক্ষণীয়, শেয়ালের মানুষ হবার বাসনায় এ-গল্পে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ব্রিটিশ অভিমুখিতার ছবি আছে)। 'সে' লেখককে বলেছে, 'বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। ....ল্যাজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল দেখতে পাওনি বুঝি?'

এবার তাই 'সে'-র আবির্ভাব গল্প বলার আসরে, সে শোনালো 'গেছো বাবা'র উপাখ্যান। যে দেবতা বানরের রূপ ধরে চলতো কিংবা কয়েৎবেলের গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ান, তাঁর 'শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে চক্ষু বন্ধ' করবার জন্য গোবরা-উধো-পঞ্চুর ব্যাকুল আর্তি। কিন্তু—

'ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়'।

'সে'-এর আখ্যানমালায় এরপর একটির পর একটি গল্প রচনার চেষ্টা। তাতে 'সে'-এর মেয়ে দেখা আর বিয়ের কাহিনী আছে, বাঘেরা যে আসলে কত আন্তরিক, রসিক আর 'হাসিয়ে' সেইটে বোঝাবার জন্য পুপোদিদির সঙ্গে বিশদ আলোচনা আছে, গায়ের কালো দাগ ওঠাবার জন্য পটুর কাছে বাঘের 'গ্লিসারিন সোপ' প্রার্থনা আছে, বটুরাম ন্যাড়ার পাল্লায় পড়ে লোভী বাঘের দুর্গতির বিবরণ আছে। শিশুচিত্তের অকৃত্রিম আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে পড়েছে ৭ নম্বর সরস গল্পটিতে—যেখানে রয়েছে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে 'সে'-র গা হারানোর কাহিনী, তারপর গাঁজাখোর পাতু খুড়োর শরীরে তার অনধিকার প্রবেশ। শিশু মনস্তত্ত্বের অপূর্ব প্রকাশ আছে বাঘের গল্পে কিংবা খরগোশের পুপে-হরণ কাহিনীতে। গা-হারানোর কাহিনী যেমন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরুধরের কাহিনীকে

মনে করিয়ে দেয়, 'সে'-র মাথায় বানরের মগজের কাহিনী ভিন্নতর লক্ষ্যেই চালিত হয়। ঘন্টাকর্ণের দুকানে বাঁধা ঘন্টার শব্দ শুনতে শুনতে খরগোসের পিঠে চেপে পুপুর চাঁদের দেশে যাত্রায় কাহিনীবিন্যাসের অপূর্বতা বিশেষরূপ লক্ষণীয়। এখানে দাদু-নাতনির কথোপকথন এই রকম

'আচ্ছা বলো দেখি, খরগোশ কী করে আমাকে পিঠে করে নিলে।

নিশ্চয় তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমুলে কি মানুষ হাল্‌কা হয়ে যায়?

হয় বই কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড়োনি?

হাঁ উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোশ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলাব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙদৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছি ছি ছি। শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নাই।—ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথে ব্যাঙ্গমা দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি কি?

হ্যাঁ, হয়েছিল বই কী।

কী রকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বললে, পুপে দিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোশ এমন দৌড় মারল যে ব্যঙ্গমা দাদা পারল না তাকে ধরতে।''

কিংবা পরিবেশ-নির্মাণে খেয়ালি নৈপুণ্যের প্রমাণ ৪ নম্বর গল্পে—

''গাড়িতে চড়ে বসলুম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরধারে আশশেওড়া ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশেয়ালী উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাক, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িশুদ্ধ গিয়ে পড়ল এক গলা জলের মধ্যে। এদিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আর পাবিনে।.....এদিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী করে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাক প্যাক করে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম পাচ্ছে।''

আরো অনেক ধরনের গল্প এখানে আছে, স্মৃতিরত্নমশাই-এর মনুমেন্ট-লেহনের মতো উৎকল্পনা আছে, মাস্টারমশাইয়ের আখ্যান আছে, তাসমানিয়ার উৎকট ভোজের বিকট বিবরণ আছে। কিন্তু 'সুকুমার'-র আগমনে শেষপর্যন্ত 'সে' শুধু শিশুচিত্তরঞ্জিনী গল্পের বই না হয়ে জীবনের গল্প হয়ে উঠল। পুপেদিদি আর সুকুমারের গল্প শৈশব থেকে পাড়ি দিল বয়ঃসন্ধির বর্ণময় আকাশে। জীবনের গল্প তো এইরকমই হয়। আনন্দ কৌতুক আর খেলা দিয়ে তার শৈশব উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে, তারপর ক্রমশ বয়স পেরিয়ে যেতে থাকে বয়সের এক-একটা মাঠ, দিনের প্রথম নরম আলো ক্রমস কড়া রোদ হয়ে ওঠে, ফুল ঝরতে থাকে, প্রজাপতির কী সুখে ঐ ডানা-দুটির মেলে দেওয়ায়

ক্রমশ জমে বিষাদ, ধুলো ওড়ে, বেদনা গাঢ় হয়। "তারও পর সন্ধ্যার ছায়া নামলে আকাশে সেই চিরন্তনের সংবাদ—সেই দূর-দূরান্তের তারাদের ভিড়, রূপকথার রাজকুমার সুকুমার—যে শালগাছ হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে মর্মর তুলতে চেয়েছিল, সে নক্ষত্রলোকের নীরবতার হারিয়ে যা। তারপরে তো আর গল্প নেই। (কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

২.৩ 'সে' গ্রন্থটি উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ ঃ

'সে' গ্রন্থটি উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ কী—এই জিজ্ঞাসার গল্পময় ব্যাখ্যা সাধারণত হাস্যরসের চারটি প্রকারভেদ আমরা করে নিয়েছি Humour, Satire, Wit এবং fun। হাসি দিয়ে অপূর্ব করুণরস ও মর্মান্তিক দুঃখের আকস্মিক দ্যোতিনা শ্রেষ্ঠ Humour, রচয়িতার লক্ষ্য। জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি, একধরনের উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সঙ্গে আমোদপ্রিয়তার এক মিশ্র অনুভূতি হিউমার-এর বৈশিষ্ট্য। মৃদু এবং অনুচ্চ এই হাসির গভীরে বহমান বেদনার স্রোত রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন— এ যেন বাহিরে ঘরে হাসির ছটা/ভিতরে বহে চোখে জল'। Wit-এর আবেদন বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্কে—উইট-এর জগৎ সজ্ঞান, সচেতন ও মননশীল, এখানে পান্ডিত্যের বিকাশ, উইট-এর দীপ্তি তীব্র, তীক্ষ্ণ, বিপরীতধর্মী বাক্যের ওপর নির্ভরশীল। অনুপ্রাস, শ্লেষ, Antithesis, Paradox, Oxymoron ইত্যাদি অলংকার উইট এলখেকের শানিত অস্ত্র। Satire-এর হাসি অন্যকে আঘাতের মধ্যেই জন্ম নেয়। ব্যক্তি বা শ্রেণী-মানুষের দুর্বলতার ওপর, সমাজ বা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর সাসির কশাঘাত হেনে সংস্কারমানসে তথা সংশোধন প্রবলণতায় Satire এর উদ্ভব। এই ব্যাঙ্গের মধ্যে উপহাসের জ্বালা রয়েছে, তার আঘাতে 'মুখের হাসি বেদনায় বিকৃত হইয়া পড়ে।' আর 'কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি', কৌতুক হাসি বা Fun-এর মধ্যে উচ্ছ্বসিত আমোদ রয়েছে। "Humour-এর মতো কৌতুকের আড়ালে কোন গভীর জীবনানুভূতি নেই; Satire-এর মতো হাসির কশাঘাতে সংস্কারমানসের একাগ্রতাও নেই, wit-এর বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত ও বাক্‌প্রসূত হাসি কৌতুকের হাসি নয়। Fun অনেকাংশে 'An art to drown the outery of the heart." যদিও অল্পবিস্তর 'পীড়ন' কৌতুকের মধ্যেও বিদ্যমান। অর্থাৎ অশ্রু-আঘাত দাহমুক্ত প্রসন্নমনের বিশুদ্ধ হাস্যসৃষ্টিতে এই চারপ্রকার হাসিই শেষপর্যন্ত একভাবে অপারগ।

কিন্তু অশ্রু-আঘাত-দাহবিমক্ত বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'তাকে একটুখানি হাসিয়ে দেই গে—বিশুদ্ধ হাসি, তাতে ভেজাল নেই। 'শুধু' 'বুদ্ধির ভেজাল' নয়, সেখানে 'ব্যঙ্গ' 'চোখের জল' 'প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামো' ও থাকবে না। এ এক অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হাসি delightful relief কিবা divine light আবালবৃদ্ধ সকলেই এই বিশুদ্ধ হাসির অংশীদার। বস্তুত, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক ভাঙাচোরা অপমান ব্যর্থতা হতাশার পরেও মানবমনের গভীরে থাকে একটি প্রসন্ন উচ্ছল লঘু প্রকৃতি। এই মন ক্ষণে ক্ষণে চায় যাবতীয় Seriousness থেকে মুক্তি পেতে। জীবনে যত জটিলতায় গ্রন্থি পড়ে, তত সেই খেয়ালি মনটা নানাভাবে সহজাত সৌন্দর্যের মধ্যে ফুটে উঠতে চায়। এই নিয়মেই উনিশ শতকে যন্ত্রপীড়িত ইংল্যান্ডের কঠিন রূঢ় বাস্তব পরিবেশে Alice's Adventures in Wanderland-এর 'delightful relief of the absurd' সৃষ্টি সম্ভার হয়েছে। 'ধ্বংস' (গল্পস্বল্প) রচনায় রবীন্দ্রনাথ বললেন—

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কল বল সম্বল সিভিলাইজেশনের

তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।

'সিধা' করে দেবার জন্যই অসম্ভবের ব্যাকরণ তিনি রচনা করলেন 'খাপছাড়া' 'সে' এবং 'গল্পসল্প'-এ, তখন 'কলম আমার বেরিয়ে এলো বহুরূপীর বেশে।' সত্তরোর্ধ কবি উদ্ভট কল্পনায় সরব হয়ে উঠলেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা রাজশেখর বসুর রচনায় এইধরনের উদ্ভট কল্পনার একটা বড় জায়গা রয়েছে।

অর্থাৎ প্রসন্ন মনের এই অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করতে গিয়ে স্রষ্টারা আশ্রয় নিলেন কল্পনার বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির। কল্পনার সেই শক্তির সাহায্যে তাঁরা নানারকম উদ্ভট-আজগুবি খাপছাড়া চরিত্র-ঘটনা-কাহিনী নির্মাণ করে আমাদের 'বিশ্বাস-বিচারবুদ্ধি-কার্যকারণ সম্পর্ক ও সঙ্গতিবোধকে উলটপাক খাইয়ে দিলেন।' আর পাঠক স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সাহিত্যে যখন এই বিশুদ্ধ হাসি রূপ লাভ করেছে, পাশ্চাত্যে তাকে Bizarre, Grotesque, Nonsense Literature বলে চিহ্নিত করেছে, বাংলা সাহিত্যে একে 'উৎকল্পনার হাস্যরস' অভিধায় গ্রহণ করা হয়েছে। (প্রসঙ্গ : উৎকল্পনার হাস্যরস : ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী)

রবীন্দ্রনাথ 'উৎকল্পনা' শব্দটি ব্যবহার করেননি, বলেছেন 'অসম্ভব কল্পনার সৃষ্টি'। এবং দেখিয়েছেন, বিশ্বাস্য বাস্তব পৃথিবীর পথপ্রান্তর দেশকাল ইতিহাস ভূগোল আশ্রয় করেও কবিকল্পনা যখন বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে অবিশ্বাসের কল্পনার জগতে সফল যাত্রা করে এবং যখন লেখকের এই অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তোলবার প্রয়াস দেখে পাঠক মজা পেতে পারেন তখনই অসম্ভব কল্পনার হাস্যরসের সার্থক সৃষ্টি। উৎকল্পনার হাস্যরসের সাধারণ লক্ষণ এই-ই। এখন দেখা যাক, উৎকল্পনার হাসির স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তাঁর 'সে' রচনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৪ অধ্যায় যুক্ত 'সে'-র ১ অধ্যায়ে 'যা সৃষ্টিছাড়া বড়োবাজারে, বহুবাজারে এমনকি নিমতলাতেও যার গতি নেই'—তা নিয়ে গল্প তৈরির প্রস্তুতির কথা। ২ থেকে ৯ অধ্যায় পর্যন্ত 'সে' এবং 'আমি' পরম উৎসাহে পুপুদিকে অসম্ভব কল্পনার গল্প বলেছে। তাদের উদ্দেশ্য এসবের মধ্যে দিয়ে পুপুদিকে হাসিয়ে তার মন জয় করা। আর লেখকের উদ্দেশ্য সেই মুহূর্তটির নির্মাণ যখন উৎকল্পনার হাস্যরস সৃষ্টি হয়। প্রতিটি গল্প-উপান্তে পুপুদির চোখে জল, ক্রোধগম্ভীর কিংবা ভাবুক পুপুদির এই বিচিত্র অভিব্যক্তিই প্রমাণ করে যে নির্ভেজাল প্রসন্ন হাসি তার মুখে আনা কঠিন ব্যাপার। ব্যর্থ হয়ে একসময় 'সে' বলেছে, 'যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়।' কখনও 'আমি'ই বলতে বাধ্য হয়েছে 'এ-কাহিনীটা পুপুদির কাছে একটুও পছন্দসই হয়নি।' প্রকৃতপক্ষে, অবিশ্বাস থেকে মজা আহরণের দুরূহ কৌশলের মধ্যেই অসম্ভব কল্পনার হাস্যসৃষ্টির শিল্পচাতুর্য নিহিত।

প্রথম গল্পে হুঁ হাউ দ্বীপের মানুষের নস্যি নিয়ে পেট ভরানোর অসম্ভব গল্প পুপু বিশ্বাস করল না—'এ কখনো হয়? নস্যি নিয়ে পেট ভরে?' আসলে এখানে অবিশ্বাস উৎপাদনের উপকরণটিই ভুল নির্বাচিত হয়েছে। কেননা 'নস্যি' বস্তুটাকে নিয়ে কল্পনার জগতে খুব বেশিদূর এগোনো যায় না। এখানে হাসবার মতো মজা পুপুদি এবং পাঠক কেউই খুঁজে পায়নি। আর রবীন্দ্রনাথ দেখালেন অবিশ্বাস্য হলেই অসম্ভবের গল্প হয় না।

দ্বিতীয় গল্পে শেয়ালের মানুষ হবার লক্ষ্যে লেজ-কর্তন এবং অসম্ভব কল্পনা সত্ত্বেও এ গল্প শেষপর্যন্ত ব্যঙ্গ ও কারুণ্যে ভরে উঠল। 'প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি' এ কাহিনীর সর্বাঙ্গে। ল্যাজকাটা শেয়ালের কান্না শুনে পুপুদির চোখও জলে ভরে গিয়েছিল—এখানে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, অসম্ভব কল্পনা হলেই অসম্ভবের গল্প হয় না, এ-জগতের সচেতন বুদ্ধিকে সজাগ রেখে অসম্ভবের গল্প-কথন দুরূহসাধ্য।

অতএব, পুপুদিকে বিশুদ্ধ হাসি হাসাবার অভিপ্রায়ে 'সে' নিজেই তৃতীয় গল্প তৈরি করল। গেছোবাবার অদ্ভুত কল্পনা, আরো অদ্ভুত তার ভাবভঙ্গি। কিন্তু এবারও হার মানতে হলো। এবার পুপুদিদি গেছোবাবাকে এমন বিশ্বাস করে বসল যে তার সন্ধান করতে বুঝি স্বয়ং 'সে'-কেই পাঠায়। 'আমি' হেসে 'সে' কে বললে—'ওহে কমবুদ্ধি হাসাতে পারলে?' 'সে' ব্যথাহত ভাবে বলল, 'না, যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে, তাকে হাসানো সোজা নয়।'

এইভাবে এই গল্পত্রয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন, এলোমেলো অসম্ভব কথা হলেই উৎকল্পনার হাস্যরসের গল্প জমে না। উৎকল্পনার নিজস্ব একটি পথ আছে চলবার, বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে অবিশ্বাসের দিকে তার অভিমুখ। কিন্তু এই তিনটি গল্পে অসম্ভবের রেখা পেরিয়ে সীমার জগতের বিশ্বাস-অভিজ্ঞতা-বুদ্ধি-অনুভূতির মধ্যে আবদ্ধতা চোখে পড়ে। ফলে বিশুদ্ধ হাসির পরিবর্তে কখনো পুপুর 'চোখে জল, ব্যঙ্গ-আঘাতে ব্যথা, অসম্ভবকে বিশ্বাস।' ৪ গল্পে এসে রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব কল্পনার যথার্থ স্বরূপসন্ধানের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কিনা'—চতুর্থ গল্পটি সেই পরীক্ষাজাত। এখানে 'সে' ও 'আমি'র কনে দেখতে যাওয়া ও 'সে'র বিয়ের গল্প। খেঁকশিয়ালের ডাকে চমকে পুত্তুলালের গাড়িসমেত পুকুরে পড়া, ব্যাঙের নাচে পিঠের জমানো বাত সেরে যাওয়া, এসবের মধ্যে প্রাপ্ত মজার চরম 'সে'-র নতুন বউ ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে বরকে নিয়ে বাজারে মানকচু কিনতে যাওয়া। এ-গল্প শুনে পুপুদি খুব খুশি। কনে এখানেও বরকে জব্দ করেছে, কিন্তু তার ভঙ্গি বিদ্রূপাত্মক নয়—এ-গল্পের গতি অবিশ্বাসের দিকে, তাতেই ঠাট্টার আঘাতটুকু মুছে গেছে।

প্রাথমিক তিনবার ব্যর্থতার পর চতুর্থ গল্পে পুপুদিকে হাসাতে সক্ষম হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিশ্বাস না করিয়ে খুশি করতে পারার মধ্যেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কৌশল নিহিত। তবু রবীন্দ্রনাথ একে পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন—'সে'-কে নিজেরই বিরুদ্ধে সমালোচকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে। 'সে' সমালোচনা করল—চতুর্থ গল্প অসম্ভব গল্প হয়নি, হয়েছে যা-তা। কারণ অসম্ভব গল্পেরও তো একটা বাঁধুনি থাকবে, অসংলগ্ন অসম্ভব গল্প তো যে সে বানাতে পারে। এই সমালোচনা শুনে 'আমি' 'সে'-কে একটি উদাহরণ দিতে বললেন। তখন 'সে' যথার্থ অসম্ভব গল্পের নমুনাস্বরূপ তাসমানিয়াতে তাস খেলার নিমন্ত্রণের গল্প বলল। কিন্তু শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরাঙ্কুনা, পামকুনি দেবী, কিষ্টিনাবুর, ঘেরিউনামু ইত্যাদি ব্যক্তি ও বস্তুর বিদ্‌ঘুটে নামের ওপর হোঁচট খেতে খেতে হাঁফিয়ে উঠে 'আমি' বলল 'থামো থামো', পাঠকের অবস্থাও তথৈবচ। এ-গল্পের দৃষ্টান্ত সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন 'সে' গল্পের চালের লঘুত্ব পরিহার করতে গিয়ে উৎকল্পনার স্বরূপটা ভুল করেছে। হার মেনে 'সে' অসম্ভব গল্পের স্বতন্ত্র একটা সংজ্ঞা উপস্থিত করল—'বিশ্বাস করবার অতীত যা, তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে চলতি ছেলে ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তাহলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি বলে রাখলুম।'

'সে'-র দেওয়া এই সংজ্ঞার চালচিত্রে আবার নির্মিত হল চারটি গল্প, পুপুদিকে 'সে' শোনালো ৬, ৭, ৮, ৯ অধ্যায়-ধৃত চারটি গল্প, কিন্তু পুপুদি তো হাসল না, বরং বিশ্বাস করবার অতীতকে বিশ্বাস করে বসে পুপুদির কখনও প্রশ্ন জাগল, কখনও বিশ্বাস করতে পুপুদির বিষম সন্দেহ জাগল। আবার পাতু গেঁজেলের সঙ্গে 'সে'-র গা বিনিময়ের অবিশ্বাস্য গল্প পুপুদি এতদূর বিশ্বাস করে বসল যে পরের দিন 'সে' কে মুখোমুখি দেখে তার মূর্ছা যাবার উপক্রম। চোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠে বলল 'যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি করে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না।' অষ্টম গল্পে 'সে'-র অনুরোধ তার গা ফিরিয়ে দিয়ে নবম গল্পে 'আমি' গুলিবিদ্ধ 'সে'-র মাথার খুলির মধ্যে বাঁদরের মগজ ঢুকিয়ে দিয়ে বিশ্বাসের অতীতকে বিশ্বাস্য করবার চরম গল্প ফাঁদলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'সে'-ই বাধা দিয়ে মাঝপথে গল্প থামিয়ে দিয়েছে। ১০ অধ্যায় থেকে অসম্ভবের গল্প আর জমেনি। 'সে' তার মগজ-বদলের পরদিন থেকে গল্প

জোগানোর কাজে ইস্তফা দিয়েছে। ১০ থেকে ১৪ অধ্যায় পর্যন্ত গল্পগুলি পুপুদির শৈশবের স্মৃতিকথা। এইসূত্রে মাস্টারমশাই কিংবা সুকুমারের কথা এসেছে। সুকুমার ও পুপুদির গোপন হৃদয় বিনিময় অপ্রাপ্তির বেদনায় 'সে' গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটেছে।

অতএব 'সে'-র সংজ্ঞা নয়, বিশ্বাস না করিয়ে মজা লাগাতে পারার মধ্যেই অসম্ভব গল্পের শিল্পচাতুর্য নিহিত— এই প্রতিপাদ্যই গৃহীত হল। অসম্ভব গল্পের চাল সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক সতর্কতার পথেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কলাকৌশল নিহিত। এইভাবে বিচিত্র গল্প আশ্রয় করে 'নেতি নেতি' করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎকল্পনার হাস্যরসের স্বরূপে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

২.৪ "আলাপে, গল্পে, রসিকতায় 'সে' বড়োদের বই" ঃ

শিশুসাহিত্যের অনেক লেখকের মধ্যেই এইরকম একটা ধারণা প্রচল আছে যে, ছোটরা অবোধ ও নিঃসাড়, ফলে 'করুণা করে' তাঁরা যা ছোটদের জন্য লিখে দেন তা-ই যথেষ্ট; চিন্তা-চেষ্টা-অনুশীলন-কল্পনা ও সংবেদনা-পরীক্ষানিরীক্ষা কোনোটাই সোনে প্রয়োজনীয় নয়। আর কখনো ছোটোদের জন্য লেখা ভারক্রান্ত হয়ে ওঠে উপদেশ-নীতিবচন-জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যে। এই দুটি মনোভাবই শিশুসাহিত্যের প্রতিকূল, কেননা ছোটরা অনেক সময়েই কিন্তু তেমন 'ছেলেমানুষ' নয়। রবীন্দ্রাথ বলেছিলেন নিজেই, 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য।' আর এইজন্যই সত্যকার শিশুসাহিত্য নিছক শিশুমনোরঞ্জিনী 'ঝুমঝুমি' নয়— যথার্থ সাহিত্যবোধের সঙ্গে তার কোনো প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই, তা কখনোই খণ্ডিত, অপূর্ণ বা অলীক নয়— সেখানে থাকতেই পারে 'পূর্ণ ও পরিণত জীবনের নানা স্পন্দন, বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তু ও রহস্য, মানবসত্তারই বিস্ময়কর উন্মীলন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিশুসাহিত্য যে কোনো অনর্থক, ছেলেভুলোনো 'বালসেবা' ব্যাপার ছিল না তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'ঘরের পড়া' (জীবনস্মৃতি)— "আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর রূপ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল চেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম, যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না— দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।'

তাই রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটদের জন্য লিখলেন, সবসময়েই তা জীবনের গভীর থেকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। 'বালক' পত্রিকার জন্য গল্প-কবিতা-উপন্যাস-গীতিনাট্য-হাস্যকৌতুকই হোক কিংবা আরো পরে 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ'-বইয়ের কবিতাগুলি আর জীবনের শেষ দশকে 'খাপছাড়া' 'গল্পস্বল্প' বা 'সে'—সবক্ষেত্রেই তাঁর এই মনোভাবেরই পরিচয় মেলে। তাছাড়া বিষয়বুদ্ধি-স্বার্থবোধ-মিথ্যাচার সংসারের এ-সব বীভৎস দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন, কিন্তু অরুচিকর ঠেকতো বলে তাদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি লড়াই শুরু হয়নি— শুধু বিরাগ আর অনীহাই প্রকাস করে এসেছেন এতকাল। কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে যেন মনে হল, শুধু এতটুকুতেই তাঁর দায়িত্ব ফুরোয় না। ফলে চারপাশের যাবতীয় অসঙ্গতিকে নির্মমভাবে আঘাত করলেন, সময়ের কালো হাত

প্রকট হয়ে উঠল তিনটি 'মহীয়ান আজগবি' রচনায়—সে, খাপছাড়া আর গল্পসল্প। অনেক রসিকতা, অনেক লক্ষ্যভেদী পরিহাস, অনেক প্রসঙ্গ অত্যন্ত বয়োপ্রাপ্ত ও উদ্দেশ্যময়। সেইসময়ে এই বইগুলো নিতান্ত শিশুসেব্য খুব মোলায়েম হওয়া সম্ভবত ছিল না, কেননা সমকালে তিনি যেসব ছবি আঁকছেন অকস্মাৎ দেখে মনে হয় তা ভৌতিক—এত গাঢ় রঙের ব্যবহার সেখানে। গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গ হয়ে উঠছে নির্মম ও রক্তাপ্লুত (স্মরনীয় মালঞ্চ কিংবা চার অধ্যায়), কবিতার চিত্রকল্পও হয়ে উঠছে ভীষণ, ভয়ানক; আর কিছুদিন পরেই লিখবেন 'সভ্যতার সংকট'—তাঁর শেষ অভিভাষণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ, পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্ব আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের নিশ্চিত পদপাত-আর্থ সামাজিক বিপর্যয়, বিধ্বস্ত মল্যবোধ বিকৃত সাহিত্যাদর্শ—এহেন 'বাস্তব' দেখে অভিমানাহত ক্ষুব্ধ কবির আপাত-দৃশ্য 'শিশুপাঠ্য' বইগুলোও যে অন্যরকম হবে, তা আর বিচিত্র কী।

'সে' লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথের হয়তো কখনো মনে হয়েছিল একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় জগৎকে আমাদের লোভের শিকারে পরিণত করছি—সেজন্যই হুঁহাউ দ্বীপের খ্যাপামির নেশায়-মাতা মানুষের কথা তিনি বলেছিলেন। এই কৌতুকে সমকালীন বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্পষ্ট। 'সূর্যের বেগনি পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন।' সোজা ভঙ্গিতে তিনি ঈষৎ বিদ্রূপপরায়ণও। 'ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপসে আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই।' এ দ্বীপের মানুষের কথাবলা নিষিদ্ধ এবং তারা চতুষ্পদী হবার সাধনায় ব্যস্ত। সে বলছে দাদামশায়ের এই কল্পবিজ্ঞান কল্পনাই, 'বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে।' গল্পকারের উত্তর, এই অবস্থায় যে মানুষ একদিন পৌঁছবে বিজ্ঞানীরা তার প্রমাণ দিয়েছে ত্রেতাযুগের হনুমানদের একাল পর্যন্ত বেঁচে-থাকার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রূপে আমরা বিদ্ধ হই। এ-দ্বীপে যে মানুষ বেঁচে নেই, হাঁচতে হাঁচতে সবাই মারা পড়েছে সে-কথা বলে বিজ্ঞানের নিষ্ফলতার দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ জয়যাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের খোঁচায় ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে চান। 'বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিমনি মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না?' এই 'কুৎসিত' শব্দটি বর্তমান বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজচরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার সাক্ষ্য দেয়।

আবার যখন ২ সংখ্যক কাহিনীতে বিজ্ঞান প্রশ্রয় পায় আর বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মাঝে মাঝে কৌতুকের খেলায় মাতেন (যেমন, ৯ সংখ্যক কাহিনীতে মগজ বদলের অসম্ভব গল্প সাম্প্রতিক বিজ্ঞানচর্চায় এ-ও হয়তো সম্ভব) তখন এই উদ্ভাবনে আমরা মজা পাই, বিজ্ঞানের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিতও হই, তবু ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিটি হারিয়ে যায় না। ১২ সংখ্যক কাহিনীতে বিজ্ঞান আবার জায়গা পেয়ে যায়। দাদামশায় এখানে নাতনির সঙ্গে আকাশের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন—আলোর কণিকা, আলোর প্রবাহ, রেডিয়াম, ইলেকট্রন আমাদের জগৎটাকে যে আরো বিস্ময়কর করে তুলছে তা নিয়ে ঠাট্টার সুর থাকলেও বিজ্ঞানকে এখানে একভাবে স্বীকৃতিই জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

সে-র কিছু কিছু রচনায় শিল্পসাহিত্য সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। এর কিছু আগে 'কল্লোল' ও 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর 'বাস্তবতা' সম্বন্ধে ধারণা বাংলা সাহিত্যজগতে একসময় বেশ উত্তপ্ত উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে তখন কলম ধরতে হয়েছিল। প্রবন্ধের পাশাপাশি 'শেষের কবিতা'য় তিনি সমকালীন সাহিত্য-শিল্প ও জীবনবোধকে একভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কল্লোলের কোলাহলের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ যেন 'সে' গ্রন্থে আমাদের বাঘের রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেখানে দেখা যায় 'আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে—যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য বলে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব, বাঁ

থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব, হালুম মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব—এমনকি বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব—এত ঔদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমনকি, এরা পশ্চিমপারের চাষিকৈবর্তদের খেতে চায় এতই এদের মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনেরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষি-কৈবর্ত খেগো, তাই নিয়ে মহা হানাহানি পড়েছে।' —দাদামশায়ের এই বক্তব্য পুপে নিশ্চয় একভাবে বুঝেছিল, আমরাও একভাবে বুঝে নিই। বাঘের চিত্রে রবীন্দ্রনাথ এখানে সমকালীন শিল্পসাহিত্যচিন্তা সম্বধেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। আধুনিক-প্রগতি-প্রচারক-যুক্তিবাতী-সর্বজীবে সম্মানবোধ পশ্চিমপার দলাদলি প্রাচীন এবং নব্যসম্প্রদায় শব্দগুলি সমকালীন সমাজের ছবি। রবীন্দ্রনাথের এই বক্রোক্তি তেকে তাঁর মনোভাবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাহিত্যশিল্পসৃষ্টিতে নিয়মের প্রয়োজনকে তিনি কখনো অস্বীকার করতেই পারেন কিন্তু উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেন না। হুজুগকে সাহিত্য বলতে তিনি রাজি নন। যে মাস্টারমশায়ের ছবি রবীন্দ্রনাথ এখানে এঁকেছেন তাকেই তো তিনি শিক্ষার জগতে বারে বারে খুঁজেছেন—যে শিক্ষক ছাত্রদের উপলক্ষ করে নিজেকে অজস্রভাবে ছড়িয়ে দেন। এইভাবে সমকালের সঙ্গে একটা যোগসূত্র কোনো-না কোনোভাবে গড়ে ওঠে।

বস্তুত, পরিণত বয়সে অসুর যুগ আর বেসুর সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে পীড়িত করেছিল। তাঁর কটাক্ষ সমকালের নানা রচনায়, যেমন 'প্রহাসিনী'র মাল্যতত্ত্বে

মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, ওটা কি আর চলে
সরস্বতীর গলে?
রিয়্যালিস্টিক প্রসাধন যা নব্য শাস্ত্রে পড়ি
সেটা গলায় দড়ি।

কখনো 'হালকা' ছড়ায় লিখেছেন—

মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলু থালু ভাষা ভাব এলোমেলো
ছন্দটা নির্ বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এতো নয় সোজা।
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।' (খাপছাড়া)

আর এই 'আধুনিক' কবিতাকে জাপানের হাতে তুলে দিতে কবির 'আগ্রহে'র মধ্যেই রয়েছে এইধরনের লেখাকে নস্যাৎ করে দেবার মনোভাব—

জাপানীরা আসে যদি
চিঁড়ে নিক, দই নিক
আধুনিক কবিদের
যত খুশি বই নিক।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার ভাষাকেও 'সে' গ্রন্থে নানাভাবে বিদ্রূপ করেছেন। অদ্ভুত-অত্তুত, ববকরণ-তৈতিলকরণ-বৈকুন্তযোগ, উনকুণ্ড পাড়ার চৌচাকলা গ্রাম ইত্যাদি শব্দনির্মাণে কিংবা হৈ হৈ সংঘে ছন্দের মেরুদণ্ড-ভাঙা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কী একভাবে ধরে দিতে চেয়েছিলেন সেদিনের কবিতার 'আধুনিকতা'র সত্যিকারের চেহারা—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা।
..... হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কীচ্
গড়গড় গড়গড়
হুড়্‌দুম দুদ্দাড়
ডান্ডা
ধপাৎ
ঠান্ডা
কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার—

করিতার এই 'কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারের পর একটি মাত্র কাব্যই লেখা যেতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ সিধান্ত নিয়েছেন, সে কাব্যের নাম 'বেসুর হিড়িম্বের দিগ্বিজয়'। আধুনিক কাল আর কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিরূপতার এমন বিস্তৃত যুগপৎ সরস পরিচয় অন্যত্র দুর্লভ।

এইভাবেই 'সে' পুপেকে শোনানো দাদামশায়ের কাহিনী হলেও তা নানা বিচিত্রভাবে স্পর্শ করে আছে সমকালের শিল্প-সাহিত্য-সমাজকে। সেখানে কন্যার চেহারা আর কন্যার পণের বৃত্তান্ত আর যা-ই হোক নিছক fantacy নয়। গেছোবাবার কাহিনীতে এযাবৎ লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ রবীন্দ্রনাথ করে আসছিলেন তারই রকমফের। শিয়ালের মানুষ-হওয়ার ইচ্ছা আর ডোরাকাটা বাঘের ধর্মপালনে আগ্রহ রূপকথার আদলে রূপক, যা আপাত-উদ্ভট হয়েও সমকালবর্তী। বুদ্ধিদীপ্ত রসোক্তিতে 'সে'র অসাধারণ কিছু পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যাক্—

- "মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃ সৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।"
- "দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গামা আমি কখনও ভাবিনি।" ঐ হাঙ্গামাগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের ওপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটছে চারদিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।"
- "পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে?

তারা বেঁচে থাকে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে।" স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যবস্তু কী।

বস্তুত, 'সে'-র কিছু লেখা 'সন্দেশ' 'রংমশাল' 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন এটি ছোটদের জন্য লেখা। নাতনি পুপে এই বইয়ে উঠে আসাতে সেই ধারণা আরো নিশ্চিত হয়েছিল। আর ছিল ছবির বিচিত্র জগৎ। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এ যেন ছদ্মবেশী শিশুসাহিত্য। সুকুমার আর পুপের হৃদয়বিনিময়ে উদ্ভট এ আখ্যানে ভিন্ন মাত্রা এলো তা-ই নয়, সমকালাতিশায়ী এর রূপ থেকে রূপকে পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথ কোনো দ্বিধা করেননি। তাই ছোটদের হাসির খোরাক জোগায় 'সে' আর বড়োদের

২.৫ রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং চিত্রিত 'সে'—কয়েকটি কথা ঃ

চিত্রকলা রবীন্দ্রসৃষ্টিসাধনার শেষ পর্যায়ের ফসল, প্রচলিত শিক্ষাকে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন—তাঁর ছবি 'নির্মিত' নয়, হয়ে-ওঠা জিনিস এবং মৌলিক। রবীন্দ্রনাথের ছবি অদৃষ্টপূর্ব, অপরিচিত; কিন্তু দর্শকের চোখে অপরিচয়জনিত বিস্ময় থাকলেও সে চোখ একে অস্বাভাবিক বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। রবীন্দ্রচিত্র ব্যক্তিগত, কিন্তু সহিতত্ব-গুণবর্জিত নয় বলে এ ছবি দর্শককে শিল্পীর অভিজ্ঞতার অংশীদার করে তোলে। নিজস্ব পথে শিল্পের এই মনোজ্ঞয়িতার নামই style, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যে ছবি তিনি একেছেন—তা সে ল্যান্ডস্কেপই হোক্ কিংবা মানুষের মুখ কিংবা জীবজন্তুর, তাতে কোথাও একটা কাঠিন্য-ভীষণতা-গাঢ় রঙের প্রয়োগ-প্রলেপের ব্যাপার আছে। বস্তুর প্রচলিত জ্যামিতিক সৌষম্যকে অস্বীকার করে তাকে নানাভাবে 'বিকৃত' করা হয়েছে এবং তথাকথিত 'বিকৃত' আপাত-উদ্ভট সেই ছবির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রমানসের এক বিশেষ মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, প্রকৃতি যে শুধু সুন্দর নয়, ভীষণ ভয়ংকর—এই সত্য রবীন্দ্র-চেতনায় প্রথমাবধি কাজ করলেও শেষজীবনে ক্রমশ তা' প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির করাল মূর্তিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখার এমন ক্ষমতা আগে ছিল না। 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'—একথা এই ভঙ্গিতে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন। সাহিত্যের নিসর্গবর্ণনাতেও তখন এই মনোভঙ্গির প্রচ্ছায়া—নির্মম প্রকৃতির ভয়-লাগানো রহস্যময়তা প্রতিফলিত হয়েছে এমন অনেক ল্যান্ডস্কেপে—"একদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনোখেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওত পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে ধাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এই-সব এঁকে চলেছি।" রবীন্দ্রনাথের নিজেরই এই স্বীকারোক্তি। তাঁর নিসর্গচিত্রগুলি যাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা বলতে পারেন—অরণ্যের ঘনত্বে ও জটিলতায়, রাত্রির গা-ছম্‌ছম্ নৈঃশব্দ্যে, রাঢ়ের হু হু করা প্রবল দুপুরের বিভীষিকায় সেইসব ছবিতে মানব-জীবননাট্যেরই আভাস।

কিংবা জীবজন্তুর ছবি, যা রবীন্দ্রনাথের চিত্রজগতে বেশ বড়ো একটা জায়গা জুড়ে রয়েছে—মনের হাতে আঁকা বলেই প্রায়শ কিছু না থেকেও এরা জীবন্ত। আকারের অনুকরণ নেই কিন্তু অঙ্গের মূল Mechanism ঠিক আছে। আলোচ্য ছবিগুলিতে দৈহিক পুঙ্খতা বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় টানটোনে এক-একটি জীবরূপের স্বভাবধর্ম ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ হিংস্র প্রাণীর বলিষ্ঠতা, দুর্বলের নির্জীব দৌর্বল্য, দ্রুতগামী জীবের তূর্ণ গতি, গতিহারার জড়তাময় কুণ্ঠিত মন্থরতা—এসবের জোরালো ব্যঞ্জনা; এসবের জোরালো ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের আঁকা-বাঘ-গাধা-শেয়াল-কুকুর-কচ্ছপ-কুমির দেখলেই ধরা পড়বে। বাঘের একাধিক ছবির মধ্যে সবচেয়ে নজরে পড়ে 'সে'-ভুক্ত গোটা কয়েক লাইনের টানে ফুটিয়ে তোলা ছবিটি। কাগজ-সার্কাস কিংবা ও চিড়িয়াখানারও নয়—একেবারে আরণ্যক জানোয়ার। জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘশিকারের একটি আশ্চর্য ভাষাচিত্র আছে 'ছেলেবেলা' নামক গ্রন্থে।

"হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ, যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রভয়ানক ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল দেখা নজর, এ যে ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ। অথচ তার ভার নেই যেন।.....কী সহজ সুন্দর চলনের বেগ।"

'সে' গ্রন্থের মধ্যে অনেকবার অনেক জীবজন্তুর কথা এসেছে, তাদের ছবি আঁকা হয়েছে। স্বচিত্রিত এই বইটিতে

দেখলাম, হিংস্রজাতের কাঁটাওয়ালা দাঁত-বের করা আমিষখোর ঘন্টাকর্ণের মতো জীব যেমন সেখানে ওৎ পেতে আছে, তেমনই আছে অদ্ভুত সব মুখ আর মুখোশের আদল। এখানে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমন যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ ছাড়িয়ে আরো দূর অতীতে, মানব-আবির্ভাব হীন পৃথিবীর আদিম অন্ধকারে ভ্রাম্যমান অজ্ঞাতকুলশীল অসম্পূর্ণ অতিকায় প্রাণীদের জগতে চলে গেছে—

"আচ্ছা দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও?
আমি যদি হঠাৎ বলে উঠলুম, 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে, তা হলে তুমি খুশি হতে।"

আসলে, সভ্যতার সেই সংকট-লগ্নে চারদিক নিষ্ঠুর আর রক্তাপ্লুত, রবীন্দ্র-মানস যখন বিচলিত, তখন এইধরনের হানা দেয়া হানা লোগা ভৌতিক ছবিগুলোই তিনি আঁকছেন। 'সিন্ধুপারে যে ওলোট-পালোট কাণ্ড চলছে, সুরাসুরের যে প্রবল সংঘর্ষ, সেই মন্থন ও উল্লম্ফনের চিত্র রচনা করলেন তিনি, আর উপায় হিসেবে বেছে নিলেন আবোলতাবোলকে— তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর কুশীলবরা উলটেপালটে ডিগবাজি খেয়ে গেলো, ঠাট্টায় কৌতুকে বিপর্যস্ত হল,—আর, একদিক থেকে হয়ে উঠলো তাঁর অসহিষ্ণু প্রতিবাদের তির্যক দলিল।"

আর ছবির জগতের এই উলটপুরাণ রবীন্দ্রনাথকে সেইপর্বে অর্থশাসনবশ্য বাষিক সৃষ্টির জগতেও এক নতুন পরীক্ষায় নিযুক্ত করেছে। সে পরীক্ষা হল ভাষাকে অর্থের সাসন থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা। প্রশ্ন হতে পারে এ চেষ্টার অভিনবত্ব কোথায়? চিরকাল কবিরা ছন্দের দোলা লাগিয়ে বা বিচিত্র ভঙ্গিমায় আশ্রয় নিয়ে ভাষাকে অর্থ-নির্দিষ্টতার নিগড় থেকে মুক্তি দেবার কাজে লেগেছেন, সেই কাজে যোগ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই। লক্ষণীয়, শেষ বয়সে ছবি আঁকার কালেই রবীন্দ্রনাথ ভাষাসাহিত্যে অজস্র ছড়া রচনায় হাত দেন—

দাড়ীশ্বরকে মানত করে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়াল-কাঁটা পাখি
গালে মারল খাবল।

কলম আর তুলির ভাষার বহিরের তফাতটা বাদ দিলে আসলে এরা জাতে এক। এই ঐক্য নিঃসংশয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে, যেখানে ছড়াগুলিকে কবি সচিত্র রূপ দিয়েছেন। ছড়া আর ছবির এই যমজ রূপ আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে আর সমর্থন করেন স্রষ্টা স্বয়ং। তাঁরই লেখায়—

যেমন তেমন এরা আঁকা বাঁকা
কছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি। (উৎসর্গ, সে)

ছবির রেখা যেমন তার বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাষায় ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শব্দকে তেমনই তার শুদ্ধ শাব্দিক রূপে দাঁড় করাবার দুঃসাহসিক চেষ্টা চলল, অর্থকে নিঃশেষে বিতাড়িত করে। সে চেষ্টার নমুনা আমাদের গ্রাম্য ছড়াতেও আছে—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে

কখনো নিরর্থক শব্দকে আশ্রয় করে সংগীতে তেলেনা সরগম সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছড়াও তেলেনার কাছে ঘেঁষে গেছে দেখা যায়—

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি
লম্বা দাঁড়ায় করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।

'গল্পস্বল্পে'র বাচস্পতির ভাষায় শব্দগুলোও অভিধানের বাঁধা পথে চলেনি। লেখকের মতে সে ভাষা মানের গোলামি-করা কলিযুগের ভাষা নয়, মুখে আপনি উঠে-পড়া সত্যযুগের ভাষা, শুধুই ধ্বনির রাস্তায় চলে।

"পাঠশালার পেতোঙোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুসক্‌লিয়ে। বুকের ভিতর করতে থাকতে কুড়ক্কর কুড়ুক্কুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্‌কে যাবে।

তেলেনার ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল উদ্ভট-রসের 'সে' রচনায়— "ফস্ করে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিল করণ, বৈষ্কুম্ভ যোগ, তারপরেই হর্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষরাত্তিরে অসৃক্‌যোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র— গোস্বামীতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে— ঘরকরণার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীয়ানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।"

২.৬ অনুশীলনী ঃ

- রবীন্দ্ররচনাধারায় 'সে' গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য
- সে ঃ উৎকল্পনার হাস্যরসের স্বরূপসন্ধান
- সে ঃ শিশুসাহিত্যের ছদ্মবেশে বড়োদের বই?
- রবীন্দ্রনাথের ছবি ও 'সে'

২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত) রাতের তারা দিনের রবি (দ্র. রবীন্দ্রনাথের 'সে'; 'দাম নেই নাম নেই'— বিজিতকুমার দত্ত)
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়— কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ
- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য
- শুভঙ্কর চক্রবর্তী— উৎকল্পনার হাস্যরস
- অজিতকুমার ঘোষ— বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরসের ধারা
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'সে'

একক 3 ☐ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : তিনসঙ্গী

3.0 ভূমিকা

3.1 রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় তিনসঙ্গীর স্থান

3.2 ছোটগল্পের শিল্পতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী

3.2.1 তিনসঙ্গীর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ

3.2.2 রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঃ শেষকথা

3.2.3 রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঃ ল্যাবরেটরি

3.3 গ্রন্থপঞ্জি অথবা পঠনীয় গ্রন্থ

3.4 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.০ ভূমিকা ঃ

৩.১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় তিনসঙ্গীর স্থান ঃ

রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী' তে গ্রথিত ছোটগল্পত্রয়ী— 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরী' সমালোচনামূলক উপলব্ধির জন্য গল্পকাররূপে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা প্রথমেই জানা প্রয়োজন। অতঃপর জানতে হবে ছোটগল্পের Theory অথবা শিল্পকলা। তিনটি ছোটগল্পের প্রত্যেকটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং তাদের প্লট বা কাহিনী, চরিত্র, পরিণাম-উপসংহার, ভাষা-সংলাপ-আঙ্গিক ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত প্রয়োজন। চরিত্রের সঙ্গে অবস্যই সম্পৃক্ত হবে অনন্তত্ব ও মনস্তত্ব-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা যেহেতু রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান তথা মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের প্রাধান্য আছে। পরিশেষে উপসংহাররূপে সংযোজিত হতে পারে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকাশিত সার্বিক মানবতাবাদ সম্বন্ধে কিছু কথা। 'তিনসঙ্গী'-র ছোটগল্প তিনটিতে এই মানবতাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নারীর স্বাধীনতাপিপাসা— প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতায় এবং অবদমিত প্রতিযোগিতায় তার নিজস্ব সত্তাকে আবিষ্কারের সাধনা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের ছোটগল্পে নারীর এই বিদ্রোহিনী পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বময়ী রূপ খুবই মূল্যবান।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। ....আমার ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত এখানেই।" রবীন্দ্রনাথ সাধনা এবং ভারতীতেও ছোটগল্প লেখেন। তাঁর ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত অবশ্য হিতবাদীরও আগে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ছোটগল্প' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত লেখা গল্পসমূহ থেকে ষোলোটি গল্প বেছে নিয়ে। অতঃপর কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রগল্প' প্রথমভাগ, 'কথাচতুষ্টয়' ও 'গল্পদশক'। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পলেখার প্রবাহ, মাঝেমধ্যে বিরতি থাকলেও প্রায় আজীবনই চলতে থাকে। গল্পগুচ্ছ প্রথমখণ্ড ১লা আশ্বিন ১৯০০ সালে হয়েছিল। দুইখণ্ডে মোট গল্পসংখ্যা ৫৩। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংকলন "গল্পগুচ্ছ" নামে তিনখন্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত 'গল্পগুচ্ছ' এরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। গল্পসংখ্যা ৮৪। 'সাধনা'র যুগে পদ্মাপর্বে কবির ছোটগল্প লেখার প্রাচুর্য দেখা যায় (১২৯৮-১৩০২)। 'তিনসঙ্গী'র তার শেষদিকের লেখা গল্পগ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৯৪০-৪১। এখানে সংকলিত 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্পত্রয়ীকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী (১-৪ খণ্ড) এবং "রবীন্দ্রজীবনকথা"র সাক্ষ্যে জানা যায় তাঁর 'ছোটগল্প' বইটি যে বছরে প্রকাশিত হয় সে বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠকাব্য 'সোনারতরী' (১৮৯৪)। অর্থাৎ তখন চলছিল কবির জীবনে পদ্মবাসপর্ব। চিত্রা কাব্যের প্রকাশ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি যখন লেখা হয় তার কাছাকাছি সময়ে পাচ্ছি 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য (১৯৪১) প্রভৃতি কাব্য, 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'গল্পস্বল্প' (১৯৪১), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ। এই তথ্য মূল্যবান কারণ লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবন পদ্মাপর্বে লেখা ছোটগল্পগুলিতে রোমান্টিকতা অর্থাৎ কল্পনার প্রাধান্য, মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য, প্রেমের প্রথম মাধুরী ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে, শেষজীবনের ছোটগল্পে সভ্যতার ক্রান্তিকালের পটভূমিকায় মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, ভাষার শানিত প্রয়োগ ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে।

অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থের "রবীন্দ্রনাথ" নামক অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি অংশে রবীন্দ্রাথের ছোটগল্পসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত দিকনির্দেশক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাঁর মতে রোমান্টিক ছোটগল্প। প্রেম, সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গযোগ ও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ তার গল্পের বিবিধ লক্ষণ। মহামায়া, সমাপ্তি, মাল্যদান, শাস্তি, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, মধ্যবর্তিনী, পোস্টমাস্টার, কাবুলীওয়ালা, হৈমন্তী, অতিথি, সম্পত্তিসমর্পণ, নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিতপাষাণ এইসব সুপরিচিত গল্পকে রোমান্টিক ছোটগল্পরূপে উল্লেখ করা যায়। এদের বলতে পারি কবির প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্প। অন্যদিকে জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে নিতান্ত একালে রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পগুলি লিখতে শুরু করেন তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বিংশশতকের ছোটগল্পের লক্ষণ। এজন্যই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনাপ্রণালী পূর্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন. এই প্রভেদ দেখা গেছে প্রতমত বিষয় নির্বাচনে। 'তিনসঙ্গীর' ছোটগল্পগুলিতে দেখা যাচ্ছে নতুন সমাজভাবনা ও বিদ্রোহবিগে, নতুন যুগসমস্যা। সর্বোপরি বিষয় ও বিন্যাসে এক নতুন বুদ্ধিগ্রাহ্য ভঙ্গি। সেখানে যুক্তিতর্ক অনেক সময় হৃদয়ভাবকে আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে। দ্বিতীয়ত, লক্ষণীয় আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। কথ্যভা,ার নির্ভার পবাহ, শব্দপ্রয়োগে হীরাখচিত স্বর্ণের দ্যুতি বা অনেকসময় স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঝকঝকে কৃত্রিমতার জন্ম দিয়েছে এবং বাগবৈদগ্ধ বা Wit ও সাংকেতিকতার তির্যক রশ্মিছটা 'তিনসঙ্গীর' ছোটগল্পগুলির ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই পরবর্তী ছোটগল্পসমূহের মধ্যে "নষ্টনীড়", স্ত্রীরপত্র, ল্যাবরেটরী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বাংলাসাহিত্যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে লেখা "তিনসঙ্গী" গ্রন্থে (১৯৪০) যে তিনটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে— 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি'— তাহারা তাঁহার অতিআধুনিক যুগের জীবনপরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের সমাজ-নিরপেক্ষ অসাধারণত্বের প্রতি ঘনীভূত আকর্ষণের পরিচয় বহন করে।" রবিবার গল্পে পাচ্ছি অভীক ও বিভার ব্যাহত প্রণয় সম্পর্কের বিশ্লেষণ রয়েছে। অভীক কুলাচারত্যাগী নাস্তিক আর বিভা ব্রাহ্মসমাজের আস্তিক্যবোধের মধ্যে লালিত মেয়ে। অভীর বিভার প্রণয়ভিক্ষাকারী; বিভার প্রেম ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য প্রতদিনে অপারগ। পরস্পরের মধ্যে অনেক যুক্তিতর্কের আদানপ্রদান হয়েছে, অনেক তীক্ষণ মনন ও বুদ্ধির দীপ্তির প্রতিফলন দেখা গিয়েছে কিন্তু বিভা নিজের লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অভীক বিভার অলংকার চুরি করে শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতিলাভের জন্য বিলাতযাত্রা করেছে ও জাহাজ থেকে বিভাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ও নাস্তিকতা বর্জনের প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে। অভীকের চরিএ একরোখা, বেপরোয়া ও একান্তভাবে আত্মনির্ভর; শিল্পীর সৌন্দর্যতৃষ্ণা তাকে নারীর সঙ্গকামনায় ধাবিত করেছে কিন্তু এর ভিতর প্রকৃত প্রেমের নিবিড় মাধুরী ও নিষ্ঠা নেই। অভীক চরিত্রের গুণ যদি তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হয় তাহলেও বলতে হবে আত্মপ্রচারের উগ্রতা তার জীবন্ত মুখাবয়বকে অনেকটাই ঢেকে রেখেছে।

"শেষকথা"য় বিংশশতকীয় যুগলক্ষণের পাশাপাশি রোমান্টিকতার আংশিক লক্ষণ রয়েছে। এর নায়ক যুগচাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানসাধনায় রত থাকলেও বনান্তরালবাসী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতি তার আকর্ষণ রোমান্টিক নায়কসুলভ। পূর্ব প্রণয়ীর দ্বারা প্রত্যাখাত অচীরা যে নতুন প্রেমের প্রতি বিমুখ নয় তা তার আচরণে বোঝা যায়। তবু উভয়ের মিলন ঘটেনি, কারণ এমন নয় যে নায়ক তার পূর্ব প্রেমিককে তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি বরং বিজ্ঞানসাধক প্রেমিক তার বিজ্ঞানসাধনা থেকে ভ্রষ্ট হতে চায়নি এটাই মূল কথা। শেষপর্যন্ত শেষের কবিতার অমিত-লাবণ্যর মতো অতিসূক্ষ্ম ভাবময় বিরহী প্রেমের সুরে এই প্রেমেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নায়িকা অধ্যাপক দাদামশাইকে নির্জনবাস থেকে লোকালয়ে ফিরেছে ও নায়ক বিজ্ঞানচর্চায় আবার মনোনিবেশ করেছে। চরিত্রসৃষ্টি বা ভাবুকতা নয়, নরনারীর প্রণয় আকর্ষণের মননদীপ্ত বিশ্লেষণেই ছোটগল্পটির প্রধান গৌরব।

তৃতীয় গল্প 'ল্যাবরেটরি'তে রয়েছে আরও সুতীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আচরণের অদ্ভুত খেয়ালিপনা। একালে ব্যক্তিত্ব যে কত নতুন নতুন রূপে ধারালো হয়ে উঠছে এবং পূর্বতন লৌকিক সংস্কার ও নীতিবোধকে হেলায় লঙ্ঘন করছে এখানে তারই প্রমাণ মেলে। নন্দকিশোর সোহিনীর পূর্বইতিহাস নিষ্কলঙ্ক নয় জেনেও তার চরিত্রের স্বকীয় তাগুণে তাকে জীবনসঙ্গিনী করেছে। বৈধব্যের পর সোহিনী তার স্বামীর অক্ষয়কীর্তি বিজ্ঞানমন্দিরের ভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ তার জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেছে। এক তরুণ বিজ্ঞানসাধক রেবতী ভারগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব মেরুদণ্ডহীন। রেবতীকে আকর্ষণ করার জন্য একদিকে তার ভূতপূর্ব বিজ্ঞানশিক্ষক মন্মথ চৌধুরীর উৎসাহদান ও অপরদিকে সোহিনীর তরুণী কন্যা নীলার লোভনীয় সৌন্দর্যের আবেদনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নন্দকিশোর পুরস্কৃত হয়েছে সোহিনীর প্রেমনিবেদন ও চুম্বনদানে; কিন্তু নীলা তার মায়ের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছে। সে রেবতীর প্রতি ছলাকলাবিস্তার করে তাকে সাধনাভ্রষ্ট করেছে ও তাকে চটুল প্রণয়বিলাস এবং অসার খ্যাতির মোহে মাতিয়ে তুলেছে। তার উদ্দেশ্য তার পিতার ত্যক্ত সম্পদের কিছু অংশ বিজ্ঞানসাধনার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে তার নিজস্ব ভোগবিলাসিতার চরিতার্থসাধন। সোহিনী রেবতীকে সরিয়ে দিয়ে ও নীলাকে তিরস্কার করে তার জীবনব্রতকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। নীলার বিত্তলোভ নিয়ে জানিয়েছে অভিযোগ, সে অসঙ্কোচে নিজের অসতীত্ব ঘোষণা ও নীলার পিতৃপরিচয়ে সন্দেহ আরোপ করেছে। এত কাণ্ডের পর সমস্ত সমস্যার অতি আকস্মিক ও হাস্যকর সমাধান ঘটেছে—রেবতী পিসিমার ডাকে তার অঞ্চলতলে আশ্রয় নিয়েছে।

"এই গল্পের প্রধান উৎকর্ষ সোহিনীর চরিত্র ও উহার মাধ্যমে নারীর সতীত্বের এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। সতীত্ব ও পতিব্রতার ধর্ম রয়েছে দৈহিক শুচিতায় নয়, স্বামীর জীবনব্রত উদযাপনে অবিচলিত নিষ্ঠায়। অন্যপুরুষের কাছে আত্মদান, এমন কি মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে দাম্পত্যসম্পর্কের অভিনয়ও এর কাছে কিছু নয়। সোহিনীর এই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ফুটেছে কোনো দুঃসাহসিক কাজে নয়, মন্মথের সঙ্গে আলাপআলোচনায় দৃপ্ত, অসীম সাহসী মনোভাবের প্রকাশে। ল্যাবরেটরি নামক ছোটগল্পে সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে মনের যুক্তিবাদনির্ভর ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিচয় পাই, অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের আবেগ প্রেরণার গতিময় রূপ পাই না। সোহিনী যেন ভবিষ্যতের নারী, পাশ থেকে দেখা তার মুখের ছবি যেন কয়েকটি ইঙ্গিত সংকেতের রেখায় ঈষৎ আভাসিত। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ও দেহমনের কোনো পরিচয় এখানে ফুটে ওঠেনি। মন্মথর সঙ্গে সংলাপে তার যে মানসউত্তেজনা ও ব্যক্তিত্বের গতিভঙ্গির ছাঁচটি পরিস্ফুট তারই আলোকে আমরা তাকে আংশিকভাবে দেখি। নীলার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, আছে শুধু মায়ের শাসন অসহিষ্ণু তরল উচ্ছৃঙ্খলতা। তার চঞ্চল মন মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল, কোনো স্থির সংকল্পের আশ্রয়ে দানা বাঁধেনি। এই অন্তিম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর প্রাক্তন চিত্রশালার অনবদ্য শিল্পসুন্দর মূর্তিগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে কতগুলি অসম্পূর্ণ টুকরো টুকরো রেখাচিত্রের

মধ্যে নিজ প্রতিভার নব নব পরীক্ষার অনিশ্চিত, অস্থির, আলোআঁধারি সাক্ষর মুদ্রিত করেই যুগের অনিবার্য তাগিদ যথাসম্ভব মিটিয়েছেন— সমালোচকেরও মন্তব্য যথার্থ।

৩.২. ছোটগল্পের শিল্পতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাতের তিনসঙ্গী ঃ

প্রথমে ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন। সেই সংজ্ঞার আলোকে 'তিনসঙ্গী'-র ছোটগল্প তিনটির বিশ্লেষণ তথা সমালোচনার একটা আরম্ভবিন্দু পাওয়া যেতে পারে। ছোটগল্পের রূপতত্ত্বের অন্যতম আদি নির্মাতা ব্র্যান্ডের ম্যাথুজ বলেছেন "The short story by its effect, a cettain unity of impression which set it apart from other kind of fiction."— মূলকথা ছোটগল্পে রয়েছে একটা প্রতীতীর সমগ্রতা— ছোটগল্পের পরিসমাপ্তিতে এর স্বাদ ছড়িয়ে পড়ে। (Philosophy of short story)। হাভানি ছোটগল্পের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছেন— "A short story myst contain one and only one informing idea and this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method." (An Introduction to the study of Literature)— ছোটগল্পে থাকবে মাত্র একটি ভাবের উন্মীলন অথবা প্রসার এবং সম্পূর্ণ একমুখী রীতির সাহায্যে এই ভাবটিকে তার যুক্তিযুক্ত উপসংহারে পৌঁছে দিতে হবে। স্যান ও ফাওলেইন (Sean O Faolain)-এর বক্তব্য "In other words the short story is an emphatically personal expositohn. What one searches for and what one enjoys in a story is a special distiliation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subjects, is of value to the writer's temperament and to his alone—his counterpart, his perfect opportunity to project himself." (The short story)। ছোটগল্প বিশেষভাবে হচ্ছে ব্যক্তিজগতের প্রকাশ। ছোটগল্পে পাওয়া যায় এক বিশেষ নির্যাস এক মৌলিক অনুভূতি যা এমন একটি বিষয়কে বেছে নিয়েছে যেখানে প্রতিফলিত হয় লেখকের ব্যক্তিসত্তা।

সাহিত্যিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "সাহিত্যে ছোটগল্প গ্রন্থে ছোটগল্পের সংজ্ঞা গঠন করেছেন— "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতী (Impression) -জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্যসংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতালাভ করে।" বলাবাহুল্য এখানে লেখক ব্র্যান্ডের ম্যাথুজ কথিত 'Unity of Impression' প্রতীতীর সমগ্রতা বা ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। এই ঐক্যতত্ত্বের মূল উদ্‌গাতা এডগার অ্যালন পো। যা হোক আসল কথা "প্রতীতীর সমগ্রতা বা Unity of Impression লেখকের প্রধান পালনীয় শর্ত।

অতঃপর উদ্ধৃত বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে ছোটগল্পের একটি বিধিপ্রধান বা শিল্পতত্ত্ব তৈরি করা যেতে পারে। প্রথমত, ছোটগল্পে ঘটনাগত, মনস্তত্ত্বগত বা চরিত্রগত একটিমাত্র সমস্যারই সংকটরূপ বা চূড়ান্তরূপ দেখানো হবে। দ্বিতীয়ত, বহমান জীবনের মধ্য থেকে লেখকের অনুভূতি একটি বিশিষ্ট প্রতীতীকে আহরণ করে নেবে। সেই প্রতীতী লেখকের মতের অনুকূল হতে পারে নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, ছোটগল্প পড়ে আমরা পাব লেখকের ব্যক্তিত্বেরই একটা পরিস্রুত রূপ, গল্পের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর ব্যক্তিসত্তাকেই প্রতিফলিত করবেন। অতএব ছোটগল্প সম্বন্ধে শেষকথা হল তা হচ্ছে একমুখী— এখানে পাচ্ছি লেখকেরই ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ— লেখক তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন দ্বারা যে প্রতীতী আহরণ করবেন তারই রূপায়ন এখানে।

ছোটগল্পের এই শিল্পতত্ত্বের সাহায্যে তিনসঙ্গীর 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্প তিনটির কিছু উপলব্ধি সম্ভব। ছোটগল্পের যে প্রতীতীগত সমগ্রতা ও একমুখী ভাবের প্রাধান্য তা 'রবিবার' ছোটগল্পটি পড়লে

খুঁজে নেয়া যায়। একে বলতে পারি বিভা ও অভীকের মধ্যে প্রেমের মনস্তত্বগত সংঘাতবা বাইরে আস্তিক ও নাস্তিকের দ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছে। একে নামান্তরে বলতে পারি পুরুষের বোহেমিয়ান শিল্পীজীবন ও কল্যাণীনারীর আদর্শরঞ্জিত জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বিদায়কালে নায়ক অভীকের মনে এই দ্বন্দ্বের নিরসনের ও একটি ভাবগত মিলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা আভাসও দেখা যাচ্ছে। তার প্রায় সমাপ্তি-সংলাপটি স্মরণ করি— "এ কথা সত্য মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের মআমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান যে, তারা নিহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস তুমি সত্য। .....তোমাকে পাইনন বলে অনেক খুঁতখুঁত করেছি কিন্তুহৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ, এ কথার মতো বড় অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনো হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। .....তুমি স্পষ্ট করেআমাকে তোমার ভালোবাসা জানাওনি কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারেনি— বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো একভাবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানিনে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপিন বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে বানাতে পারিনি।"

'রবিবার' ছোটগল্পে ঘটনাগত, চরিত্রগত, মনস্তত্বগত একমুখীনতার অভাব নেই। আসলে ছোটগল্প স্বভাবতই স্বল্পআয়তন এখানে উপন্যাসের মতো প্লট বা কাহিনীর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করার মতো সুযোগ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই 'শেষ কথা' গল্পটি থেকে একটি লাগসই মন্তব্য উদ্ধৃত করছি— "ছোটগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।" অতএব স্বয়ং ছোটগল্পকারের মতে, এখানে ফলিয়ে বলার সবিস্তার বলার অবকাশ নেই। বস্তুত 'রবিবার' ছোটগল্পটি বহির্ঘটনা সামান্যই যা কিছু ঘটছে সব ভিতরেই— অন্তর্ঘটনা তার স্থান নায়ক অভীক ও নায়িকা রুচিবার মনে। একটু উদাহরণ দিচ্ছি Text বা পাঠ্যাংশ থেকে— "বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, 'অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়'

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধবাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'যা পারিনে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।" এখানে ঘটনাগত আলোড়ন যা কিছু সবই নায়কনায়িকার মনোগহনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে রয়েছে একক অনুভূতির তীব্রতা।

এই একরোখা অনুভূতির সঙ্গেই জড়িত মনস্তত্ত্বের বাহুল্যবর্জিত অথচ গভীর বিন্যাস। রবিবার ছোটগল্পে রয়েছে প্রেমমনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য ইঙ্গিত। অভীকের প্রতি বিভার উক্তি, "কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই যে টানাটানি করে এতে কী তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দলে ফেলা হয় না।" এবং পাশাপাশি স্থাপন করেছি বিভার প্রতি অভীকের উক্তি— "আমার এই দুঃখু যে আমার ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পারনি। যদি পারতে তা হলে তোমার সব ধর্মকর্মের বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেও কোনো বাঁধা মানতে না, তরী তীরে এসে পৌঁছয় তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।" দুটি সংলাপ পরীক্ষা করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ নায়কনায়িকার মনস্তাত্ত্বিক ভাবসংঘাত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, 'রবিবার' ছোটগল্পে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন তা স্বভাবতই সংহত, স্বল্পআয়তনে পরিবেশিত।

এবার আলোচ্য সমগ্রতা সংক্ষিপ্তার ভিত্তিতে 'শেষকথা' ছোটগল্পটির বিচার করছি। এখানে অচিরা ও গল্পকথকের প্রেমের মধ্যে যে মহৎ উত্তরণ বা Sublimation এর সঞ্চার ঘটেছে, উভয়তসঙ্গতিমূলক যে বিচ্ছেদবেদনার আভাস দেখা গেছে তাকে বলতে পারি গল্পটির মূল প্রতীতী। অচিরার প্রেমের উত্তরণ বা Sublimation ঘটল, তার ভালোবাসার মধ্যে আদর্শবাদের সঞ্চার হল যখন সে নবীনের বিজ্ঞানসাধনায় মুগ্ধ হয়েও তারপর সিদ্ধান্ত নিল সে যেন নারীর মোহজাল বিস্তার করে এই বিজ্ঞানসাধকের সাধনাকে বিঘ্নিত করেছে। "আমার ঐ পঞ্চবটির মধ্যে বসে আপনার অগোচরের কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেননি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয়নি কারো সঙ্গের। এক একদিন মনে হয়েছে তহাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবে নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পাননি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে, এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখেনি। দূর থেকে ভক্তি করেছি।"

এবং পুনশ্চ "আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাঁধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে।"

অতএব অচিরার মধ্যে একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি প্রেমের মুগ্ধতা ও আত্মসংবরণ। এবার নবীন মাধবের কথা বলি। "সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁটছেড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়েরির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেলোএকটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আনার মতো ব্রহ্মতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।" এবং পুনশ্চ একেবারে গল্পের সমাপ্তিতে "বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।"

অচিরা ও নবীনমাধবের উক্তিগুলি পরীক্ষা করে বলা যায় 'শেষ কথা' গল্পের Unity of Impression বা প্রতীতীগত ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে প্রেমের উত্তরণ ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রেমের বিচ্ছেদবেদনাকে ঘিরে। অন্যদিকে ঘটনাগত সংক্ষিপ্তি যদি পরীক্ষা করতে যাই তাহলে দেখি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের গল্পের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী "রবিবার" গল্পটিতে মাত্র একটি দুটি ঘটনাকে বেছে নেয়া হয়েছে এবং এখানেও মানবমানবীর মনের মধ্যেই যা কিছু আলোড়ন উঠেছে। বিদেশ প্রত্যাগত এক উচ্চশিক্ষিত তরুণ ভূত্তাত্ত্বিক, শাল-মহুয়া অধ্যুষিত নির্জন প্রকৃতিপরিবেশ, গাছের পাশে বসে থাকা একটি ডায়েরিলিখনরত মেয়ে, আত্মভোলা প্রধান ভূতপূর্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক এদের ঘিরেই গাঢ় সংক্ষিপ্ত ঘটনাবস্তুর অবতারণা। নায়কের জীবনকথা ও মেয়েটির পূর্ব ইতিহাস লেখনীর একটি দুটি আঁচড়েই বর্ণিত। নায়কের আত্মকথনের ভিতর দিয়েই মূল ঘটনাবস্তুর ইঙ্গিত পাচ্ছি— "জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বার করে যায়; দেখতে পেলুম অচিরাকে কুসুমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে।" বিজনে এই বনদেবীর মতো নারীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই এক অপরূপ সংঘটন। আবার গল্পকথকের (protagonist) বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছি— "অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম। অচিরা বললে, 'সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে

আর কিন্তু দেখা হবে না"। ঘটনা হিসেবে সংক্ষিপ্ত অথবা সামান্য কিন্তু এর অনুকম্পন অথবা ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী।

'শেষ কথা' গল্পটির মনস্তত্ত্ব হচ্ছে নারীর সঙ্গে পুরুষের এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা—এই ব্যাপারটিকে একটি কাব্যিক বিচ্ছেদ বেদনার-সুবর্ণমুখোশ পরানো হয়েছে। এখানেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছোটগল্পের শিল্পধর্ম অনুযায়ী একটি দুটি রেখা ও বিরলবর্ণে আঁকা। "ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধি শাসনের বহির্ভূত যে—একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত সুর, রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।" নায়কের জবানিতে এই হল পুরুষ মনস্তত্ত্বের সংহত রূপরেখা—পুরুষের চেতনায় প্রেমের আদিম পদধ্বনির রণনঝণন। অচিরাও তার প্রণয় আবির্ভাবের জৈবমূলটিকে দেখতে পেয়েছে, মনের নিহিত পাতালে সে-ও ডুব দিয়েছিল। সাক্ষ্য হিসেবে উদ্ধৃত করছি তার উক্তি—"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে'। তাঁর ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ মানবমনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকার এবং শেষদিকের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাখর্য লাভ করেছিল।

তিনসঙ্গীর গল্প তিনটির মধ্যে 'ল্যাবরেটরি'ই বিখ্যাততম। 'সোহিনী' চরিত্রের শক্তিমত্তা ঘিরেই গল্পটি আবর্তিত, নারীর স্বাধীন সত্তার জয়ঘোষণা ও সমাজের উপর তার আধিপত্য বিস্তারের আভাসকেই গল্পটির মূল প্রতীতী (Unity of Impression) বলা যায়। পাশাপাশি রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিস্তার ও ঘটনাগত ঐক্য। নারীবিদ্রোহিনী সোহিনীর সমস্ত সত্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে তারই একটি সংলাপে—"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাঁধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরী মশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে, কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।'

'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পের ঘটনাবস্তু সোহিনী ছাড়া অধ্যাপক চৌধুরী, রেবতী ও নীলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। 'ল্যাবরেটরি' বড় গল্প, মোট ২৭ পাতা—রবীন্দ্র ঘটনাবস্তুর ব্যবহারে বাহুল্যবর্জিত পরিমিতির পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পটির প্রধান আবেদন মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতময় আবহরচনায়। সোহিনী ও তার মেয়ে নীলার ব্যক্তিত্বের সংঘাত মনস্তাত্ত্বিক লিপিকুশলতার সঙ্গে বর্ণিত অন্যদিকে অধ্যাপক চৌধুরী ও সোহিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের সূক্ষ্ম সঞ্চার। "নীলা মাকে বললে, 'আমাকে আর কতদিন তোমার আচলের গাঁট দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।" নীলা ও তার মা সোহিনীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত যা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ফুটে উঠছে তা আলোচ্য ছোটগল্পের প্রধান আকর্ষণ। এ সংঘাত মূলত মনস্তাত্ত্বিক। আবার সোহিনীর সঙ্গে অধ্যাপকের সম্পর্কে একটা প্রায় প্লেটোনিক দেহ-সম্পর্ক বর্জিত-প্রেমের ইঙ্গিত আছে। "আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, কিছু মনে করবেন না।' জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্ত কালের জন্যে'। বলেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।" সোহিনীর মতো নারী পুরুষকে অবলম্বন না করে বাঁচতে পারে না—এদিকেই কাহিনীতে ইঙ্গিত আছে।

ছোটগল্পকে গীতিকবিতার সহোগ তুলনা দেয়া হয়েছে। সে শুধু এর উপন্যাসের তুলনায় স্বল্পআয়তন ও নিটোল একমুখী বিস্তারের জন্য নয়। ছোটগল্পের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিসত্তা ও জীবনদর্শনের জন্যও এই তুলনার আরোপ। গীতি কবিতায় তাকে লেখকের আত্মমুখীনতা, ছোটগল্পেও রয়েছে লেখকের ব্যক্তিধর্মের প্রকাশ, একে বলতে পারি পরোক্ষ আত্মমুখিনতা। শিল্পতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায় তিনসঙ্গীতে রবীন্দ্রীয় ব্যক্তিধর্ম ও জীবনদর্শনের। কিছু প্রকাশ রয়েছে। দৃষ্ঠাত দেয়ার জন্য চলে যাই 'রবিবার' নামক ছোটগল্পের জগতে। "সত্যি কথাই বলি তবে, 'বী', যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেন্ডহ্যান্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোবে অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে কজন ধনী।"

অথবা "দেখো বী, তুমি প্রচন ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতোই নাস্তিকের। আমিই ভারতবর্ষের প্রাণকর্তা।" দুটিই অভীকের উক্তি, 'বী' হচ্ছে বিভা। দুটি সংলাপের মধ্যেই বিভিন্ন আত্মধর্মী প্রবন্ধে (Personal Essay) ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জীবনদর্শন ও ন্যাশালিজম বা জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এবার যাচ্ছি 'শেষকথা' নামক ছোটগল্পে। "কচ ও দেবযানী" বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষদের বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো।"

অথবা "হঠাৎ মনে খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।"

প্রথম উদ্ধৃতিটি অচিরার প্রতি গল্পকথক নবীনের উক্তি। 'কচ ও দেবযানী' কবিতাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই লেখার দিকে উল্লেখ করেছে—কবিতাটির নাম 'বিদায় অভিশাপ', কচ ও দেবযানী নায়ক-নায়িকা। যা হোক 'রবিবার' গল্পের উপসংহারে একটা যেন কচ ও দেবযানী-র বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী পুরুষকে মমতার ডোরে বাঁধে আর পুরুষ তাকে পদে পদে মোচন করে জীবনের পথে এগিয়ে যায়—রবীন্দ্রনাথ একথা বহু জায়গায় বহুভাবে বলেছেন। এ তার প্রিয় বিষয়। চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক শচীশকেও কারো কারো মনে পড়তে পারে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি নায়কের স্বগত উক্তি। রবীন্দ্র-দার্শনিকতায় আগাগোড়া নিষিক্ত কথাগুলি, "ছিন্নশিকল পায়ে নিয়ে ওড়ে পাখি'—রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের অনুরণন যেন আবহে আসছে মনে হয়।

এবার সর্বশেষে 'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পে লেখকের ব্যক্তিধর্মের অনুসন্ধান করা যাক। তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন বিন্দুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে বেশি।"

এবং পুনশ্চ

"যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

প্রথম উক্তিটি অধ্যাপকের প্রতি সোহিনী, সোহিনী তার স্বামী নন্দকিশোরের কথা বলছে। মানুষকে অমরত্বলাভের জন্য নিজের চেয়ে বড় কিছুকে গ্রহণ করতে হয়, নিজেকে ছাপিয়ে যেতে হয় বিজ্ঞানগবেষকের জবানিতে রবীন্দ্রনাথেরই অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যারা রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়েছে তারা মুহূর্মুহু এমন বক্তব্যের মুখোমুখি হয়েছে।

দ্বিতীয় উক্তিটি অধ্যাপকের রেবতীর প্রতি, শান্ত নির্বিরোধীদের দিয়ে পৃথিবীতে কিছু হয় না, এর জন্য চাই অশান্ত বাঁধাপথের বাইরে যারা যায় তাদের— রবীন্দ্রনাথের এ একটা প্রিয় বাক্য বা জীবনদর্শন। বলাকা কাব্যের 'সবুজের অভিযান', কল্পনাকাব্যের 'হতভাগ্যের গান', 'তাসের দেশ' এসব সাহিত্যকর্মের কথা মনে পড়বে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে লেখকের আত্মের প্রক্ষেপ অবশ্যই রয়েছে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, ছোটগল্পের শিল্পে নৈর্ব্যক্তিকতার প্রশ্নও জরুরি। চরিত্র, ঘটনা, মনস্তত্ত্ব, দ্বন্দ্বসংঘাত সবকিছু সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে লেখককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তার সৃষ্টিকে আপন আবেগে চলতে দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে রূপকারের এই নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভীক, বিভা, অচিরা, নবীনমাধব, সোহিনী, নীলা, রেবতী, অধ্যাপক ইত্যাদি চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা তাদের স্বাধীন প্রাণাবেগেই এগিয়ে চলেছে আপন পরিণতির দিকে। আর একথা কথা ছোটগল্পের আত্মধর্মিতা শুধু লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিফলন থেকেই আসে না, এই আত্মগত ভঙ্গি আসেনায়ক ও নায়িকা চরিত্রের নিজস্ব আত্মউদঘাটন ও আত্মঅবতরণ থেকে। অভীক বা বিভা, অচিরা বা নবীন, সোহিনী প্রত্যেকেই তন্ন তন্ন করে নিজের সত্তা বা আত্মকে পরীক্ষা করে দেখেছে— নিজেদের মূল প্রবণতাগুলোকে খুঁজবার চেষ্টা করেছে, চরিত্র হিসেবে আত্মমুখিনতার শিখরে আরোহণ করেছে। এ ভাবেই তিনসঙ্গীর ছোটগল্পগুলির লিরিক আবেদন অনেকসময় গড়ে উঠেছে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা শিল্পতত্ত্বের নিরিখে তিনসঙ্গীর আলোচনা করলাম। এবার করছি তিনসঙ্গীর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ।

৩.২.১ তিনসঙ্গীর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ ঃ ছোটগল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অবয়বের সংক্ষিপ্ততা— সমালোচকের ভাষায় তা তন্বঙ্গী— "Slightness" ও Steekness" ছোটগল্পকে জনপ্রিয় করছে। অন্যদিকে ছোটগল্পে গল্প থেকে গল্পান্তরে রয়েছে তুমুল বৈচিত্রী। উনিশ শতকীয় ছোটগল্প মূলত রোমান্টিক ও ব্যক্তিধর্মী— "the short story as an essentially romantic form" রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলিকে এভাবেই চিহ্নিত করা যায়। অতিথি, কঙ্কাল, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিতপাষাণ, নিশীথে, মুক্তির উপায়, মেঘ ও রৌদ্র, গুপ্তধন প্রভৃতি গল্পগুলিতে কল্পনার প্রাধান্য, বাস্তবতার গৌণভূমিকা, আকস্মিকতার অবতারণা, ভাষার 'লিরিকিজম্ম' বা কাব্যধর্মী মানুষ তাদের সম্পর্কে রোমান্টিক ছোটগল্প এবং প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক ছোটগল্প— এই বিশেষণই ব্যবহার করবে।

পাশাপাশি 'তিনসঙ্গী'র ছোটগল্পগুলিকে তুলনা করলে আমরা তাদের ভিতর Realism ও Naturelism এককথায় বাস্তবতা ও কল্পনাসমৃখ বাস্তবতার শিল্পসম্মত ব্যবহার লক্ষ করব। রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরীকে এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে যে এদের মধ্যে নুতন পথের সূচনা দেখা গিয়েছে। বলা যায় নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি গল্পগুলির ভিতর দিয়ে বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার সূচনা ও প্রাথমিক বিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তিনসঙ্গীর আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যবর্তী বাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, পরিবেশ ও আবহরচনায় খুঁটিনাটি-র দিকে নজর বা detail এর কাজ লক্ষ করবার মতো। গল্পকে ছাপিয়ে যাচ্ছে চরিতেরর আবেদন, ভাষার কাহিনী ও ঘটনার মধ্যে ফুটে উঠছে খণ্ডতা ও আংশিকতার লক্ষণ। ই. এম ফর্স্টার উপন্যাস প্রসঙ্গে plot এর যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে প্লট হচ্ছে Story with a causality — কাহিনীর ভিতর থাকবে কার্যকারণ, অর্থাৎ আকস্মিকতা ও বিস্ময়ানেক নয় বরং বাস্তবতার প্রতিই হবে ছোটগল্পের আনুগত্য বা 'তিনসঙ্গী' প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য এ সবই হচ্ছে বিংশশতকীয় ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

'রবিবার' ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পালাবদল

'রবিবার' ছোটগল্পটিতে যেন 'শেষের কবিতার দূরাগত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অভীকের মধ্যে রয়েছে

ঝকঝকে বুদ্ধির দীপ্তি, এই গতানুগতিকাতর দেশে সে যেন নিয়ে এসেছে রোমান্টিক বিদ্রোহের এক ঝলক টাটকা হাওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্র অনেক সময় ফুটিয়ে তোলেন সেই চরিত্রের চেহারার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে। গল্পের শুরুতেই পাচ্ছি নায়কের বর্ণনা— "অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ, গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। স্বভাবে তার ছিল নাস্তিকতা। শেষ পর্যন্ত পিতার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাধে কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান অম্বিকাচরণ পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

"ছেলে মাকে গিয়ে বললেন, মা দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ঐখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা মত বড় জাগ্রত হোন না তিনি।"

"মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল তেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, 'ঐ নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"— এভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার' গল্পটির সূচনা করলেন, নায়কের মুখের কথায় তার নতুন যুগের ছোটগল্পের ভাষা বৈশিষ্ট্য সহজেই ফুটে উঠেছে। এ ভাষা, হালকা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত, প্যারাডক্স-প্রধান অর্থাৎ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে আপাতবিরোধ—এভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার' গল্পটির সূচনা করলেন, নায়কের মুখের কথায় তার নতুন যুগের ছোটগল্পের ভাষা বৈশিষ্ট্য সহজেই ফুটে উঠেছে। এ ভাষা, হালকা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত, প্যারাডক্স-প্রধান অর্থাৎ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে আপাতবিরোধ— মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে অর্থ বোঝা যায়। 'দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমার দেবতাকে ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য' অথবা 'অলক্ষীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"— এ সব সংলাপে এপিগ্রামের আদল ফুটেছে। এপিগ্রাম অর্থাৎ 'an apparent contradiction in statement"—মননের ব্যবহারে বক্তব্যের আপাত বিরোধের অবসান হয় ও অর্থ বোঝা যায়।

অভীককুমারের মধ্যে ছিল বহুমুখী প্রবণতা। "জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানায় জোড়াতাড়া দেয়া, আর এক ছবি আঁকা।" মোটরের কারখানায় ও শখ করে মেকানিক আবার তুলি হাতে ওর বাঙালি টিশিয়ান হওয়ার সাধনা। অভীক সরকারি আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল। "ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে।" প্রদর্শনী বের করলে ছবির কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে, 'আমি আর্টিস্ট', ততই তাঁর প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার মেয়ে বেশি সংখ্যক শিষ্য জমল ওর পরিমণ্ডলীতে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য টিশিয়ান হচ্ছেন রেনেশাঁস যুগের বিখ্যাত ইতালিয়ান আর্টিস্ট, ভেনাসের একাধিক বিখ্যাত নগ্নিকাচিত্র তিনি এঁকেছেন।

পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তার ভক্তসংখ্যা কমে গেল কারণ অর্থকুলীন্য তখন তার ছিল না। কিন্তু নারী ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যাহ্রাস ঘটল না। "উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলেছে আর্টিস্ট।" অজ্ঞাতবাসে নানা জীবিকায় কাল কাটিয়ে বোহেমিয়ান আর্টিস্টরূপে নায়কের আত্মপ্রকাশ। "চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ আলোচনা করতে লাগল ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে।" এখানে একদিকে আছে 'বে-আব্রু' আধুনিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ খোঁচা অন্যদিকে শিল্পী অভীককুমার যে নগ্ন মডেল অবলম্বনে নগ্নচিত্রঅঙ্কনে পারদর্শী তারও আভাস। বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কবিতায় যেন অবচেতনার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, অবদমিত ইচ্ছাপূরণ হয়েছে শিল্পের মাধ্যমে, তাঁর শেষদিকের ছোটগল্পেও অবচেতনার ডানাধ্বনি, এক বলিষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয়। রবিবার, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গল্পে সে জাতীয় ছাপ আছে।

ছোটগল্পের রোমান্টিক মূল অথবা জন্মউৎস সম্বন্ধে সমালোচকেরা অবহিত আছেন। "Romanticism war one of the main forces propelling the nineteenth century short story", "...in its nineteenth century development the short story normally incorporated such Romantic features as the singling out of a significant moment of awareness"—উনিশ শতকের ছোটগল্পে রোমান্টিসিজমই ছিল মূল চালিকাশক্তি, একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে যে গুরুত্ব দিয়েছে যা হচ্ছে রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য (দ্রষ্টব্য Ian Reid : The short story)। খ্যাতিসমালোচক একথা বলার পরও সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন, ছোটগল্পের এই একমাত্র অথবা অপরিহার্য প্রবণতা নয়।

ছোটগল্পের যে ভিন্নতর লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা থাকতে পারে, রোমান্টিক আদলের ভিতর থেকেও যে সেই আদল ভাঙার দিকে সে এগিয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ 'তিনসঙ্গী'র ছোটগল্পে পাই। 'রবিবার' ছোটগল্পে অভীক ও বিভার প্রেমে রোমান্টিকতার আদল আছে, ভাষার হালকা ভাবুকতায় রয়েছে তারই বহিরঙ্গ। বিভার রূপবর্ণনা মনে করছি। "কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। .....বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।" ওর সম্বন্ধে অভীক একদিন বলেছিল, "কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গে মেলে, ইনস্ক্রুটেবল"। ইনস্ক্রুটেবল অর্থাৎ রহস্যময়। লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি (লিওনার্দো দা ভিঞ্চি) বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর 'মোনালিসা' নামক জগৎ বিখ্যাত চিত্রের স্রষ্টা।

এই নায়িকা বিভা কিন্তু অভীকের ছবির আধুনিকতা বুঝতে পারেনি। "এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে একটা তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। .....কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছটফট করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোক ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও ইউরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।"

অতএব দেখতে পাচ্ছি 'রবিবার' ছোটগল্পে রয়েছে নায়কনায়িকার চরিত্রের মধ্যে আবেগগত সংঘাত। এই সংঘাতের রূপায়ন অথবা বুননে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন এবং এখানেই এসেছে গল্পের আধুনিকতা। বিভার জীবনে তার বাবার প্রভাব ছিল। অভীকের অভিযোগ বিভা পড়াশোনা করেছে, বাইরে থেকে মনে হয়, তার বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে কিন্তু তবু সে আস্তিক তবু সে ভগবানে বিশ্বাস করে। অভীক তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বিভাকে বলেছিল—'তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই, তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর না কেন। তুমি ত নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে"। স্পষ্ট বুঝতে পারি অভীকের মনে রয়েছে বিভার সঙ্গে তুলনায় একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ; সে নাস্তিক এটাও তার গর্বের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ রবিবার ছোটগল্পে যে মনস্তাত্ত্বিক আবহ সৃষ্টি করেছেন তা বোঝানোর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য উদ্ধার করছি। "মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে বাধা পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরো গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।" এবং বিভার প্রতি অভীকের সংলাপ "যাকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না, তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুরভাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যাথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের উপরে।"

অতএব বুঝতে পারি পিতৃমাতৃহীন বিভার জীবনে কীভাবে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। তার ও অভীকের

স্বাভাবিক সহজ সম্পর্কের মধ্যে তার পিতৃভক্তি একটা অদৃশ্য দেয়ালের সৃষ্টি করেছে। পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষা ও সংস্কারকে সে যদি বুদ্ধিদীপ্তভাবে সংশোধিত করে নিতে পারে তাহলেই তার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু বিভা পিতার অবর্তমানেও পিতৃবিদ্রোহিনী হতে পারেনি। মানসিকভাবেও তার পক্ষে তার সত্তার ভিতরে অবস্থিত ছায়াপিতাকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। একেই বলা যায় ফ্রয়েডীর ভাষ্য অনুযায়ী ইলেকট্রা কমপ্লেক্স (Electra Complex) অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে পিতৃপ্রেমের তত্ত্ব। অভীক কিন্তু পিতৃবিদ্রোহী হতে পেরেছিল, মায়ের স্নেহপ্রভাবকে ছিন্ন করা ও পিতার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা তার কাছে ছিল আপন ব্যক্তিত্বকে স্বপ্রতিষ্ঠ করার উপায়। অতএব ফ্রয়েডীর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ব্যবহার করে তাঁর 'সাইকো-অ্যানালিসিস' বা মনোসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে আমরা রবিবার ছোটগল্পটির নায়ক অভীক ও নায়িকা বিভার মনোগহনের রহস্য বুঝতে পারি অথবা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারি।

"While he is still a small child, a son will aready begin to develop a special affection for his mother, whom he regards as belonging to him, he begins to feel his father as a rival who desputes his sole possession. and in the same way a little girl looks on her mother as a person who interers with her affectionate relation to her fatchr and who occupies a position which she herself could very well fill." (Sigmund Freud : Introductory lectures on Psycho-analysis)। পুত্র মাকে ভালোবাসে এবং পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, কন্যাসন্তান পিতাকে ভালোবাসে এবং মাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশে একটা সময়ে কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের নিরসন করে নিতে হয়। বিভা খুব সাফল্যের সঙ্গে এটা পারিনি, তাই প্রেমের ক্ষেত্রে তার জীবনবিকাশ কিছুটা যেন কুণ্ঠিত ও ব্যাহত।

অভীকের অপরাপর প্রেমিকারা পুরুষের মধ্যে খোঁজে ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য অর্থাৎ বহুসম্পদ। কিন্তু বিভা বলে অর্থবিত্তকে যারা ঐশ্বর্য বলে জানে তারা পুরুষকে ছোটো করার দিকে টানে। অভীক জানে এই অনন্য নায়িকা যাকে ঐশ্বর্য বলে জানে ইচ্ছে করলে তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় নায়ককে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু তারই মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভগবান। বিভা বলে বিয়ে আর্টিস্টের পক্ষে বন্ধন, প্রেরণাকে সে নষ্ট দিতে পারত। কিন্তু তারই মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভগবান। বিভা বলে বিয়ে আর্টিস্টের পক্ষে বন্ধন, প্রেরণাকে সে নষ্ট করে দেয়। অভীক বলেছিল, "স্বীকার করো, আমাকে না হলে নয়' জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন।" বিভা বলেছিল, "মনে যাই থাক আমি কাঙালপনা করতে চাইনে।" তাই দেখি বিভা অভীকের যথার্থ মানসসঙ্গিনী ও দেহসঙ্গিনী হতে পারল না, কেমন যেন রক্তমাংসহীন আদর্শের ছায়াপ্রতিমা হয়ে রইল, নিখুঁত বলেই সে মানবিক চরিত্র যার মধ্যে থাকবে বাস্তবতা এমনটি হতে পারল না। ফ্রয়েডীয় ভাষ্য অনুযায়ী বলতে পারি তার মধ্যে ছিল কামনার অবদান, যার মূলে ছিল অভিভাবক আরোপিত মূল্যবোধের অন্ধ আনুগত্য।

আর্টিস্ট অভীক বহু নারীর সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত, নৈতিকতা তার কাছে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভার চরিত্রে রয়েছে নৈতিক শক্তি। মনের গভীরে সে লুকিয়ে রেখেছে অভীকের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। বিভা 'প্রচণ্ড ন্যাশানালিস্ট', শুধু ভারতবর্ষপ্রেমী; অভীক আন্তর্জাতিক, সে উদার স্বদেশিকার পক্ষপাতী।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিভা ও অভীকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন। অভীক শিল্পী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিলাতযাত্রায় পাড়ি দিল। সে সঙ্গে নিয়েছে বিভাকে না জানিয়ে তার হারখানি। বিনিময়ে তার একতাড়া ছবি রেখে এসেছে গয়নার বাক্সে। হারটা সে রাখছে প্রেমের স্মৃতি হিসেবে। বিভার মন যখন বিচ্ছেদের বেদনায় অভিমানী দিন গুণ ছিল তখনই সাগরযাত্রী অভীকের চিঠি এল। সে চিঠিতে রইল বিভার প্রতি তার হৃদয় বা ভালোবাসার পরম নিবেদন— "এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র।"

অভীকের দুঃখ, এ জীবন বিভার কাছে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটল না। দুজন দুজনকে ভালোবাসল, তবু মিলন হল না। রবীন্দ্রনাথেরই লেখা গান মনে পড়ে যায়—

দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে
নিকুঞ্জে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে
অর তো হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে।

অতএব বলতে পারি প্রেমের ট্র্যাজেডিতেই 'রবিবার' গল্পের সমাপ্তি। রবীন্দ্রীয় দার্শনিকতার সাহায্যে নিয়ে হয়তো বলতে পারি, এ গল্পে নায়কনায়িকা প্রস্তুতি নিচ্ছে আত্মিক মিলনের, বিরহ ঘটনা করছে তাদের প্রেমের বিজয় সংবাদ।

চরিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিভার চরিত্র আছে অন্তর্মুখিনতা, অভীকের চরিত্রে বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য। The Lonely voice এ ফ্রাঙ্ক ও কনর (Frank O'cooner) ছোটগল্প সম্বন্ধে বলেছিলেন 'by its very nature remote from the community romantic, individualistic and intransigent'— ছোটগল্প রোমান্টিক, ব্যক্তিত্বধর্মী ও অবিচল— 'রবিবারে'ও শেষপর্যন্ত পরিণামে আধুনিক মনস্তত্ত্বকে ছাপিয়ে একধরনের আত্মগত কল্পনা আশ্রিত চরিত্রপ্রবা ও রোমান্টিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখা গেল। এই গল্প লক্ষণে যতটা আধুনিক ঠিক ততটাই রোমান্টিক। হয়তো রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের ছোটগল্প সম্বন্ধে এই কথাটাই বেশি প্রযোজ্য।

৩.২.২ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : শেষ কথা :

তিনসঙ্গীর 'রবিবার' গল্পটিকে যদি 'শেষের কবিতা উপন্যাসের একটি ছোটগাল্পিক সংস্করণ বলা যায় তবে 'শেষ কথা' উপন্যাসটিকে 'বিদায়-অভিশাপ' নামক কাব্যনাট্যের একটি অনুরূপ অর্থাৎ গাল্পিক রূপান্তর বলা যায়। 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতায় দেখি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ, দৈত্যগুরু শুক্রাচর্যের আশ্রমে গিয়েছিলেন সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে। 'বিদায় অভিশাপ' সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সে কবিতার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের নিকট থেকে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখবার নিমিত্ত তাঁর কাছে গমন করেন। সেখানে সহস্র বছর কাটিয়ে এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন করে সিদ্ধকাম হয়ে কচ দেবলোকে ফিরে আসেন। কচের কাছে তাঁর কর্তব্যকর্ম বড় হয়েছিল দেবযানীর প্রেমের চেয়ে। তাই দেবযানী বিদায়কালে কচকে অভিশাপ দিয়েছলেন, এই বিদ্যা তুমি সেখাতে পারবে, নিজে প্রয়োগ করতে পারবে না।

পঞ্চভূত গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে এ কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কী বিচিত্ররূপ নিতে পারে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা পরিহাসাচ্ছলে তা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন ওখানেই 'নরনারী' সম্পর্কের বিচারে; যথার্থ পুরুষ হওয়া সহজ নয়, পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, অন্তত আমাদের দেশে এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ কি নয় মেয়েরাই? তাদের অন্ধসংস্কার— আসক্তির্যাকৃপণতা এ ক্ষেত্রে দায়ী। মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাদের সন্তানের জন্য তাদের প্রিয়জনের জন্য। পুরুষের ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুধে।

বস্তুত 'বিদায়অভিশাপ' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন প্রেম মেয়েদের জীবনসর্বস্ব, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে জীবনকর্তব্য অনেকসময় প্রেমকে ছাড়িয়ে যায়। পুরুষ তখন নারীকে পিছে ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যায়।

স্পষ্টতই রবীন্দ্রসাহিত্যে কচ ও দেবযানীপ্রসঙ্গ পুনশ্চ উঠল ১৩৪৬-এর আশ্বিনে তার ছোটগল্প 'শেষ কথা'য় অচিরার জবানিতে। মেয়েদের সৃষ্টি পুরুষদেরই জন্য। কিন্তু বারো আনা পুরুষেরা মেয়েদের ছাড়া কাজ চলে না, কিন্তু বাকি যারা মাইনরিটি বা সংখ্যালঘিষ্ঠ, যারা সবকিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে, তাদের চলে না। তাই মেয়েদেরও উচিত হবে সব পেরিয়ে যাওয়া মানুষকে পথ ছেড়ে দেয়া। যে দুর্গম পথে মেয়েপুরুষের চিরকালের দ্বন্দ্ব, সেখানে পুরুষের জয়ই কাম্য। পুরুষের জয় অর্থাৎ নারী-প্রেম-সংসার সব ছেড়ে অজানা পথে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া। এইজন্য "পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় সেখানে যেখানে কেউ পৌঁছয় নি।" (দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচয়—বিদায়-অভিশাপ, সঞ্চয়িতা)।

অচিরা এ গল্পের নায়ক একদা বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক ভূতত্ত্ববিদ বিদেশে উচ্চশিক্ষিত গল্পকথককে বলেছিল, "ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কমানার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।" নবীনমাধব দেশে ফিরেছিল কারণ সে মনে তার কাজ শুধু বিজ্ঞানের নয় তার কাজ ভারতবর্ষের। অচিরা নবীনমাধব আরো বলেছিল, "বাংলা সাহিত্যে আপনি বোধ হয় পড়েন না। 'কচ ও দেবযানী' বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়েপুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনী জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা। সে কান্না আপনারা নিন পূজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশ্যে আসে নৈবেদ্য। কিন্তু দেবতা থাকে নিরাসক্ত। শেষ পর্যন্ত আলোচ্য ছোটগল্পটির পরিণামে দেখি অচিরার সঙ্গেও নায়কের একটা বিদায়-বিচ্ছেদ ঘটেছিল। অর্থাৎ নায়ক যেন আধুনিক কচ, অচিরা যেন আধুনিক দেবযানী।

এবার চলে যাচ্ছি 'বিদায়-অভিশাপে', রবীন্দ্রনাথ কৃত নরনারীসম্পর্কের ভাষ্যে—

কচ। দেবসন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ
মহাসঞ্জিবনী বিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব, এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ,
এতকাল পরে এ জীবন। কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানী ধিক মিথ্যাভাষী।
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে গুরুগৃহে আসি।
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যায়নে
অহরহ? উদাসীন আর সবা পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্লমুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?

'বিদায়-অভিশাপ' ও 'শেষ কথা'র ভাববস্তুর তুলনা দেখালাম, বস্তুত মানবজীবনে—পুরুষের জীবনে প্রেম ও কর্মসাধনার চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বন্দ্বজনিত ট্র্যাজেডির দিকে আলোচ্য ছোটগল্পটিতে লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

অতঃপর ছোটগল্পটির প্লট, চরিত্র, ঘটনা, পটভূমি, সংলাপ মনস্তত্ত্ব, রচনাভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলছি। নায়কের চরিত্রবিচার করতে গেলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদী প্রবণতা। "মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে মা মা ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। .....কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রতবুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বাঙালি বিজ্ঞানী কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদগদ কণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।" স্পষ্ট বোঝা যায় নবীনমাধব ধর্ম ও মানবতা এবং মানব সেবাকে একত্রে মিলিয়ে দেখতে অনিচ্ছুক। সে ভাববাদী নয়, যথার্থই নিঃস্পৃহ বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক। এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্যই দেশমাতৃকার ভক্তিগদগদ দেশপ্রেম তার পছন্দ নয়, বিপ্লবীপন্থাতেও তার মন টেকেনি, শেষপর্যন্ত দেশের খনিজ সম্পদ আবিষ্কারে মন দিয়ে সে ভেবেছে এ পথেই যে যথার্থ দেশের জন্যে কাজ করতে পারবে।

আলোচ্য নায়ক সুদর্শন সুপুরুষ মেধাবী। বিলেতে যে বিদ্যালাভ করেছে, তার প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে স্বদেশকেই বেছে নিয়েছে। "হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্র চিত্ত নই"—নিজের সম্বন্ধে এই হচ্ছে তার স্বীকারোক্তি। কিন্তু এমন মানুষও নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক জন্ম রোমান্টিককে আবিষ্কার করল।—ছোটনাগপুরের অরণ্যঅঞ্চলে ভূতত্ত্ববিদের কাজ করতে এসে তার জীবনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হল। ঘটল কিছু অবিস্মরণীয় মানবিক অভিজ্ঞতা—প্রকৃতি ও মানুষ এ দুইএ মিলে তার মনে কিছু আলোড়ন আনল। এখানে গল্প থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি——

"এইবার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে এতটুকু গল্প ফুটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরো আছে শুকতারার। নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। .....সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়াফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এই সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতিমায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে—যেমন সে করে সে সূর্যাস্তের পটে।" (রংরেজিনী অর্থ যে মেয়েরা কাপড়ে রঙের কাজ করে, সুতোকে রঙে রাঙায়, পুনশ্চ কাব্যে 'রংরেজিনী' বলে একটি কবিতা আছে।)।

"এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়, পাঁচটি শালগাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটি টিবির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটি মাত্র ফাঁকের মধ্য দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গানার গাঁটছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটা ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্নিমার বান ডেকে আসার মতো আমার বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।"

"গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়গারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোনো চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খটখটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরণা।"

নায়কের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ বোঝা যাচ্ছে। একটি মেয়েকে ঘিরে তার হৃদয়ে বিস্ময়বোধ জেগে উঠেছে। এই নবজাগ্রত অনুভূতির ভিতর রোমান্টিক ও জৈবিক দুটি উপাদানই আছে।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে—

আমি ভালোবেসেছি বাংলাদেশের মেয়েকে
যে দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন ওই মাটির শ্যামল অঞ্জন
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
নীল বনছায়ায়, গোধূলির শেষ আলোটির নিমীলনে

আলোচ্য নায়ক বিদেশিনী মেয়েদের সঙ্গে প্রবাসজীবনে মেলামেশা করেছে। কিন্তু তবু সে বাঙালি মেয়ের প্রেমের পড়ল। গল্পে নায়িকার অচিরা নামটাও নায়কেরই বানানো। যাহোক নায়করূপী গল্পকথক অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় এই নবাগত নবর্জিত প্রেমানুভূতির আবির্ভাব বর্ণনা করেছে এ গল্পে— "দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুলুষিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্রভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখার সুযোগ পাইনি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। ....কোন প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর যে তলায় লুকানো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিচের মধ্যে দেখলুম সেই নীজের তলায় অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারিনি।" উদ্ধৃতির শেষাংশে বর্ণিত অবচেতনার জাগরণ, জৈব কামনার উন্মেষ যা ছিল এতাবৎ অবদমিত।

বিজ্ঞানী নবীনমাধব শুধু নিজের প্রতি আস্থাবান নয়, সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন এবং অহঙ্কারীও বটে। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েক পংক্তি তুলছি— 'রোদপড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ, নাক চিবুক কপাল নিয়ে সুস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপস্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারিনি।" এ চেহারার বর্ণনা যেন স্বয়ং লেখক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আমাদের মনে পড়ছে বিলেতে শিল্পী এপস্টাইন কৃত রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যমূর্তিটির কথা।

অচিরার দৃষ্টিও যে নায়কের উপর পড়েছে, তার চলাচলের পথকে চাহনিতে অভিষিক্ত করেছে, গল্পে তার বর্ণনা আছে। এখানেই গল্পের আদিপর্ব সমাপ্ত। "আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাইনে।" এখানে পাচ্ছি ছোটগল্পের আর্ট-সম্পর্কিত ইঙ্গিত। তা, ছোটগল্পের ভাবসংক্ষিপ্ত ও গঠনসংক্ষিপ্ত "শেষ কথা" গল্পে অবশ্যই আছে।

গল্পের আদিপর্বে যদি পাই নায়কের মনের খবর গল্পের অন্তপর্বে পাই নায়িকার মনের খবর। বিদ্যার্থীর পদস্খলনে তার সমর্থন নেই, সে যে দ্বিতীয় দেবযানী হতে পারবে না সে তার মানসের কচরূপী প্রেমিককে প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। তার নারী হয়েও এই ভালোবাসাকে গঞ্জনা দেবার ব্যাপারটা নায়ককে বিস্মিত করেছিল। অচিরা উত্তর

দিয়েছিল, "নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলি সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ।"

অচিরার পূর্বজীবনে একটা দুঃখের ইতিহাস আছে। অচিরার মাতামহ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তার মনজয় করে ছাত্ররূপী ভবতোষ। রুচিরারও মনভোলালো। অধ্যাপকের টাকায় সে বিলেত গিয়ে আই. সি. এস হয়ে এল, কিন্তু বিয়ে করল অন্য মেয়েকে। অতএব অচিরার মানসের দুঃখটা বোঝা যায়। প্রেমের ব্যাপারে এখন সে সাবধানী, কঠোরভাবে নিজেকে প্রেমপথ থেকে সরিয়ে নিতে তার দ্বিধা নেই।

অচিরা বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বময়ী। নায়ক মধ্যতিরিশ, নারীর বদলে সে যে দেশের জন্যই জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত—এটা অচিরা বুঝতে পারে। বাঙালী মেয়েরা সংসারে সঙ্গিনী হয়, কর্মব্রতে সঙ্গিনী হয় না—এ কথাও অচিরা বলেছিল। 'ভালোবাসা' আর 'প্রাণশক্তির অন্ধতা' তার কাছে সমার্থক। নবীনমাধবের ভালোবাসায় যে তৃষ্ণাঅঙ্কুর প্রচ্ছন্ন—এও তার সুদৃঢ় অভিমত। বিজ্ঞানসাধককে প্রথমে সে ভক্তি করেছে, পরে সে তার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করছে। এবং প্রথম থেকে সদাসতর্ক অচিরা এই প্রেমের শিকড়বন্ধন আপন হাতে ছিন্ন করতে চেয়েছে। এইজন্য রবীন্দ্রঅঙ্কিত এই ছোটগল্পের নারীচরিত্রকে একইসাথে লাবণ্যময়ী ও কঠোরতার প্রতিমা বলে মনে হয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত সে কিছুটা রহস্যের অবগুণ্ঠনেই ঢাকা থেকে যায়। তীব্র অবদমনে নায়কের জীবন থেকে সে নিজেকে ছিন্ন করে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। তার মনের গোপন চিন্তাপ্রবাহ এ গল্পে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের কাছেই এই নায়িকা নিজের সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত করেছিল।

"আমার ঐ পঞ্চবটির মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেননি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয়নি কারো সঙ্গের। এক একদিন মনে হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন, সেটা পাননি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে যেন বলিষ্ঠ মনের জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখিনি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি।"

এবং পুনশ্চ

"আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি, ছি, কী পরাজয়ের বীজ এনেছি আমার মধ্যে।"

নিজের ভিতর অচিরা অনুভব করল তৃষ্ণার জাগরণ। "যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিঃশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির।" বলাবাহুল্য গল্পের পরিণতিতে দেখি অচিরা প্রেমের কাছ থেকে একটি নমস্কারে মুখ ফিরিয়ে নিল, অজ্ঞাতবাস ছেড়ে মাতামহের সঙ্গে লোকালয়ে ফিরে গেল। নায়কের কাছে তার শেষবিদায় কিছুটা যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় ভরা। একটা আদর্শবাদের আশ্রয় অবশ্য বাইরে সে নিয়েছে, বিজ্ঞানসাধককে সে সাধনাভ্রষ্ট করতে চাইনি। আর নায়কের মনের কথা? শেষও গল্পের শেষে তার আত্মজবানিতে ফুটে উঠেছে—"মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।" রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে যায়—"ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওড়ে পাখি।"

অতএব বলতে পারি এ গল্পের সমাপ্তিতে বিষণ্ণতার বেদনা আছে। তবে কি নায়কের স্বভাব প্রেমের সম্পর্কে ভিরু? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! শুধু মনে হয় চরিত্র, সংলাপ, প্লট, মনস্তত্ত্ব, আঙ্গিক ও জীবনদর্শন—সব মিলিয়ে কবির শেষ দিকের গল্পটি একটি চমৎকার সৃষ্টি। কথাসাহিত্যিক হেনরি জেমসের রচনাবলী সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত

ভ্রাতা মনোবিদ উইলিয়াম জেমস মন্তব্য করেছিলেন— "an impression like that we often get of people in life ; theri orbits come out of space and lay themselves for a short time along ours, and then off they whirl again into the unknown, leaving us with little more than an impression of their reality and a feeling of baffled curiosity as to the mystery of the beginning and end of their being." (দ্রষ্টব্য The short story : Ian Reid)। বস্তুত নবীনমাধব ও অচিরা দুজনেই পরস্পরের কাছে ছিল অচেনা, তাদের কক্ষপথ হঠাৎ পাশাপাশি এসে ক্ষণকালের জন্য মিলেছিল, তারপর আবার তারা অকস্মাৎ অজানায় মিলিয়ে গিয়েছে। শুধু পরস্পরের হৃদয়ে রেখে গেছে জীবনের রহস্যঘনতার এক স্বাদ, উভয়ের জীবনের আদি ও অন্ত ভাগ্য তাদের কাছে অজানাই রেখে দিল।

৩.২.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : ল্যাবরেটরি ঃ ১৩৪৭ সালে লেখা রবীন্দ্রাথের একেবারে শেষজীবনের ছোটগল্প 'ল্যাবরেটরি' বিংশশতকীয় ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যে ভরা। এই গল্পে যুগপৎ রোমান্টিকতা ও আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সোহিনীর' অদ্ভুত নারীচরিত্রই এ গল্পের কেন্দ্রগত আকর্ষণ। গল্পের কথনভঙ্গিতে, ভাষাবিন্যাসে, ঘটনার নির্মাণে ও ঘটনার দ্রুত পালাবদলে, আভাসে ইঙ্গিতে ল্যাবরেটরি উদ্যত উপস্থিতি ফুটিয়ে তোলার মুনশিয়ানায়, মনস্তত্ত্বের নিপুণ বয়নে ও নারীমনের রহস্য উদঘাটনে এ গল্পের জোড়া মেলা ভার। ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার শুধু বিজ্ঞানের নয়, এ গবেষণাগারে মানবজীবনও অনুবীক্ষণের তলায় স্থাপিত হয়েছে অথবা অপূর্ব জীবনরসায়নরূপে তার বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে।

এই গল্পটি প্রথম বাক্য থেকে গতিবেগ সঞ্চয় করেছে— "নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্য মান ছাত্র অর্থাৎ বিলিয়ান্ট তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারী।" এই নন্দকিশোরেরই স্বপ্ন দেখা বৈজ্ঞানিক মনের উৎপন্ন ফল আলোচ্য ল্যাবরেটরি। একদিকে প্রতিভাবান অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের বক্রপথে তার অনাস্থা ছিল না। নির্মাণকাজে যুক্ত হয়ে বস্তুত তিনি প্রচুর ধনার্জন করেছিলেন। নিজে থাকতেন সাধাসিধেভাবে একটা ছোট বাড়িতে কিন্তু "বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন মস্ত।" তিনি সৃষ্টিছাড়া লোক, মনের ভিতর বিজ্ঞানেরা পাগলামি বিদেশ থেকে দামি দামি যন্ত্রপাতি আনতেন, কারণ তিনি জানতেন এ দেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের, বড় ও দামি যন্ত্র ব্যবহারে সুযোগ না থাকায় ছাত্ররা শুধু পাঠ্য বই-ই পড়ে।

পরবর্তীকালে দেখি বিদ্যালোভী মানুষটি লোহার ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন। পাঞ্জাবে এসে পেলেন তাঁর জীবনসঙ্গীনিকে, বিজ্ঞানসাধনার দায়দায়িত্বে যে নারী অনায়াসে পরে গ্রহণ করবে। সোহিনীর প্রথম আবির্ভাবটি বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো— "সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাঘরা দুলিয়ে অসংকোচে তার কাছে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ ঠোঁটে একটা হাসি আছে, যেন শান দেওয়া ছুরির মতো।" জ্যোতিষী বলেছে তার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে। যাহোক নন্দকিশোর ব্যবসাবুদ্ধি তাকে মুগ্ধ করেছে। "মেয়েটি বললে, 'বাবু রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আখি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এখন মানুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।" নন্দকিশোরের মনের কষ্টিপাথরে এই নারীরূপী দামি ধাতুর দাগ পড়ল। "দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর ঝকঝক করছে ক্যারেকটারের তেজ"। "মেয়েটিকে সবাই ডাকত সোহিনী বলে। পশ্চিমী ছাঁদে সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।"

নন্দকিশোর কঠোর বস্তুবাদী মেয়েটিকে গ্রহণ করেছিলেন চেহারা দেখে নয় চারিত্র্য দেখে। যে দশা থেকে তিনি মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনেছিলেন সেটা খুব নির্মল বা গোপন ছিল না। উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যার ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন

সযত্নে। তাঁর একটি কথায় দাম্পত্য সম্পর্কের মূল ভিত্তি পাচ্ছি— "পতিব্রতা স্ত্রী যদি চাও, আগে ব্রতের মিল করাও।" নন্দকিশোর চরিত্রও গল্পলেখক একটি বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন— "কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না।" অতএব তাঁকে ও সোহিনীকে নিয়ে জনরবে তিনি ছিলেন অবিচলিত।

"নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোনো এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে। গল্পের এই অংশে দেখা পাচ্ছি তাদের মেয়ে নীলিমা অর্থাৎ নীলার। "মেয়েটি একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল— মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতবর্ণের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।" সোহিনী একদিকে বিদূষী করে গড়ে তুলছে মেয়েকে অন্যদিকে বুক দিয়ে আগলে চলছে ল্যাবরেটরিকে। কিন্তু নীলার রক্তে ছিল নিষিদ্ধের ও উদ্দামতার বীজ। নীলার জীবনে বহু যুবকের আনাগোনা কিন্তু সবটাই বাহিরদ্বারে, ভিতরে সোহিনীর সতর্ক প্রহরা।

গল্পের এই অংশে আবির্ভাব হল নায়কের, অবশ্য তাকে যদি নায়ক বলা যায়। "কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করেছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।" সোহিনী ল্যাবরেটরি গল্পে এই রেবতীকে তার প্রয়োজনে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। সে প্রয়োজন অবশ্য মহৎ ল্যাবরেটরির দেখাশোনা ও উন্নতিবিধান।

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার কলাকৌশল সোহিনী অবশ্য ভালোই জানে। রেবতীর ভূতপূর্ব বিজ্ঞান-অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী উত্তরকালে সোহিনীর বান্ধব। নারীর মোহিনীমায়ায় তিনিও বাঁধা পড়েছেন, কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে একটা প্রোটোনিক দূরত্ব ছিল। সোহিনী মন্মথকে বলেছিল, "জানেন বো হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যর কথা।"

সোহিনী চরিত্র আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করে তার একনিষ্ঠ নারীধর্মের কারণে। প্রচলিত অর্থে সে সতী নয়, কিন্তু বিগত স্বামীর সাধনাকে সে আপন করে নিয়ে নিজের মূল্য সপ্রমাণ করেছে। উন্মাদিনীর মতো একমুখী অবিচলভাবে সে ল্যাবরেটরিকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান করেছিল, এইখানে ল্যাবরেটরি ছোটগল্পটির নামকরণের যথার্থ্য। অন্যদিকে এখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনরসায়নগারে অণুবীক্ষণের তলে অথবা দ্রবণের মধ্যে ফেলে বিভিন্ন মানবচরিত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন— সোহিনী, নন্দকিশোর, রেবতী, নীলা, মন্মথ এমনি সব চরিত্রে তিনি ছোটগল্পের স্বপ্ন পরিসরে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-ও গল্পের নামকরণের ব্যঞ্জনাকে বহন করেছে। গল্পকারের কৃতিত্ব তিনি বাংলা সাহিত্যকে সোহিনীর মতো ব্রত নারী চরিত্র উপহার দিতে পেরেছেন।

উনিশ শতক বঙ্গদেশে ছিল রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। রেনেসাঁসের মূলকথা প্রাচ্যসভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে মিলিয়ে নেয়া। একালের মনীষীরা বিদ্যাসাগর-মাইকেল মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই এই সমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই দলভুক্ত। উনিশশতকীয় রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার প্রসার। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারীর স্বাধিকার ঘোষণার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল মহুয়া কাব্যের 'সবলা' কবিতাতেই শোনা গেল রমনীর এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর—

যাব না বাসরকক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।

চোখের বালি উপন্যাসের বিনোদিনীর মধ্যে নারীবিদ্রোহকে দেখা গেল। পুরুষের বর্মআবৃত নিরাপদ জগতে তার আবির্ভাব বজ্র এ বহ্নির মতো। তারো আগে দেখা গিয়েছে 'চিত্রাঙ্গদা'-কে। ঘরেবাইরে উপন্যাসের বিমলা চরিত্র নারীর

নিজস্ব সত্তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে নষ্টনীড়, 'স্ত্রীরপত্র' প্রভৃতি ছোটগল্পও এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণীয়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনীকেও এই পরিমণ্ডলে রেখেই বিচার করতে হবে। এক স্বাধীন তেজস্বিনী স্বনির্ভর নারী যে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সংসারে পুরুষের পরাধীনে অথবা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। নন্দকিশোরের কাছে এই একদা স্বৈরিনী রমণীর আত্মসমর্পণ সে হচ্ছে বীরঙ্গনার বীরপূজা। স্বামীর ল্যাবরেটরিকে স্বামীর মৃত্যুর পর বুক দিয়ে রক্ষা করা ও জীবনের ধ্যানজ্ঞান করে তোলা তাকে যথার্থ অর্থেই সতী ও বীরাঙ্গনা করেছে। প্রচলিত সতীত্বের ধারণা দিয়ে সোহিনীকে বিচার করা যাবে না। বিনোদিনী, বিমলা, টলস্টয়ের আনা কারেনিনা, ফ্লবেয়ারের মাদামা বোভারি ইত্যাদি বিশ্বসাহিত্যে নতুন যুগের বিদ্রোহিনী নারীদের সঙ্গে তার মানুসেরসাম্য অল্পবিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়।

সোহিনী কখনই ভুলে যায়নি "নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য।" এইখানেই সোহিনী অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছিল কিছুটা তুলে দিচ্ছি। "আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পূজার দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধুপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘন্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক পূজা ছিল, এইসব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে রাখত কলেজের ছাত্ররা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।" স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুরঘুর করত।" 'বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দুচার জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।" "মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি। সত্যি কথা বলতে আমার নাম বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী-কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সতীসাবিত্রী। ..... ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাপ দিয়েছি সহজে পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। যাই হোক, তিনি যাবার পতে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।" "দেখলুম জুটেছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়ে মানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এতে রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারেনি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। এদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেননি।" বোঝা যাচ্ছে সোহিনী চরিত্র একইসাথে সতী ও অসতীর বিষম ধাতুতে গড়া, কিন্তু তার নারীত্বকে প্রচলিত মূল্যবোধ ও সমাজনীতি দিয়ে বিচার করা যাবে না। সে যে পরম নিষ্ঠাবতী ল্যাবরেটরিকে কেন্দ্র করে সপ্রমাণ করছে নারীত্বের অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই সে সসম্মানে উতরে যেতে পারে। তার আত্মস্বীকৃতিতেই পরিচয় তার মধ্যে বহুগামিতা ছিল, বিবাহিত জীবনেও দেহের জ্বালা তাকে ভ্রষ্টা করেছে, এমনকি নীলার পিতৃপরিচয়েও রয়েছে সংশয়। কিন্তু তার অকপট স্বীকারোক্তিই তাকে ভণ্ডামির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সোহিনীর চরিত্রের মধ্যে আমরা একটা বিবর্তন রেখা লক্ষ করি। প্রথমে সে ছিল শুধু সুখের সন্ধানে থাকা এক স্বৈরিনী। নন্দকিশোরের সঙ্গে সম্পর্করচনার পর নয়, নন্দকিশোরের মৃত্যুর পরই এই সুখসন্ধানী চারিত্র্য পালটে

গেল। সুখকে বিসর্জন দিয়ে সে যেন এক কৃচ্ছসাধনায় ব্রতী হল, ল্যাবরেটরি হয়ে উঠল তার সাধনপীঠ। বাস্তবতার দাবী তাকে স্বেচ্ছাচারিতার সুখময় স্রোতোপথ থেকে সরিয়ে এনেছে। এখানে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের সূত্র দিয়ে সোহিনীর চরিত্র কিছুটা ব্যাখ্যা করতে পারি—"The ego discovers that it is enavitable for it to renounce immediate satisfaction to put up with a little unpleasure and to abandon certain sources of pleasure altogether. An ego thus educated has become 'reasonable'; it no longer lets itself be governed by the pleasure principle, but obeys the reality principle, which also at bottom seeks to obtain pleasure, but pleasure which is assured through taking account of reality, even though it is pleasure postponed and diminished." (Sigmund Freud : Introduction Lectures on Psychoanalysis)। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দিয়ে সোহিনী চরিত্র বিচার করলে মূলকথা এই বলতে পারি যে, তার আত্ম বা অহং এই অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। সুখ ও স্বপ্নের পথ দিয়ে চলা আপাতত থামাতে হবে অথবা একেবারেই থামাতে হবে, সুখভোগকে সাময়িক স্থগিত করা এমন কী কিছু অ-সুখকে জীবনে বরণ করে নেয়া, এমনকি প্রয়োজনে কোনো কোনো সুখের উৎসকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। বস্তুত এভাবেই সুখভোগনীতি বা 'pleasure principle' সোহিনীর জীবনে 'reality-principle' বা বাস্তবতার নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ওখানেও এক ধরনের সুখবোধ আছে, কিন্তু এই সুখ বা আনন্দ বাস্তবকে বর্জন করে নয় গ্রহণ করে। ল্যাবরেটরিকে ঘিরে সোহিনীর জীবনস্রোত এ গল্পের দ্বিতীয়ার্ধে মূল আবর্ত থেকে সরে এসে এক ভিন্নতর আবর্তের সৃষ্টি করেছে। যে ছিল বিলাসিনী সে হয়ে উঠল কৃচ্ছসাধিকা।

গল্পলেখক সোহিনীর সঙ্গে তার কন্যা নীলিমার কামনাবাসনা ও উদ্দেশ্যের সংঘাতও দেখিয়েছেন। নিলীমা চরিত্র সোহিনী চরিত্রের তুলনায় ফিঁকে রঙে আঁকা। স্বাভাবিক সুস্থ যুবতীর ইন্দ্রিয়মূলক উপভোগবাসনাই তার মধ্যে তীব্রতা অর্জন করেছে। মায়ের প্রতি তার আনুগত্য, বিদ্রোহ ও মায়ের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আলোচ্য গল্পে চমৎকার ফুটেছে।

"মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদূষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়।" অর্থাৎ যে আনন্দ সোহিনী ভোগ করেছিল, মেয়ে সে আনন্দ ভোগ করুক সোহিনী তা চায় না। "মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। ..... অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়।"

সোহিনী নির্বাচিত করল রেবতীকে, উচ্চশিক্ষিত নবীনবিজ্ঞানী একদিকে সে হবে নীলার উপযুক্ত পাত্র, অনদিকে ল্যাবরেটরির সুযোগ্য কর্ণধার। রবীন্দ্রনাথ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, নারীর মোহিনীমায়া বিস্তার সবই চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কখনো তিনি সাহায্য নিয়েছেন বিশ্লেষণের, কখনো আভাসইঙ্গিতের। "মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হ'ল বোটানিক্যালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলে পড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ করা স্যান্ডেল।

যে আকাশনিম গাছের তলায় রেবতী রবিবার কাটায় সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে।"

অথবা ভিন্ন অংশে—"ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্নতন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয়, কিন্তু তাতে

দৃষ্টিশক্তির শক্ত আলো জ্বলজ্বল করছে, মুখের মধ্যে সেইটের সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম।"

এবং পুনশ্চ "নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা।.....রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে দিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃতওকে তাড়াতাড়ি একচুমুকে গিলতে হয়।"

রেবতী সম্বন্ধে সোহিনী অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছিল, 'তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাকে চরম রে মারব স্বামীঘতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলাম রেবতীকে।"

নীলা মায়ের বিরুধে বিদ্রোহ করে তার অভিভাবকত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আপন পায়ে দাঁড়াতে চায়। প্রমাণ নীচের বাক্যে— "নীলা মাকে বললে, আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাট দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

নীলার প্রতি মোহ ল্যাবরেটরিতে কর্মমগ্ন রেবতীর কুমার মনে যে মোহ বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য ছোটগল্পে তার সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন— সময় রাত্রি দুটো— "এমন সময় দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাতকাপড়-পরা, পাতলা শিল্কের কামিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।" লক্ষ করি লেখক তাঁর শেষদিককার গল্পে দেহবাস্তবের বর্ণনাতেও বিমুখ নন।

"রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে।"

আশ্চর্যের কথা ল্যাবরেটরির স্বার্থেই যে সোহিনী নীলা ও রেবতীর পরিণয় চেয়েছিল, সেই কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীলা ও রেবতীর প্রণয়ের বিরোধী হয়ে উঠল। তার মনে হল রেবতীর নবজাগ্রত রূপমোহর ছিদ্রপথে ল্যাবরেটরির প্রতি কর্তব্যকর্মে অবহেলা ঘটবে।

গল্পের শেষের দিকে দেখি রেবতীর সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠেছে, নীলাও তাকে পতিত্বে পেতে আগ্রহী। "নীলা বললে, কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজিস্ট্রি অপিসে নোটিস তো দেয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও না কি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, 'মরে গেলেও না।'

গল্পের সমাপ্তিটা কিন্তু অতর্কিত ও কিঞ্চিৎ হাস্যকর। এ যেন অনেকটা হহুরন্তে লঘুক্রিয়ার মতো। "হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রেবি চলে আয়। সুড়সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবারও ফিরেও তাকাল না।" ল্যাবরেটরি গল্পের এই পরিণাম রেবতীকে দুর্বলচিত্ত পুরুষ হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আশ্চর্য নীলা চরিত্র একই সময়ে ধীরে ধীরে বলশালী স্বনির্ভর হয়ে উঠছিল। এমন হতে পারে রবীন্দ্রনাথ গল্পটাকে হয়তো পুরো শেষ করলেন না। পাঠকপাঠিকার মনে এই উদ্যত আশা রেখে দিলেন রেবতী আবার ফিরে আসতেও পারে।

গল্পের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে অধ্যাপক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু রেবতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক নন, সোহিনীর সঙ্গে তার একটি মধুর সম্পর্ক আছে যা প্রায় প্লেটোনিক অর্থাৎ দেহকামনা বর্জিত। অবশ্য সক্রিয়ভাবটা কিঞ্চিৎ সোহিনীর দিক থেকেই। আসলে সোহিনী হচ্ছে সেই জাতের নারী যে কোনো পুরুষকে অবলম্বন না করে বাঁচতে পারে না। "সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে চট করে সরে গেল, ভালো মানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।" সোহিনীর এই সাহসী আচরণ বুঝিয়ে দেয় চরিত্র হিসেবে সে প্রথামাফিক নয়, গতানুগতিকের উর্ধ্বে। অন্যদিকে ল্যাবরেটরি গল্পে শৈশবে মায়ের মৃত্যুর কারণে আচারনিষ্ঠ পিসিমার হাতে মানুষ রেবতীর ভিতরে পুরুষ চরিত্রের খর্বতাই প্রদর্শিত হয়েছে বিশেষত নারীর সঙ্গে সম্পর্কে।

ল্যাবরেটরী গল্পটির একটা বৈশিষ্ট্য এখানে মাঝে মধ্যে লেখক কিছুটা হাস্যরসের উপাদানও তৈরি করেছেন। যেমন রেবতির পিসিমার পিছে পিছে চলে যাওয়া। একটা হালকা ঝকঝকে ভাষাও লেখক এ গল্পে ব্যবহার করেছেন। গল্পবলার ভঙ্গিটা একই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত ও অনায়াস সহজ। আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে বড় গল্পের লক্ষণ, কিন্তু এ গল্পে উপকরণ বাহুল্য একটুও নেই। গল্পের নাম ল্যাবরেটরি অতএব রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক আবহ রচনাতেও পিছপা নন। "ঐ দেখ দুটো গ্যালভানোমিটার, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ হুই ভ্যাকুয়াম গল্প, আর এটা মাইক্রোফটোমিটার"— এখানে অধ্যাপক চৌধুরী সোহিনী সমতিব্যাহারে রেবতীর সঙ্গে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির পরিচয়সাধন করাচ্ছেন।

সর্বশেষ বলতে পারি ল্যাবরেটরি গল্পটির উপসংহারে অপ্রত্যাশিত চমক রয়েছে। পাঠকমন যে ধরনের প্রস্তুতির জন্য যৌক্তিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল সেটা হয়নি। ছোটগল্প অবশ্য তার পরিণাম ব পরিণতিতে সবসময় পাঠকের প্রত্যাশা মেনে চলে না। ছোটগল্প তার বিন্যাসও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশাকে কিছুটা পূর্ণ করতে চাইলেও তা যে ওই উদ্দেশ্য ও কারণকে সবসময় সুস্পষ্ট করবে তা নয়। গোগোল এবং পো এবং গোগোলের সময় থেকে একালের ছোটগল্প তার সমাপ্তিতে অধিকতর খোলামেলা ভাব অথবা অনিশ্চয়তা দেখিয়েছে। শেষটা কেমন হবে তা বোঝা যায় না অর্থাৎ তা পূর্ব নির্ধারিত নয়— ".....short stories do not so much fareground closure as the audience's anticipation of closure. Short stories are everywhere shaped by our expectation of an imminent teleology, but it does not follow that they will display such a technology. Indeed the development of the short story since gogol and Poc. the so called modern short story, is marked by a movement toward endings of greater openness or indeterminacy." (Short story at the Crossroad : ed by. susan Lohafer)। ল্যাবরেটরি ছোটগল্পটির উপসংহারে এই খোলামেলাভাব বা অনিশ্চয়তার ছাপ আছে সন্দেহ নেই।

৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি অথবা পঠনীয় গ্রন্থ ঃ

রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ
রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রবীন্দ্রজীবনকথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প
প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা
Ian Read : The short story
Sigmund Freaud : introductory Lectures on Psychoanalyssi ; Penguin
Susan Lohafer, ed. : short story at the Crossroad.

৩.৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী ঃ

১। ছোটগল্পের থিয়োরি অথবা শিল্পতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করো ও সেই শিল্পতত্ত্বের আলোকে "তিনসঙ্গী"র গল্পগুলির বিচার করো।

২। "রবিবার" ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করো ও ছোটগল্প হিসেবে এর সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৩। "শেষ কথা" ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করো ও ছোটগল্প হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও।

৪। 'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করো ও ছোটগল্পের শিল্প এখানে কীভাবে ফুটেছে সংক্ষেপে বলো।

৫। ল্যাবরেটরি গল্পের সোহিনী চরিত্র নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সে কোন নতুন বার্তা এনেছে?

৬। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় 'তিনসঙ্গী'র স্থান নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।

৭। 'তিনসঙ্গী'তে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য কী দেখেছ বলো।

অথবা

'তিনসঙ্গী'র যে কোন একটি গল্প অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের ওই বিশেষ ছোটগল্পটির আঙ্গিকে নিয়ে আলোচনা করো।

একক 4 ❑ ভারতবর্ষের ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

4.1 সারসংক্ষেপ
4.2 বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা
4.3 সম্ভাব্য প্রশ্ন
4.4 গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ সারসংক্ষেপ ঃ

ভারতবর্ষের বুকে বহিরাগত শত্রুর যে রক্তাক্ত সংগ্রাম, সেই ইতিহাসের বিবরণে ভারতবর্ষের স্বরূপ নির্ধারিত হয়নি। সেখানে চরম দুর্যোগের কাহিনী থাকলেও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনস্রোতের ক্রমপ্রবাহিত সচল ধারা উপেক্ষিত হয়েছে। বিদেশীর লেখা ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধবিগ্রহ ও জয় পরাজয়ের কাহিনীই প্রধান, সাধারণ মানুষের সমাজজীবন সেখানে অনুপস্থিত। ভারতবর্ষের অন্তরধর্মের সমৃদ্ধ সম্পদের কথা লেখা হয়নি সেই বিবরণে। রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী দৃষ্টি, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বার্তাকে গুরুত্ব দেয়নি, পরিবর্তে সমাজের অন্তর্নিহিত গতি নানা পথ ধরে চলার মধ্য দিয়েও একটি পরিবর্তনশীল এবং সহনশীল মানসিকতা গড়ে তুলেছে তাকেই তিনি প্রকৃত ভারতবর্ষ বলে মনে করেছেন, যদিও সেই কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নেই। কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম— এঁরা কেউই বিদেশীর লেখা ইতিহাস উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এঁরা সকলেই সেই সমাজ রূপান্তর কাজে সক্রিয় হয়েছিলেন তাঁদের প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও ধৈর্য নিয়ে। এইটি ভারতবর্ষের যথার্থ চেহারা, সেইখানেই আমদের নিজস্ব সত্তার আশ্রয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী শিকড় যে বহুদূর প্রসারিত, সে কথা আমার ভুলতে বসেছি। যারা ভারতবর্ষকে বাহুবলে গ্রাস করেছে, সেই আগন্তুকদের আমদানি করা সংস্কৃতি আমরা পরম সমাদরে গ্রহণ করেছি, মনে ভেবেছি ভারতবর্ষ যেন বন্ধ্যা প্রকৃতি। এই অশিক্ষার অগৌরবকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে স্বদেশের ইতিহাসের প্রাধান্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার পরিবর্তে দিগ্বিজয়ী মামুদ থেকে আরম্ভ করে লর্ড কার্জন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীর উদ্ধত গতিভঙ্গি তার অন্তর্গত হয়েছে; অন্তরালে চলে গেছে ভারতবর্ষের গৌরবময় যুগের ঘটনাগুলি। মুসলমান যুগে নবাবের বিলাসকক্ষ, নর্তকীর নূপুরধ্বনি, বৈভবের অহংকার, এগুলি কী সত্যই ভারতবর্ষের পরিচয় দেয়? তারপর এসেছে ইংরাজ শাসন, যে যুগে আমরা মনে করেছি ইংরাজের সবকিছু অনুকরণ করে মনের সংগ্রহশালায় তাদের সামগ্রীকে সঞ্চয় করা এবং তাতেই জীবনের পরম সার্থকতা ভেবে ধন্য হয়েছি।

দেশ এবং জাতিভেদে ইতিহাসও সর্বত্র এক নয়। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করতে না পারলে ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট হল না বলে অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন— "যিশুখ্রীস্টের হিসেবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহার অন্য বিষয়ে সন্ধান করলি খাতাপত্রসমস্ত নগণ্য হইয়া যায়।" ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে রাষ্ট্রীয় ঘটনার উত্থান পতনের মধ্য দিয়েদেখলে, সেখানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়। ইংরেজ সন্তান তার ইতিহাস থেকে পূর্বপুরুষের যুদ্ধ জয় ও বাণিজ্যবিস্তারের কাহিনী জানতে পারে। আর ভারতবাসী সেই পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে এক হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়, কারণ ইংরাজের মতো বাহুবল ও ধনবলের অধিকারী সে নয়। আমাদের দেশের ইতিহাসপাঠ সেই নঙর্থক দিকটি তুলে ধরা হয়। পরিণামে "ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন

দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।" দেশের স্বরূপ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, সংজ্ঞার দ্বারা তার নির্ণয় হয় না। দেশীয় ভাবের ধারা শিশুকাল থেকে চিত্তবিকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে। সেই উপলব্ধি এক অখন্ড ঐক্যসত্তা গড়ে তোলে, যার দ্বারা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এর ধারাবাহিক জীবনচেতনা মনের গভীরে প্রোথিত হয়। এইখানেই ভারতবর্ষ আপন গৌরবে উজ্জ্বল, যেখানে লেখা যাবে অসংখ্য বিভেদকে আত্মস্থ করে এক ঐক্যবিশ্বাস, সেখানে কেউ ব্রাত্য নয়, সকলের নিজস্ব সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষ তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। তার আগ্রাসী ভূমিকা নয়। এই বিরোধের ভাবকে অস্বীকার করার জন্যই ভারতবর্ষ তথাকথিত রাষ্ট্রগৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার প্রধান লক্ষ্য সম্প্রীতিবোধ। "পরের বিরুধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলটিকাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যসংস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।"

এই প্রসঙ্গেই এক তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে দ্বন্দ্বসংঘাত ইউরোপীয় সভ্যতার মূল চিহ্ন, সেই জালে অন্য দেশের গলায় ফাঁস লাগলেও ইউরোপ তাতে লাভবান নয়। কারণ তাদের নিজেদের দেশেও সর্বস্তরের মানুষ নিজের অধিকারের ভিত্তিতে সমাজমানসকে সমৃদ্ধ করে না, বরং প্রতিকূল মনোভাবই সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায়, সেখানে শুধুই বলবৃদ্ধির উদ্যম। আইনের বলপ্রয়োগে সেখানে জনশক্তিকে আয়ত্তে রাখতে হয়। "কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য, মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই বিরোধ শস্যেরইপ্রাণবান বলবান বৃক্ষ। " অপরদিকে ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সবরকম বৈপরীত্যকে আকর্ষণ করার মহৎ প্রয়াস। কিন্তু ঐক্যপ্রচেষ্টা শুধু আবেগ দিয়ে সার্থক হয় না, আইনও সেখানে কার্যকরী নয়। সেখানে "যাহারা এক হইবার নয় তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায়— তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। ইউরোপের ইতিহাস লক্ষ করে বলছেন রবীন্দ্রনাথ যে সেখানে রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি সব কিছুই জোর করে সম্বন্ধস্থাপনের ঘটনা; ফলে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ নেমে এসেছে প্রলয়ের পথ ধরে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐক্যবন্ধ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের মতো সর্বদাই শক্তির প্রতিযোগিতায় সমস্ত জীবনাচরণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি, সেখানে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা দেয়নি। ভারতবর্ষে ঐক্যবন্ধন ঘটেছিল স্বতন্ত্র পথে। "ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়াসমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্রকর্মের উপযোগী করিয়াছিল, নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই।....ঐক্য নির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে এই লক্ষ্যকে নির্ণয় করেছেন। যুগযুগান্ত থেকে বহুবিচিত্র মানুষের পদক্ষেপ যে ঘেটেছে ভারতবর্ষের মাটিতে, কিন্তু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐক্যসম্বন্ধযুক্ত সভ্যতা বিরোধ ডেকে আনেনি। তার ভিত্তিমূলে রয়েছে গভীর সহনশীলতা, আয় অনার্য কেউই অনাদৃত হয়নি। কিন্তু এই স্বীকৃতিতে যথেচ্ছাচারও ঘটেনি পশুসমাজের মতো। ভারতবর্ষের অন্তরাস্থিত শৃঙ্খলার বিধানে 'ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইউরোপীয় জীবনাচরণ এই শৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত নয়; বহিরাগত দূরের কথা, নিজেদেরই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে তারা যথোচিত স্থান দিতে পারেনি। এমনকি অনেক দেশেই পদার্পণ করে ইউরোপ সেখানকার সভ্যতাকে প্রচন্ড আঘাত করে নিজেদের সমাজে মুখরক্ষা করতে চেয়েছে। ভারতবর্ষ পরকে বিতাড়ন করেনি, তার সভ্যতাসংস্কৃতিকে বিনষ্ট করেনি, শৃঙ্খলার

মধ্য দিয়ে নিজের জীবনাচরণের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস রেখেছে। সুসংহতভাবে মনুষ্যত্বকে ধারণ করাই ধর্ম, সেইটিই মানবসভ্যতার লক্ষণ, সেই প্রেক্ষাপটেই ভারতবর্ষে মানবমনের পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপনের প্রণালী গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে, এই কর্মসাধন সম্ভব নয়। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'—গৌরবময় ভারতবর্ষের মহৎ প্রতিভাই এ কাজের যোগ্য। সাকার নিরাকার দুই উপলব্ধি সে ধারণ করে আছে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরও বীভৎস সামগ্রী অন্তরে গ্রহণ করে তাকেও আধ্যাত্মিক মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। বর্জন নয়, গ্রহণেই ভারত-আত্মার তৃপ্তি।

ইতিহাস পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে সমাজব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি আবার ধর্মনীতিতেও সেই একই অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধন দেখা গেছে। ইউরোপের রিলিজিয়ন শব্দের যে অর্থে ব্যবহার ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেনি। সেখানকার জীবনের সামগ্রিক রূপকে গ্রহণ করাই তার ধর্ম। ইউরোপের মতো তা 'পোষাকি' ও 'আটপৌরে' রূপে দ্বিখণ্ডিত নয়। পরিহাস করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন—'হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গীর্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই।" ধর্মকে তিনি বলছেন—'মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতি।" নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে মিলনের আদর্শকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করানোই ইতিহাসের কাজ, তার মধ্য দিয়েই বহুর মধ্যে একক অনুভব করার শক্তি নিয়ে অতীত থেকে বর্তমান এক নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে, যোগসূত্রটি অব্যাহত থাকবে। বিদেশের শিক্ষায় এই ধারাবাহিকতা নেই। কিন্তু না থকলেও একটি মহৎ অভিপ্রায় সেখানে আত্মগোপন করে আছে। বিচ্ছেদ না থাকলে মিলনে পূর্ণতা আসে না। বিদেশের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের শিক্ষাবিধির মধ্যে সংযোগ ছোট করতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে স্বদেশের সঙ্গে এক গভীর প্রীতির বন্ধন।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এখন আমরা সেইরকম ইতিহাসবিদ চাই যিনি দিগ্বিজয়ীর জয়ের বার্তার পরিবর্তে এক অখণ্ড ভারতবর্ষকে তুলে ধরবেন তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিয়ে। প্রয়োজনে কঠোর তিরস্কারে আমাদের জাতীয় চরিত্রের হীনমন্যতা দূরে নিক্ষেপ করে, উদ্ভাসিত করবেন বৈরাগ্য কঠিন প্রাচীন ভারতের উজ্জ্বল মাহাত্ম্যকে। সেই পথে বাণিজ্য নেই, শিক্ষার আড়ম্বর নেই, কিন্তু প্রাচীন সম্পদ নিয়ে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, সেই ভারতকে আমাদের জানতে হবে এবং জানাতে হবে। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে মানুষের গ্রহণ করার অধিকার তখনই হয়, যখন তার দেবার মতো সম্পদও থাকে। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবসত্তাকে উন্মোচিত করে তাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য ঐতিহাসিকের কাছে তিনি একান্ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ইংরাজের জ্ঞানবুদ্ধির যে বিপুল অহংকার, তার দ্বারা ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করা যায় না, কারণ সেখানে আত্মম্ভরিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘোর অশ্রদ্ধা। এ যেন নিঃস্ব ভারতবাসীকে ভিক্ষাদান, তাদের সমতুল্য কেউ নেই, সুতরাং তাদের দানের প্রতিদান সম্ভব নয় এমন অবমাননার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সন্তান বড় হচ্ছে। কিন্তু ইংরাজসন্তানের শিক্ষাবিধি তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। তাদের শিক্ষা নিছক পুঁথিগত নয়, "তাহারা আলোক আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাদের সুদূর কালের সম্বন্ধ নহে।" কিন্তু এখানে সবই বিপরীত ধারায় চলে। সেই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও যদি কোনো ভারতসন্তান কিছু শিক্ষা পেয়ে তাকে ব্যবহার করতে পারে, তবে সেটি তার নিজের ক্ষমতার দ্বারাই লভ্য হয়েছে।

এই অসম্মান থেকে বাঁচতে হলে শিক্ষাদানকে বিদেশীর হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। শিশুকাল থেকে হৃদয়ের শ্রদ্ধার ভালবাসার শিকড় স্বদেশের প্রেক্ষাপটে বিস্তার করতে হবে। প্রত্যেক দেশের একটি স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, সেই অভিরুচি নিয়েই সেই দেশের মানুষ গড়ে ওঠে। এমনই ভাবে ভারতবর্ষ তার সন্তানদের প্রকৃতি গঠন

করেছে। বিদেশীর দ্বারে ভিক্ষা করলে সেই স্বভাবে বিকৃতি আসবে। সুতরাং সে পথে না গিয়ে ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, তার সুপ্রাচীন আদর্শকে সম্মান জানিয়ে নিজেকে পূর্ণ পরিণতরূপে গঠন করতে পারলে তবেই বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করার অধিকার জন্মায় এবং নিজেরটিও তাকে দান করা যায়। আদানপ্রদানে কোনো লজ্জা নেই, অবমাননা নেই, অসম্মান নেই।

এই শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন নিঃসার্থ "অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।" এই শিক্ষাগুরু অনেকেই ছিলেন, তাঁদের ধনদৌলতের স্পৃহা ছিল না। সমাজে তাঁরা মানী ব্যক্তি ছিলেন। এখনো এমন শিক্ষক অনেকেই আছেন। কিন্তু শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি ব্যাকরণ, স্মৃতি ন্যায়ের পাঠকে বর্জন করেছে। বিদ্যাদানের মহান গৌরব এখনো পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তবুও রবীন্দ্রনাথ আসাবাদী। তিনি মনে করেন শিক্ষাজগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে এমন কিছু মানুষ আসবেন যাঁরা ইংরাজদের শিক্ষাবিধিকে অনুকরণ করবে না। তাঁরা "বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া মনে করিবেন।" প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে তাদের জীবনযাত্রা হবে সরল, চিন্তাধারা হবে নির্মল ও পবিত্র। তাদের শিক্ষা আধুনিক ভাবনাকে অস্বীকার করবে না, সেখানে বিদেশী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর শাসনের পরিবর্তে স্বাধীন দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠবে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, "ইংরাজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতরো জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারবে.....।"

৪.২ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্যশিক্ষার স্পর্শ বাঙালি সমাজমানসে যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানকে জানার সচেতনতা নিয়ে এসেছিল নিঃসন্দেহে। সেই সূত্রেই এসেছিল ইতিহাস অন্বেষণের বিরাট কৌতূহল। বাঙালির ইতিহাসচর্চার প্রথম মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যার পটভূমিকায় ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন। তাছাড়াও ডিরোজিও শিষ্যরা, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ইতিহাসচিন্তা করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত একটি বিষয়ও ছিল ইতিহাস; কিন্তু সে ইতিহাস মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা রচনা করলেও, তা ভারতবাসীর নিজস্ব ইতিহাস হয়নি। দেশপ্রীতি এবং নিজস্বগবেষণার প্রেক্ষাপটে যারা প্রথম ভারত-ইতিহাস সন্ধান করলেন, তাঁদের অন্যতম রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষীরা। সেইসঙ্গে উপন্যাস, কাব্য নাটকেও প্রতিফলিত হল ভারতগৌরবের বহুমুখী কাহিনী। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং আরও অনেকের সাহিত্যকর্ম।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাঁর পরিবারের মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির একটা স্থির দৃপ্ত উজ্জ্বল শিক্ষা ছিল, এবং সেই আলোর অনুপ্রেরণা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা ভারতগৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল খুব অল্পবয়সে। অক্ষয়কুমার মৈত্রর সম্পাদনায় ১৮৯৯ সালে রাজশাহী থেকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রিমাসিক পত্রিকাকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন "আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনীশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে, এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটা স্বাভাবিক ফল"। ভাদ্র ১৩০৫ সালে ভারতী পত্রিকায় এই রচনাটি প্রকাশের বিবরণ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' (২য়) গ্রন্থে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এটি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্গত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'ঝাঁসীর রানী' ১২৮৪ (১৮৭৭) সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ কালে লিখেছিলেন। রবিজীবনীতে (১ম খন্ড) জীবনীকার প্রশান্ত পাল অনুমান করেছেন যে সেই কালেই প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভা ও রজনীকান্ত গুপ্তর জানুয়ারী ১৮৭৭ থেকে খন্ডাকারে প্রকাশিত "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছল। ভারতী পত্রিকার এই প্রবন্ধটির

শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি।' কিন্তু এক নির্ভীক বলিষ্ঠ মনোভাব এবং তীব্র স্বদেশপ্রীতি প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। সিপাহীযুদ্ধের কালে ঝাঁসীর রাণীর লক্ষ্মীবাই সহ অনেক রাজপুত মারাঠা বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন, কিন্তু আত্মাভিমানী ইংরেজ শাসক তা করেননি। উপরন্তু তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অমর্যাদাকর মনে হয়েছিল। প্রবন্ধটির উপকরণ সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলেছেন "বিদেশীয়দের পক্ষপাতি ইতিহাস"। আশ্চর্যের বিষয় 'দিল্লি দরবার' কবিতাটি রাজরোষের আশংকায় প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এই প্রবন্ধটি বিনা বাধাতেই প্রকাশ করেছিল। মনে করা অসঙ্গত নয় যে নিজের স্বদেশগৌরবকে হৃদয়ে ধারণ করেই রবীন্দ্রনাথ পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশী লিখিত ইতিহাসের প্রতি ভরসা করেননি এবং ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাস রচনা করার দায়বদ্ধতায় ঐতিহাসিকদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তা না করলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক তথ্যই অজানা থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার প্রাথমিক ভূমিকা হিসাবে প্রবন্ধটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতকে পর্যবেক্ষণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কাল থেকে কালান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। তিনি বারবার বলেছেন যে ভারতবর্ষের অন্তরনিহিত যথার্থ রূপ রাষ্ট্রনৈতিক উত্থানপতনের ইতিহাসে নিহিত নয়। এই প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম যে ভারতবর্ষকে জানতে হলে রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়া বাদ দিয়ে তার সামাজিক পরিমণ্ডলকে উপলব্ধি করতে হবে। সেখানেই ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণতা। পাঠান মুঘলের দ্বন্দ্বের বাইরেও অনেক চিন্তাবিদ মনীষী এসেছিলেন সেই যুগে। মধ্যযুগের বিদেশী অনুপ্রবেশের আঘাতে জাতীয় চরিত্রে যে শিথিলতা এসেছিল, সেইখানেই তাঁরা আঘাত দিয়ে ভারতবর্ষের যথার্থ মর্মস্থানটি উদঘাটন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ভাবনার মধ্য দিয়ে "প্রকৃত ভারতবর্ষের যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।" তাই রবীন্দ্রনাথের সমাধানসূত্র ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধান করা, যার দ্বারা "দেশের মূল মর্মস্থানটি" খুঁজে নিতে হয়।

আধুনিকযুগে জনজীবনকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনার যে বিপুল প্রচেষ্টা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে সেই সমাজসত্তাকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, যে সমাজ বহু সঙ্কটের মধ্যেও নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করেছে। এই রূপ রচনাতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস যথার্থ রূপে প্রতিভাত হবে—এইটাই রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। ১৯১০ সালে লেখা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ আর্য-অনার্য সংঘর্ষের কথা দিয়ে আরম্ভ করলেও মূলতঃ ভারতীয় সমাজবিবর্তনের চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। সেখানে রয়েছে এক মিশনের ইঙ্গিত। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখছেন, তখন ভারতবর্ষ ইংরাজের পদানত। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার মূলসূত্রটি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানচ্যুত হয়েছিল। সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ সচেতন করতে চেয়েছেন। তিনি অখণ্ড ঐক্য সমন্বিত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করতে হলে সেই ঐক্যকে উপলব্ধি করার শিক্ষা নেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয়সাধনই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। তিনি অনেক গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যথার্থ ইতিহাসবিদকে আহ্বান জানিয়েছেন, যিনি ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যে কোনো সভ্যতার স্বরূপকে অনুধাবন করতে পারেন। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ যে কালে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই সময়ে স্বদেশচেতনার ঔজ্জ্বল্যে ভারতবাসী বিশেষভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং ভারতের রাষ্ট্রগৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ভারত-আত্মার স্বরূপকে না জানলে শুধু বহিরঙ্গের উন্মাদনায় স্বদেশের উপলব্ধি স্থায়ী হয় না। যে ইতিহাসকে দেশের ইতিহাস বলে জানানো হয়, সেখানে স্বদেশ নেই। সেখানে লেখা হয় মুঘল পাঠানের রণসজ্জা, তাদের জীবনের বিলাস-বৈভব। নানা আলোছায়ার

মোহ— "তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে— সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র মুখস্থ করিয়া লয়।" অত্যত বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাসকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্যই তাঁর আন্তরিক আবেদন ইতিহাসবিদের কাছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির এক প্রথাবহির্ভূত রূপ আমরা দেখতে পাই, সেই রূপ নিছক আবেগমথিত নয়, সেখানে রয়েছে সত্যানুসন্ধানের এক বিপুল প্রয়াস। সেই মহৎ অভিপ্রায় তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন ভারত-সন্তানের হৃদয়ে। সেখান থেকেই প্রকৃত স্বদেশচেতনা জন্ম নেবে। সার্থক হবে তাঁর স্বপ্ন, যে স্বপ্ন থেকে তিনি সকলকে আহবান জানালেন—

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। যুগে যুগে ভারতবর্ষে বহিরাগতদের গ্রহণ করেছে তাদের স্বধর্মে স্থিত থাকার অধিকার গ্রহণ করেনি— কবির চিত্তে

"তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।"

এই বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করে অখণ্ড ভারতবর্ষের ঐক্যভাবনাকে ধারণ করে গড়ে উঠবে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসেই ভারতবর্ষের পরিচয়।

৪.৩ সম্ভাব্য প্রশ্ন ঃ

১। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কোন প্রেক্ষাপট থেকে দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিচার করো।

২। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও ভারতীয় জীনবদর্শনের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন, তার একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করো।

৩। ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস বলতে কী বোঝায়, সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রকাশ করো।

৪। ভারতের ঐতিহ্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথ কার কাছে আহবান জানাচ্ছেন? এই প্রসঙ্গে তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। "দেশের মূল মর্মস্থানটি খুঁজে নিতে হয়"— দেশ বলতে কোন দেশের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন? মূল মর্মস্থান বলতে কী বোঝায়?

২। "তাহারা আলোক আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না"। কোন জাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে অভিমতটি বিচার করো।

৩। "তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে"। প্রসঙ্গ নির্দেস করে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪। তাঁরা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া মনে করিবেন"। কাদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি? তাঁর বক্তব্যের অনুসরণে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। রবীন্দ্রজীবনী (২য়খন্ড)— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
২। রবিজীবনী (১ম খন্ড)— প্রশান্তকুমার পাল।
৩। রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা— ভবতোষ দত্ত।
৪। ইতিহাসের রবীন্দ্রনাথ— মধুছন্দা পালিত।

একক 5 ❑ জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

5.3 রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্ব

5.4 জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়—তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

5.5 অনুশীলনী

5.6 গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমকালে অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন জীবনচরিত লেখার জন্য। সে সম্পর্কে অনেক আলোচনাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যই ছিল জীবেনর স্মৃতি আর জীবনের ইতিহাস এক নয়। মনের পটে অনেক স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, অনেক থাকে অন্ধকারের বিস্মৃতিলোকে। সেই গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসবিকাশের বহু সূত্র রেখে গেছেন জীবনস্মৃতির পাতায়। এই রচনা সম্পর্কে তাঁরমনোভাবও অব্যক্ত রাখেননি। মনের মধ্যে উদ্ভাসিত ছবি যদি বাক্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে পাঠকমনে হুবহু ফুটে উঠতে পারে, তবেই তা হবে সাহিত্যপদবাচ্য— এটি ছিল তাঁর একটি বক্তব্য। তিনি বলছেন— 'ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসেবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।"

৫.২ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

জীবনসৃমতি রচনা সম্পর্কিত তথ্যগুলি নানা লেখকের এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও লেখায় বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে ২৫শে বৈশাখ, ১৪০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে (ষোড়শ খন্ড) সমস্ত তথ্য একত্র সঙ্কলিত হয়েছে। সেই বিবরণ যথাযথরূপে উদ্ধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক জীবনী বা জীবনবৃত্তান্ত লেখেননি এই তথ্য সঙ্কলনে নানাভাবেই তার সমর্থন রয়েছে।

গ্রন্থ হিসেবে মুদ্রিত হবার আগে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত।

প্রচলিত রীতিতে আত্মজীবনী লেখার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কুণ্ঠা ছিল, 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ (দ্র রচনাবলী ১০ পৃ ৩৭৪-৭৬) বা 'উৎসর্গ' বাহির হইতে দেখো না এমন করে' কবিতা (দে রচনাবলী ২, পৃ ৮০-৮১) কিংবা 'পশ্চিমযাত্রীর ড়ায়ারি' র এই মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। 'অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃতচরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী।' (রচনাবলী ১২, পৃ ২১৯)। 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হয়ে যাবারও অনেক পরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে এইরকম একটি সংলাপ হয়েছিল তাঁর— প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন—

আমি। কবির জীবন-চরিত জিনিষটা কি লেখা সম্ভবপর?

কবি। ঠিক হয় না। বাইরের ঘটনার কথা বলা যায়, কিন্তু আসলে কখন্ কোন্‌টা কেন হলো বলা শক্ত। বলা যায়ও না।

আমি। আচ্ছা, আজ যদি কালিদাসের নিজের autobiography হঠাৎ আবিষ্কার হতো, আপনার কি পড়বার ইচ্ছা হতো না।

কবি। হতো না? অবিশ্যি লুকে নিয়ে পড়তুম।

আমি। আপনার নিজের autobiography একটা লিখে রেখে যাওয়া উচিত। আমরা কেউ দেখবো না— ৫০ বছর পরে বা ১০০ বছর পরে যেটা খোলা হবে। যদি লেখেন তো আপনার সবচেয়ে বড়ো লেখা হবে এইটা। তা ছাড়া আপনার কথা কেউ লিখতে পারবে না। এতো complex— আপনার নিজের কথা শুধু আপনি একা লিখতে পারেন। প্রকাণ্ড বড়ো একটা drama হতে পারে।

— মঙ্গলবার, ৯ আগস্ট ১৯৩২, 'দিনলিপি', 'রবীন্দ্রবীক্ষা ২৮, পৃ ৭৮

'জীবনস্মৃতি' রচনার আগেও অন্তত তিনবার রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত আত্মকথা লেখেন। একটি ১৩১১ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য (দ্র আত্মপরিচয়; রচনাবলী ১১, পৃ ১২৫-৩৬) নিয়োগীকে যে 'জীবন ও রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে' তিনি লিখে দিয়েছিলেন, রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'আত্মপরিচয়' এর পরিশেষে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে তা মুদ্রিত আছে। অন্য চিঠিটি ভুবনমোহন রায়-সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩০২ সংখ্যায় 'রবি বাবুর পত্র' নামে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে।

রবি বাবুর পত্র

শ্রাবন মাসের 'সখা ও সাথী' তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাল্য-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দুই একটি ভ্রম দেখাইয়া রবীন্দ্র বাবু আমাদের যে চিঠি লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিণ্ডদানের পরিবর্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতিভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগেভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সৎকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রপাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ এখনো আমা জীবন আমরাই হস্তে আছে; আশাকরি, আরও কিছুকাল থাকিবে, যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ কবি তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাহার ধর্ম্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্য-বিবরণ লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া গিয়াছেলিন, তখন তাহার গুরুত্ব মি উপলব্ধি করিতে পারি নাই— এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।

কিন্তু তাহা লইয়া অধিক পরিতাপ করিতে বসিলে অবিনয় প্রকাশ করা হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের দুই একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, সেইখানে বঙ্কিমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় কন্যা-কর্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইতে আসিলে তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না— এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই।

২। ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন; আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।

৩। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন উপাধি দেওয়া হইয়াছে; নিশ্চয়ই সেটা বিস্মৃতিবশতঃই ঘটিয়াছে।

৪। অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া প্রভূত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম সে কথা যথার্থ।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

১৩১৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে মীরা দেবীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা (করে) তাঁদের শোনাই—দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে—কোনো দিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে—আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্—ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। আমার ত এই মুস্কিল অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।

—চিঠিপত্র ৪, পৃ ২১

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের আত্মকথাটি লিখবার সময় (১৩১১) থেকে উদ্ধৃত এই চিঠির কাল (১৩১৭) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনচরিত' লিখবার কিছু কিছু আয়োজন করেছেন বলে অনুমান করা যায়। 'রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম এবং' গ্রন্থে প্রতাপকুমার মুখোপাধ্যায় যামিনীকান্ত সেনের একটি লেখার উল্লেখ করেছেন। সেই লেখায় দাবি করা আছে যে যামিনীকান্তই 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি প্রথম পড়েন ১৩১৩ বঙ্গাব্দে :

". . . আপনি যদি আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখেন, তবে আপনার কবিতার রসভোগের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে।" তিনি এ কথা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন এবং আমার সহিত একমত হলেন, মনে হ'ল।

এর কিছুকাল পরে তিনি আমাকে হস্তলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি দিলেন পাঠ করতে। এটিই হচ্ছে তাঁর জীবন-স্মৃতি। এটা হ'ল ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা।

'জীবনস্মৃতি'র যে একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, এ হয়তো তেমনই এক প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি। কয়েক বছর পর, ১৩১৮-র ২৩ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সীতা দেবী লিখেছেন:

. . . তিনি বলিলেন, 'তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, সেটা তোমাদের বেশি interesting লাগবে। আমার লেখা 'জীবনস্মৃতি' তোমাদের পড়ে শোনাই।'

সকলে মহোৎসাহে 'জীবনস্মৃতি' শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। সেদিন 'জীবনস্মৃতি'র অনেকখানিই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল।

—'পুণ্যস্মৃতি', প ১৬

এর পর ২৫ বৈশাখেও খানিকটা অংশ পড়া হয়েছিল।

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ'-বিষয়ক তাঁর আলোচনাতেও (২৪ বৈশাখ ১৩১৮) পাণ্ডুলিপি থেকে কোনো কোনো অংশ ব্যবহার করেন। এর কয়েকদিন পরই লেখাটি প্রকাশ করবার স্বাভাবিক প্রস্তাব আসে 'প্রবাসী'র পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের দুটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

১. বাঃ তুমি তো বেশ লোক। একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও। এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হবে। সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত হয় তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠ্‌চ।

যতদিন বেঁচে আছি জীবনটা থাক্ তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই . . . ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

—চিঠিপত্র ১৪, পৃ ৩৪

২. আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই"—এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাক্‌ত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাক্‌বে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচি নে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and white-এ আমার জীবনটার একগালে চুন ও একগালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও সাদাচুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুল্‌তে পারে না। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

—তদেব, পৃ ৩৫-৩৬

সম্ভবত এই চিঠির পরই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অনুরোধ তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছয়। রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

১. আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফঃস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

—চিঠিপত্র ১২, পৃ ৬-৭

২. জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। . . .

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে।

যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

— তদেব, পৃ ৮-৯

একই তারিখে লিখলেন চারুচন্দ্রকে (চিঠিপত্র ১৪, পৃ ৪১) : 'তোমার হাতের জীবন সমর্পন করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি।' এবং তার কয়েকদিন পর আবার :

১. জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্ব্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ— জিনিসটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি— অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি— আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্তু আপরিতোষাদ্‌ বিদুষাং ইত্যাদি। জুন ১৯১১

— চিঠিপত্র ১৪, পৃ ৪৩

২. কবিকে (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) আমার কবিজীবনটা পড়িতে দিয়ো। সে ত সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল— অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

— তদেব, পৃ ৪৬

৩. জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি— ওটাও সাফসোফ করে দিচ্চি— খুব মনোযোগ করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে— নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২৯ আষাঢ় ১৩১৮

— তদেব, পৃ ৪৮

মুদ্রণকাজ চলার সময়েও কেবলই যে পরিবর্তন চলছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কোনো কোনো চিঠিতে তার ইঙ্গিত আছে।

১. জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন। কেননা কিছু কিছু বাড়ানো চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— আর ২০/২২ দিন লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি "জীবনস্মৃতি"র সমস্ত কপি আমার কাছে রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপরে তুলির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। ৮ ফাল্গুন ১৩১৮

— চিঠিপত্র ১২, পৃ ১৯

২. যদি এবারকার জীবনস্মৃতির ফাইল প্রস্তুত না হইয়া থাকে তবে অসংশোধিত প্রুফ পাইলেও চলিবে। অমনি আষাঢ়ের কাপি পাঠাইবেন, হয় তা কিছু যোগ করিতে হইবে। ১৯১২

— তদেব, পৃ ২১

৩. "জীবনস্মৃতি"র শেষযের কথাগুলা মোটমুটিভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? ১৩ ফাল্গুন ১৩১৮

— চিঠিপত্র ১২, পৃ ২৩

প্রিয়ম্বদা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ

আমার যেটুকু বলবার আছে, জীবনস্মৃতিতে বলেছি— বই আকারে ছাপবার সময় আরো কিছু কিছু যোগ করে দেওয়া যাবে। ২৫ ফাল্গুন ১৩১৮

— রবীন্দ্রবীক্ষা ২৭, পৃ ১৪

উদ্ধৃত চিঠিগুলির একটিতে চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন 'ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি'। মুদ্রিত ভূমিকাংশটির পরিবর্তে 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম এবং দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই দুই সূচনা দেখা যায়।

প্রথম পাণ্ডুলিপি

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন রিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বলিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়— কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তংহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয় — কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে— আবার জীবনের কথা কেন।

এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধসত্ত্বেও নিজের জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়িয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া যায়— দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।

ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও দুটো একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সময় জীবনের অন্তর্গত।

কর্মবীরদের জীবন কর্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম তাঁহাদের জীবনকে গঠিত করে। আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে— বর্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব। আজ এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে ১৮৯৪ সালে লিখিত এই ক'টি হঠাৎ চোখে পড়িল—

'আমি আমার সৌন্দর্য উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ়বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতে অন্তর্জগৎ, জীবনের অর্ন্তজীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।'

এইরকমে পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মতো একত্রে রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু তেমন করিয়া লেখা নিতান্ত সহজ নহে। তেমন জীবনের ছবিও সাহিত্যের পটে আঁকা চলে। কয়েক বৎসর হইল তেমনি করিয়া অতীত জীবনের কথা কয়েক পাতা লিখিয়াছিলাম।

সময় এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ নাই, ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ করি।

এখন উপস্থিতমত আমার জীবন ও কাব্যকে জড়াইয়া একটা রেখাটানা ছবির আভাসপাত করিয়া যাইবে। যে-সকল পাঠক ভালোবাসিয়া আমার লেখা পড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এটুকুও নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। আমার লেখা যাঁহারা অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন না তাঁহারাও সম্মুখে বর্তমান আছেন কল্পনা করিলে তাঁহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সংকোচে কলম সরিতে চায় না—অতএব এই আত্মপ্রকাশের সময় তাঁহাদিগকে অন্তত মনে মনেও এই সভাক্ষেত্রের অন্তরালে রাখিলাম বলিয়া তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আরম্ভেই একটা কথা বলা আবশ্যক, চিরকালই তারিখ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কাঁচা। জীবনের বড়ো বড়ো ঘটনারও সন-তারিখ আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না; আমার এই অসামান্য বিস্মরণশক্তি নিকটের ঘটনা এবং দূরের ঘটনা, ছোটো ঘটনা এবং বড়ো ঘটনা সর্বত্রই সমান অপক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আমার এই বর্তমান রচনাটিতে সুরের ঠিকানা যদিবা থাকে তালের ঠিকানা না থাকিতেও পারে।

প্রথমে আমার রাশিচক্র ও জন্মকালটি ঠিকুজি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

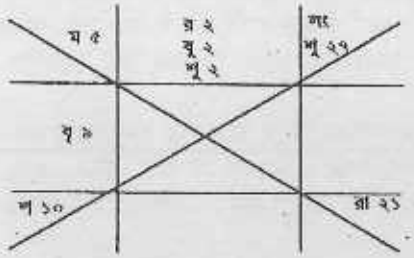

১৭৮৩ । ০ । ২৪ । ৫৩ । ১৭ । ৩০

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সোমবার

ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে আমার জন্ম হয়। ইহার পর হইতে সন-তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। যেখানে ফাঁক ছিল না সেখানেও হয়তো ফাঁক পড়িয়াছে, যেখানে ফাঁক ছিল সেখানটাও হয়তো ভরা দেখাইতেছে। পৃথিবীর স্তর যেরূপ পর্যায়ে সৃষ্ট হইয়াছিল আজ সর্বত্র সেরূপ পর্যায়ে সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, অনেক স্থানে উলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার স্মৃতিতে জীবনের স্তরপর্যায় আজ হয়তো সকল জায়গায় ঠিক পরে পরে প্রকাশ পাইতেছে না, কোথাও হয়তো আগেকার কথা পরে, পরের কথা আগে আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহাকে জীবনের পুনরাবৃত্ত বলা চলে না—ইহা স্মৃতির ছবি। ইহার মধ্যে অত্যন্ত যথাযথ সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করিবেন না—অতীত জীবন মনের মধ্যে যে-রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে এই লেখায় সেই মূর্তিটি দেখা যাইবে।

নিজেকে নিজের বাহিরে দেখিবার একটা বয়স আছে। সেই বয়সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজের জীবনক্ষেত্র নিজের কাছে অপরাহ্নের আলোকে ছবির মতো দেখা দেয়। অন্যান্য নানা ছবির মতো সেই আপন

জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোনো শ্রী থাকে না। সেইজন্য আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র, অর্থাৎ তাহা আমার লেখক জীবনের ধারা।

এই ধারাটিকে আমার স্মৃতির দ্বারা অনুসরণ করিয়াছিলাম— সন্ধান-সংগ্রহ বিচারের দ্বারা নহে। এইজন্য, একটা গল্পমাত্রের যেটুকু গুরুত্ব ইহাতে তাহার বেশি গুরুত্ব নাই।

এই কারণেই সম্পাদক মহাশয় যখন এই লেখাটিকে বাহির করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন তখন এই কথা মনে করিয়াই সংকোচ পরিহার করিলাম যে, আমারই জীবন বলিয়া ইহার গৌরব নহে, কোনো মানবজীবনের ছবি বলিয়া সাহিত্যে ইহা স্থান দাবি করিতে পারে— সে দাবি অসংগত হইতে ডিস্‌মিস হইতে বিলম্ব হইবে না।

ইহার মধ্যে একটা আশ্বাসের কথা এই যে, যেটুকু লিখিয়াছি তাহা বেশি নহে, তাহা জীবনের আরম্ভ অংশটুকু মাত্র।

প্রথম পাণ্ডুলিপিটির পূর্ণতর পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রবীক্ষা ১৩ শ্রাবন ১৩৯২।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি জন্ম-তারিখ বিষয়ে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখেছিলেন (২৬ বৈশাখ ১৩৪৫)

২৫শে বৈশাখ আমার জন্ম সে-বছরে ইংরেজি পাঁজি মেলাতে গেলে চোখে ঠেকবে ৬ই মে। কিন্তু ইংরেজের অদ্ভুত রীতি-অনুসারে রাত দুপুরের পরে ওদের তারিখ বদল হয়, অতএব সেই গণনায় আমার জন্ম ৭ই।— তর্কের শেষ এখানেই নয়, গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্তে বাংলা পাঁজির দিন ইংরেজি পাঁজির সঙ্গে তাল রেখে চলবে না— ওরা প্রাগ্রসর জাত, পঁচিশে বৈশাখকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে— কয়েক বছর ধরে হল ৭ই, তারপরে দাঁড়িয়েছে ৮ই।

— প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ১৯৬

'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে, নানা সময়ের স্মৃতিচর্চায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বৃত্তান্ত কখনো কখনো বলেছো। শিলং-এ নিরাবণচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে কথোপকথন-কালে অবশ্য আত্মচরিত লেখার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে আরো একবার মন্তব্য করেছিলেন (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)। নিবারণচন্দ্র লিখেছেন;

জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনার জীবনস্মৃতি কি আবার লেখা হচ্ছে? ....কবিবর ..., 'না....ওটা হয় না। আমরা গল্প লিখতে পারি, একটা চরিত্র বানিয়ে তোলা যায়, কিন্তু ..... আপনাকে Objectify ক'রে আত্মচরিত লেখা বড়ই শক্ত। কত স্তরে স্তরে যে আমার 'আমিত্ব' ডুবে আছে, তাকে টেনে তোলা অসম্ভব। জীবন-চরিত লেখকই বা অপরের জীবনের কতটুকু দেখতে পান যে, তিনি যথাযথভাবে 'চরিত'টা আঁকবেন? জীবন-চরিত লেখা (তা স্ব-রচিতই হোক্ বা অপরের রচিতই হোক্) দুইই অসম্ভব। "আমি বললাম— "আমার 'স্মৃতি-পথে'টা এইভাবে লিখেছি যে, যাঁর সংস্পর্শে যতটুকু এসেছি তাঁর বিষয় মাত্র সেটুকুই লিখেছি, বেশী কিছু লিখতে চেষ্টা করিনি .... Bertrand Russell এর Behaviouristic Philosophy অনুসরণ ক'রে"..... কবিবর ...." এই ঠিক করেছেন ... আপনার 'বইটে' পড়ে দেখ্‌ব। বিপিনবাবু (বাবু বিপিনচন্দ্র পাল) তাঁর জীবন-কথা লিখ্‌ছেন। আপনাকে জানাই তা শক্ত কথা। বাহ্য-ব্যবহার দেখে অপর মানুষকে কতটা জানা যায়?"

— রবীন্দ্রনাথ সহিত কথোপকথন, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ ৬৫৮-৫৯

ক্ষিতিমোহন সেনের 'দিনলিপি'তে দেখা যায়, কথোপকথন কালে কিছুটা জীবনকথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

আহমেদাবাদ শহরে একটি ঘরোয়া সভায় রবীন্দ্রনাথকে একজন প্রশ্ন করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠাইয়াও আপনার পিতা মেন করিয়া আপনাদের এমন জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন? সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই দিতে পারা যাইবে।

গুরুদেব। মেজদাদা ছাড়া আর কাউকেই পিতৃদেব বাইরে পড়াতে পাঠাননি। আমাদের বাড়িটাকেই তিনি যথার্থ বিদ্যালয় করে তুললেন। যদিও দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য আমাদের পরিবারে কিছু আর রইল না, তবু সাংসারিক ব্যয় যথাসম্ভব সংকুচিত করে পিতৃদেব জ্ঞানী ও গুণীদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখলেন। নিয়ত তাঁদের সমাগমে এই বাড়ির আবহাওয়া চিন্ময় হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সৎকারে পিতৃদেব যেরূপ অকুণ্ঠিত ভাবে ব্যয় করেছেন, তেমনভাবে ব্যয় করতে অনেক রাজা মহারাজাও পারেননি। এই আবহাওয়া এবং গুণীজনের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগে আমাদের শিক্ষা।

আমাদের বাড়িভরা লোক তখন গম গম করত। আপন পর অতিথি অভ্যাগত সবারই সেখানে স্থান রয়েছে। সকলকে আমার চিনিও না। অভ্যাগতমাত্রেই দ্বারে এলে আতিথ্য পেতেন। তাঁদের জন্য পান তামাক খাবার যথা সময়েই হাজির হত।

এদিকে সমাজে আমরা ছিলাম কতকটা একঘরের মতো। তাই লোকাচার ও সামাজিক শাসন আমাদের উপর কম ছিল। আমরা অনেকটা স্বাধীনভাবে চলতে পেরেছি।

রাজনারায়ণ বসুর জুড়িদার ছিলেন আমার দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। একাধারে তিনি কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক ও ছেলেমানুষ। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রভৃতি কবিতার অজস্রতা বাড়ি ভাসিয়ে দিত আর তার তরঙ্গে বাড়ি কেঁপে উঠত।

এরই সঙ্গে ঝি-দের মহলে চলেছে উপকথা রূপকথার ধারা, ভৃত্যদের মধ্যে চলেছে পাঁচালী, রামাণ, বাউল এবং কীর্তন। মেয়েদের মহলে দেখা যেত কাঁথা ও নানা কলায় শিল্প রচনার কাজ। ছেলেদের মধ্যে চলেছে সাহিত্য সংগীত অভিনয় ছবি আঁকা প্রভৃতি, অভিনয়ের জন্য সংস্কৃত থেকে নাটক অনুবাদ। বাংলা নাটকও লেখা চলছে। এই সব সাধনা ও আনন্দের কেন্দ্রস্থলে বসে আছে পিতৃদেব তাঁর নিশব্দ ধ্যানাসনে।.....

নানা তীর্থে, দেবালয়ে দেখা যায় মন্দিরের চারিদিকে থাকে নানা মূর্তি ও সংসারলীলার ছবি, কিন্তু ভিতরে থাকে দেবতার স্তব্ধবেদী। জোড়াসাঁকোর বাড়ির চারিদিকে যদিও সর্বদাই চলেছি শিল্পকলা, সাহিত্যে সদাসচেষ্ট লীলা কিন্তু তার কেন্দ্রস্থলে ছিল সর্বরূপের অতীত রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য ধ্যানের স্তব্ধ সাধনাসন। আমাদের পৈত্রিক সংসার ছিল দেবমন্দিরের, মতো মহনীয়। সেই দেবমন্দিরেই আমাদের জ্ঞানদীক্ষা। সারা জগতে আমার পিতৃদেব যে আলোক দান করেছেন তার মূলেও ছিল এই গৃহেরই চিন্ময় সাধনা। দুইপুলওয়ালা পাড়া এই নামে কেন হয়েছিল তার ইতিহাস আমরা শুনেছিলাম বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। দ্বারকানাথ ও মহর্ষির নামে এই বাড়ির খ্যাতি পূর্বে লোকমুখে চলিত ছিল না। কলকাতার এই অঞ্চলে অনেক জেলেদের বাস ছিল। তাদের প্রধান মাছের বাজার ছিল এ অঞ্চলে, তাই নাম হয় মেছোবাজার এবং ঠাকুরবাড়ি। পাড়ার নাম হয় জোড়াসাঁকো। এইদিকের কলকাতায় চলাচলের রাস্তা খুবি কম ছিল। চিৎপুর সড়ক যখন নির্মিত হয় তখন উত্তর-দক্ষিণে চলাচলের এইটাই ছিল প্রধান পথ। এরও আগে এই বাড়িতে যাওয়া আসা করতে হত নৌকায় খালপথে। ঠাকুরবাড়ির কাছে খালের উপরে একটি কাঠের পুর ছিল। পরে তার কাছেই আর একটি কাঠের পুল হওয়ায় নাম হয় জোড়াসাঁকো। জোড়াসাঁকো, অর্থাৎ দুই পুলওয়ালা পাড়া। .....

ইংরাজির বন্যায় যখন বাংলা প্লাবিত সে যুগে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে বাংলাকে দৃঢ় করে ধরে রেখেছিলেন। ইংরাজিতে লেখা বলে জামাতার পত্র পর্যন্তও তিনি ফিরিয়ে দিয়াছিলেন। তিনি কি ইংরাজি কিছু কম জানতেন? তাঁর পুত্ররা তাই স্বদেশী বিদেশী কোনো ভাষাতেই কম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। শুধু মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন বলে বিদ্যালয় ছাড়াও সকলে যথার্থ বিদ্যালাভ করেছিলেন।

রূপকথা হল সত্যই রূপ-কথা, অর্থাৎ কথার রং দিয়া নানা অপরূপ ছবি এঁকে যাওয়া। মনের কাছে ছবির পর ছবি রচিত হয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে চলেছে। অপূর্ব তার সৃষ্টি অপূর্ব তার সরলতা। পাঠ্যপুস্তক ও নোট কণ্ঠস্থ করে বিদ্যার্থীরা আজ মরে শুকিয়ে গিয়েছেন। গল্প বলতে বললে তারা এখন বই দেখে বলেন, এর চেয়ে নীরস আর কী হতে পারে? আসল রূপকথা শিল্পীরাই আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মন তৈয়ারি করে তুলতেন। তাঁরা ছিলেন আসল গুরু। আমাদের বাড়িতে এই সব শিল্পীদের আদর ছিল। ইস্কুল থেকে অল্প পরেই আমি বিদায় নিলাম। এই সব গুরুরাই আমাদের গড়ে তুললেন।

আমার আর এক গুরু ছিল আমাদের বাড়ির ছাত ও আকাশ। ইস্কুল নেই, মধ্যাহ্নে দূর থেকে দূরের ফিরিওয়ালাদের রকম রকম ডাক ও বাসনওয়ালাদের ঠং ঠং আওয়াজ শোনা যায়। আকাশচিত্রে চিল ওড়ে, তীক্ষ্ণস্বরে চিলের কণ্ঠস্বর। ছাতে ছাতে মেয়েরা বড়ি দেন, আর চেয়ে দেখি চারিদিকের গাছপালা।

রবীন্দ্রসাহিত্যসম্ভারের বিশাল ক্ষেত্রে বিচরণ করতে গিয়ে তার সঠিক উপলব্ধির জন্য সাহিত্যসচেতন পাঠক অনেকটাই আশ্রয় করেন তার নিজস্ব অভিমতকে, তাঁর দৃঢ় বক্তব্যকে। সেই অনুসন্ধানে দেখা যায়, কোথাও রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত কোথাও আবার অতি স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। এমনই এক প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে নানা ঘটনার উপলব্ধিতে, বহু খ্যাত অখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে নিজস্ব এক ব্যক্তিত্ববোধে জাগ্রত হয়ে উঠছেন একটির পর একটি স্তরের মধ্য দিয়ে। সেই স্মৃতিচারণাকেই তিনি চিহ্নিত করেছেন 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) নামে। এক আশ্চর্য নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে নিজের কৈশোর থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত স্মৃতির চিত্রকে তাঁর পরিণতমননের প্রেক্ষাপটে সাজিয়ে তুলেছেন শিল্পীর নিপুণতা দিয়ে। কবিকে তার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না—এ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা। স্মৃতির অন্বেষণ করতে গিয়ে যে ছবি তাঁর মনে জেগেছে তা জীবনী নয় ঠিকই কিন্তু তার প্রতিটি রেখায় যে ঘটনাগুলি ফুটে উঠছে কবির আপনজনরা যেভাবে তাঁর মানসিকতার গঠনকে সবদিক থেকে সাজিয়ে তুলছেন, তা কখনই জীবন বহির্ভূত কল্পনা নয়। তাই 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রজীবনের নানা উদ্ভাসনে উজ্জ্বল, তাঁর জীবনধারার ক্রমাগ্রসরমানতার এক স্পষ্ট চিত্র। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গঠিত এক কবিমনন একটি অপরিণত বালকের কৌতূহলী চোখে দেখা বহিঃ প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি, অতি পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই বালকহৃদয়টির উন্মোচন স্তরে স্তরে অনুভব করা যায়। শিশুমনোরাজ্যে তাঁর অবাধ গতিবিধি জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, যিনি তাঁর সময়ের কোনো লেখককেই তাঁর কঠোর সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করেননি তিনিও 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি উপেক্ষা করতে পারেননি। "কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন। আপনার অতীতকে বর্তমানকালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে, সৌন্দর্যসৃষ্টি আছে, কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

১. 'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩১৯, নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত, 'সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, ১৩৭৭ পৃঃ ৬২

নিজের শিশুকালের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে জোড়াসাঁকোর বাড়ী ও তাঁদের বিশাল পরিবার, উনিশ শতকের খ্যাতনামা বহু মানুষ ও সমাজের চিত্র, তাঁর পরিবারের শিক্ষাবিধি, সঙ্গীতচর্চা তাঁর প্রকৃতি প্রেমের আকুলতা, বাদ যায়নি বাড়ীর পরিচারক পরিচারিকারা—সব কিছুর সমন্বয়ে এক সুসংলগ্ন স্মৃতিচিত্রের সন্ধান পাঠক পেয়েছেন। সেই বৈচিত্র্যবর্ণনায় রয়েছে অসাধারণ পরিমিতিবোধ, আবেগের সংযম আর কৌতুকের আড়ালে আত্মগোপন। উনিশ শতকের মানুষের মধ্যযুগীয় প্রত্যয়বোধে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং সেই উপলব্ধিতে যে অনেক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল, তাকেই নবজাগরণ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের পরিবার স্বতন্ত্র মর্যাদাসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, 'জীবনস্মৃতি' তার একটি মূল্যবান প্রমাণ। আধুনিক যুগে মানুষের জীবনাচরণে, পরিবেশ শব্দটি বিশেষ অর্থবহরূপে দেখা হয়। এখনকার প্রচুর গবেষণাধর্মী কাজের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিকায় পরিবেশের বহুবিচিত্র রূপ ও তার প্রভাবকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সূচনা পর্বটি আরম্ভ হয়েছে তাঁর শিশুকাল থেকে। প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, তার নিবিড় সাহচর্য চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' আলোচনায় সে প্রসঙ্গ বহুবারই এসেছে। কিন্তু একটি শিশুমনের বিকাশে, তাঁর স্মৃতির উল্লেখে যে কথাটি তিনি অব্যক্ত রেখেও অদৃশ্য রেখায় এঁকেছেন, তা এক কথায় মানবজীবনে পরিবেশপ্রভাব। তা সীমাবদ্ধ নয় শুধু বহিঃ প্রকৃতিতে মানবপ্রকৃতিও সেখানে অঙ্গাঙ্গীবদ্ধ। 'জীবনস্মৃতি' লেখার কালে সেই পরিবেশবিস্তৃতির প্রভাব তাঁর সচেতন মন অনুধাবন করেছিল খুব সহজে। বাল্যজীবন লিখতে বসে বলছেন—"জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোনো এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে রঙ তাহার নিজের স্বভাবের.....।" সেই রঙ থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের নানা সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী যেমন যুগচিন্তাকে ধারণ করেছিল, সেইভাবেই সেখানে আরও নতুন সংযোজনের মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল, যা সেই বাড়ীর সন্তানদের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেই বাড়ীতে বসেই শিশু রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল কোলাহলমুখর জনজীবনের অন্তরালে ঘাট বাঁধানো পুকুর, বটগাছ ও তার দক্ষিণে নারকেল গাছের শ্রেণী; কিন্তু সেই শিশু তখনও গন্ডীর বাইরে যাবার অধিকার পায়নি। পেনেটির বাগানবাড়ী প্রথম সেই সুযোগ এনে দিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে কবি দেখেছিলেন গঙ্গার গতিভঙ্গি, কিন্তু "পায়ের শিকল" না কাটায় গ্রামটি ঘুরে দেখা হয়নি। তাঁর জীবনে এক অভাবিত মুহূর্ত এল পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের প্রস্তাবে। সেই যাত্রাপথের প্রথম অভিজ্ঞতা বোলপুরে প্রকৃতির অনাবৃত রূপ দেখা। পিতার সাহচর্যে কিশোর কবি তাঁর বিস্ময়ভরা অনভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখতেন হিমালয়ের অন্তহীন সৌন্দর্যকে। সেইসঙ্গে শিক্ষালাভও হত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে শিশু রবীন্দ্রনাথ স্কুলের চার দেওয়ালের বন্ধ আবহাওয়ায় কোনোদিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তা সত্ত্বেও মহর্ষির সজাগ দৃষ্টি বোধকরি বালকের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেই তার মনের দ্বার খুলে দিয়েছিল; তিনি তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন, সত্যবোধের অঙ্কুরকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিলেন। এইভাবেই অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধবোধের অনুভূতি হয়ে উঠেছে তাঁর চলার পথের মূল আশ্রয়। এক সমগ্রতার চেতনা তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র নানা ঘটনা সেই বিচিত্রমুখী অনুভবের পরিচয়বাহী।

'জীবনস্মৃতি'র শেষ অংশ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনের পঁচিশ বছরের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা। তাঁদের তিনটি বালকের শিক্ষারম্ভ দিয়ে স্মৃতির পাতা খুলেছেন। তার বিবরণ যথাস্থানে। কিন্তু স্কুলের গন্ডীবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুহৃদয় যে কতটা জর্জরিত হয়, এ বেদনা তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর স্বপ্ন ছিল মুক্ত বিহঙ্গের মত প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যের আশ্রয়ে সেই মন বিকাশলাভ করুক। শিশু কবির চিত্ত-উন্মেষের যে ইতিহাস আমরা

পেয়েছি, সেখানে বাধ্যবাধকতার অর্গলমুক্ত হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। গতানুগতিক বাঁধা-পথের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন প্রকৃতির অনন্তবৈচিত্র্যকে, সেইখান থেকেই সৌন্দর্যচেতনার আদি-অন্তহীন রূপানুভূতি প্রোথিত হয়েছিল তাঁর সত্তায়। স্কুলের দরজার বাইরে নিয়ে এসে তাঁকে নানাদিক থেকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজন হয়েছে বাড়ীতে থেকেই, তিনি সাড়াও দিয়েছেন সেই ব্যবস্থায়। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ধ্যানধারণায় একটি সহজাত অনুভূতিপ্রবণ মন কাজ করেছিল নিঃসন্দেহে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা— কি না ছিল তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায়। সব কিছুর মধ্য দিয়ে একটি সক্রিয় ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছিল, তবুও ~~ সচলতার মধ্যেও এক নিভৃতলোকে তাঁর মনের অবস্থান ছিল চিরদিন। তার পরিচয় রয়েছে কবির সারাজীবনের বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যরচনায়। কলকাতার জনারণ্যের মধ্যে অবস্থিত জোড়াসাঁকোর বিশাল বাড়ীতে, এক কোণে নিরালায় খোলা জগতের ক্ষীণ আভাস শিশু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। তারপর পেনেটির বাগানবাড়ীতে গঙ্গার সোভা, সর্বোপরি পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে হিমালয়যাত্রা, সৌন্দর্য-উপলব্ধির এক সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে কবিকে আকণ্ঠ নিমগ্ন করে রাখল।'' হিমালয় থেকে ফিরিয়া আসিবার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল।'' এইবার আরম্ভ হল সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি, যাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের জীবন নানা অভিজ্ঞতার সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের সামনে। সেই রাজপথে ভীড় করেছেন অগণিত মানুষ, কিন্তু শৈশব থেকে আরম্ভ করে তাঁর পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, তাঁদের কেউ হয়েছিলেন দীর্ঘজীবনের সঙ্গী, আবার কেউ অল্পকালের মধ্যে তাঁর স্পর্শকাতর চিত্তে চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের কথাই স্বতন্ত্রভাবে স্থান পেয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়।

শিশুস্বভাবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য থাকে না, সেটি গড়ে ওঠে তার পরিপার্শ্ব থেকে, কারণ সেইখানেই তার নিত্যবিচরণ। মহর্ষি ভবনের পরিমার্জিত জীবনাচরণ, তাঁর পরিবারের কর্মচাঞ্চল্য, সব কিছুর সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবুক কবিমনটি বেরিয়ে এসেছে, 'জীবনস্মৃতি' সে সংবাদও রক্ষা করেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে মানুষের মনের নিভৃতে যে আর একটি সত্তা থাকে, সেই ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে জীবনকে এক গভীর সত্যবোধের দিকে নিয়ে যায়। এই নিভৃতিটুকু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকালেই খুঁজে নিয়েছিলেন, যখন তিনি বাড়ীতে খড়ি আঁকা গন্ডীতে বাঁধা, তবুই খড়খড়ি খুলে সেই শিশু দুচোখ ভরে দেখেছে প্রকৃতির ছোট একটি রূপ। কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিলগ্নে পৌঁছানোর অনেক আগেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন জীবনের আনন্দ।

যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারকে সব দিক থেকে সুস্থ চিন্তায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেখানে ধর্মালোচনা, বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যপাঠ, সংগীতচর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অগোচরেই আরেকটি ধারা বয়ে চলেছিল; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ।'' রবীন্দ্রনাথ আজীবন মানবকল্যাণ সাদনার সংকল্পে স্থির ছিলেন। লোভ, হিংসার পকট আক্রমণ যে মানবসভ্যতাকে বিপর্যস্ত করছে, জীবনের শেষমুহূর্তেও তার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে ভোলেননি। এই মানসিকতার উৎসটি কি খুঁজে পাই না আমরা 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়?

তাঁর মননচর্চার ক্ষেত্রে বিদেশযাত্রার গুরুত্বও কম নয়। প্রথাগত শিক্ষালাভের আশা নিয়ে গেলেও, তা পূর্ণ হয়নি, হলে রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড সত্তা তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আমাদের অভিভূত করত না। তিনি প্রথমাবধিই অত্যন্ত সজাগ মন নিয়ে ইংরেজ-পরিবার, ইংরেজ সমাজকে দেখেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যরীতির যে সুসংগত মিলন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারেই দেখেছিলেন, সেইদিক থে যুরোপীয় জীবনধারা বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি তাঁর মনে। কিন্তু কবির মন তো দেখতে চেয়েছে এক সমগ্র অখন্ড উপলব্ধিকে। 'জীবনস্মৃতি' যখন তিনি লিখছেন, তখন তাঁর সৃজনীপ্রতিভা নিত্যনূতন উদ্ভাসনে অভিনব, সেখানে দুঃখবেদনার নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে বাহিত হয়ে চলেছে আনন্দযজ্ঞের আহবান। কবির অন্তর প্রকৃতির উদঘাটন ও ক্রমবিকাশ সেইসঙ্গে তাঁর চোখে বিশ্ব ও মানবজীবনলীলার বিচিত্র সমারোহ—সব

মিলিয়ে অদৃশ্য চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে আঁকা ছবি। জীবনস্মৃতির চিত্রগুলি দুর্লভ সম্পদ বাংলাসাহিত্যের দরবারে।

'জীবনস্মৃতি'র অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ইতিহাসের অনেক তথ্য, তার আলোচনাও অনেক হয়েছে, তবুও পুনরুক্ত হয় এই কথাটি যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে উনিশ শতকের এমন এক ঐতিহাসিক কালে যখন বিভিন্ন বিতর্কের কোলাহলে সমাজমানস বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। সেই আগুনের তাপ 'জীবনস্মৃতি'তে নেই। আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্হিজগতের নানা আবর্তন বিবর্তনকে আত্মস্থ করে তিনি নিজের মধ্যে একটি নির্জন নিরাসক্ত জীবনবোধ গড়ে তুলেছিলেন। সুরেশ সমাজপতি 'জীবনস্মৃতি'তে কবিত্ব, 'সৌন্দর্যসৃষ্টি', 'কল্পনার লীলা' দেখেছেন। কিন্তু সেই সুখপাঠ্য রচনাটি পরিবেশনের মাধ্যম কি? অবশ্যই বাংলা গদ্যভাষা, যা 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠেছে তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আগেও এক বিরাট কর্মকান্ডের প্রস্তুতি চলেছিল বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সুললিত গদ্যরচনাভঙ্গী যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যভাষার প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষার পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ইতিহাস একটু জানা দরকার 'জীবনস্মৃতি' আলোচনার পরিপ্রেক্ষিকায়।

সাহিত্য পাঠকমাত্রেই জানেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যসৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে অনুবাদ গ্রন্থরচনা ও তথ্যপরিবেশন ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন বাদানুবাদের প্রেক্ষাপটে বাংলা গদ্য তথ্যবিবরণে এক ঋজু ভঙ্গী গ্রহণ করল বিচারে ও বিশ্লেষণে। কিন্তু মনের আবেগ প্রকাশের জন্য বা নিছক মননধর্মী রচনার জন্য গদ্যভাষা গ্রাহ্য হয়নি। তখনকার গদ্যে রসসাহিত্যের অলঙ্কার প্রয়োগ উপযুক্ত ছিল না। বিদ্যাসাগর গদ্যভাষার এই রীতিকে আত্মস্থ করলেও বাংলাভাষার নিজস্ব অভিপ্রায়কে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন, সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করলেন, বাংলাভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করে বাংলাশব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করলেন। মনের ভাবকল্পনাকে ব্যক্ত করার মত উপযুক্ত গদ্যভাষার সম্ভাবনা দেখা ছিল। সুতরাং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ধরলে, বাংলা গদ্যভাষা একদিকে আধাফার্সী, আরেকদিকে ইংরিজী, সেইসঙ্গে সংস্কৃতভাষার ধ্বনিমাধুর্য ও শব্দভান্ডার নিয়ে একটি বিশেষ রূপ নিল। এই গঠনপ্রক্রিয়ার পিছনে ছিল অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষের চিন্তাভাবনা। বিদ্যাসাগর অবলম্বন করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু ইংরাজীভাষার অনুসরণে ছেদচিহ্ন আনলেন, সমাসবাহুল্য বর্জন করলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের দীর্ঘ বাক্যকে ছোট ছোট করে ভাঙলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতের বাহুল্যতা সংহত করে অধিগত করলেন ইংরাজী গদ্যভাষা। সুতরাং বাংলা গদ্যভাষা তার সহজাত নমনীয়তা নিয়ে গ্রহণ করল আধা ফারসী সংস্কৃত ইংরাজী। রবীন্দ্রনাথ সেইসঙ্গে দেখালেন যে বাংলাভাষায় লৌকিক রীতিটিও উপেক্ষার নয়। সুতরাং বাংলা গদ্যভাষা খুব সঙ্গতভাবেই জটিলতার বেড়াজাল ভেঙে কথ্যভঙ্গীর সহজপথে এগিয়ে গেল। কথ্যভঙ্গীর বিচার সাধারণত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দিয়েই করা হয় সাহিত্যক্ষেত্রে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় প্রযোজ্য ক্রিয়াপদই প্রয়োগ করেছেন। এখানে তৎসম শব্দঝঙ্কার রয়েছে, যেমন "তরুশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুইধারে দুই ছবির ঝরণার মত বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে" অথবা বোলপুরে মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লালকাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোটি ছোটি শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী উপনদী রচনা করিয়া বালাখিলাদের দেশের ভূ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। (হিমালয় যাত্রা) এখানে প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত দক্ষতায় সাধুক্রিয়াপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছেন অনেকগুলি নিত্য ব্যবহার্য শব্দের। 'জীবনস্মৃতি'র যে বিবৃতি, সেখানে সমাসবদ্ধ শব্দ, তৎসম শব্দ, সাধুরীতির ক্রিয়াপদ, যা কিছুই থাক, পাঠক কোথাও বাধা পায় না বর্ণনার রসগ্রহণে। এখানে রবীন্দ্রনাথের মনের আড়ালে যে একটি সহাস্য কৌতুক লুকিয়ে আছে, সেখানে তথাকথিত চলিতভাষা ব্যবহৃত না হয়েও 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যরীতির প্রাণশক্তি বাংলা বাক্যবন্ধনে উন্নত পথের অভিমুখী

করেছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের কাব্যরীতি অর্থাৎ মহাকাব্যের ধারা থেকে সরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবকল্পনার জগৎটি তাঁর মনকে অধিকার করেছিল কবিজীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে। কাব্যের ছন্দে ব্যক্তি-অনুভূতির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। 'জীবনস্মৃতি' সামগ্রিকভাবে সেই ব্যক্তি অনুভূতিকেই ফুটিয়ে তুলেছে, যার অন্তধর্মে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কাব্যরচনার গভীর উপলব্ধি, কিন্তু তার বহিরঙ্গে রয়েছে গদ্যের প্রবাহ। সেই প্রবাহে দেখা গেছে তাঁর স্মৃতির মালায় গাঁথা মনের ছোট ছোট ছবি। রচনাভঙ্গীর কৌশলে সাধুভাষাতেও তার ঘরোয়া রীতিটি যথাযথভাবেই রক্ষা পেয়েছে। স্মৃতিচিত্রটি পাঠকের নিজের অনুভূতির রঙে একাত্ম হয়ে গেছে তার স্রষ্টার সঙ্গে। 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধারায় একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। সুতরাং গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ— কোনো গদ্যভাষার মানদণ্ডেই এর পরিমাপ করা যায় না। কারণ এ হচ্ছে এমনই এককবিরভাষা যিনি অতি স্বাচ্ছন্দে, সাবলীলভঙ্গিতে তাঁর মানসবিকাশের ইতিহাসে জানিয়েছেন। বিপুল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনচেতনার সৌধ গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিমূলের চিত্র 'জীবনস্মৃতি'। পঞ্চাশ বছর বয়সে রচনা করতে গিয়ে কবির সচেতনতাই তাঁকে চালিত করেছিল পাঠকের মর্মমূলে তাঁর সাহিত্য প্রেরণার প্রবেশদ্বারটি খুলে দিতে।

৫.৩ রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্ব ঃ

"শিক্ষারম্ভ"

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'কে জীবনবৃত্তান্ত বলেননি, তাই সেখানে সাল তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিক্ষারম্ভের বয়সের বিস্মরণের কথা বলেছেন। মনে রেখেছেন 'কর' 'খল' বানানের সঙ্গে আদি কবির প্রথম কবিতা 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। সেই মিলের ঝঙ্কারে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মনে রেখেছেন তাঁদের পুরানো খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের কথা, যিনি হাস্যকৌতুকে তাঁদের পরিবারের সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। তার থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য যে তাঁর দ্রুতগতিতে বলা একটা মস্ত ছড়া কল্পনাপ্রবণ শিশু কবির মনে একটি সুন্দরী সালংকারা বধূর ছবি চিরকালের স্মৃতিতে এঁকে দিয়েছিলেন, মিলনোৎসবের রঙীন ছবি জীবন্ত হয়ে উঠত সেই "দ্রুত উচ্চারিত শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা"য়। বিরহী যক্ষের যে মধুর প্রণয়ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে নানা বর্ণে ফুটে উঠেছে তাঁর শিশুমনে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' শব্দের ব্যঞ্জনাই তার উৎস। এই দুটি কাব্যানুভূতির কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থের সূচনা পর্বে।

এর পরের বিবরণ, স্কুলের অধ্যায়। সেখানে তাঁর অপর দুটি সঙ্গী অধিকার পেলেও, তৃতীয় শিশুটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেন না এবং প্রবল প্রতিবাদ জানালেন পক্ষপাতিত্বের এই অবিচারে। তাঁদের গণ্ডীবাঁধা জীবনে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের স্কুলে যাওয়ার পথে ভ্রমণবৃত্তান্তটি তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের কান্নার বীজটি বোধকরি এভাবেই প্রোথিত হয়েছিল। স্কুলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়ীর বাইরে বেরোনোর এই প্রলোভনের খেসারৎ কবিকে যথেষ্টই দিতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ের বাধ্যবাধকতা যে আরও পীড়াদায়ক হবে তাঁর পক্ষে, এক শিক্ষক তাঁকে চপেটাঘাতসহ জানিয়েছিলেন। "এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বানী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সূচনা ভৃত্যমহলে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের মাধ্যমে, এটিও একটি অভাবনীয় সংবাদ। এক একটি অনুভূতির বর্ণনায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুজীবনকে যেন পরম মমতায় তুলে ধরেছেন। পুলিশম্যানের কঠোর শাসন তাঁর কাছে নিদারুন ভীতিপ্রদ ছিল। পরিত্রাণের জন্য ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে নির্বুদ্বিগ্ন দেখে অবশেষে তিনি আশ্রয় নিলেন রামায়ণপাঠে, একটি অংশের করুণ বর্ণনায় তাঁর চোখে জল দেখে দিদিমা বইটি কেড়ে নিলেন। একটি শিশুমনের প্রতি অমনোযোগে বোধকরি চিরদিনই বেদনার স্মৃতি বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই অধ্যায়েই তার প্রথম সূচনা।

নর্মাল স্কুল

রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজের স্কুলের নাম বলেছেন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'। বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে একটি শিশুর স্পর্শকাতর মনের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এই অংশে। সেই শিশু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সকৌতুকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে এই বিদ্যালয়ের অনুসরণে তখনই তিনি কিছু নির্বাক জড়প্রকৃতির বস্তুর শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই অনুকরণপ্রিয় হয়, তিনিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সেই কারণেই "শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।" সহজেই অনুমান করা যায়, কী ধরণের উৎপীড়ন সেই কচি অবোধ বালকগুলিকে সহ্য করতে হত। তারপর এল নর্মাল স্কুলের পালা, সেখানকার অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। বিদেশি ইরাজী ভাষায় প্রত্যহ গাওয়া একটি গান ছাত্রদের আকৃষ্ট করত না, এই ভাষা না বোঝা যেন তাদেরই অপরাধ। রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষারীতিতে বিশেষভাবেই প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষকে আনন্দময় করার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচয়। নর্মাল স্কুলের সাহপাঠিদের সহচর্যেও তাঁর তৃপ্তি ছিল না। এখানকার শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হতে পারেননি। শুধুমাত্র বাংলা পরীক্ষার বাৎসরিক ফলে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রশান্ত পাল তথ্যসহকারে দেখিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'তে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' নয়। তাঁর বয়স তখন খুব কম থাকায় স্মৃতিচিত্রের তথ্যটি সঠিক হয়নি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি "নর্মাল স্কুল" নামে চিহ্নিত হলেও আসল নাম 'ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট পাঠশালা' বা 'ক্যালকাটা মডেল স্কুল।'[১]

তবে স্কুলের নাম যাই হোক না কেন, পরিণতবয়সে যখন রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' লিখছেন, তখনও শিক্ষাপ্রণালীর ভয়াবহ চেহারা তিনি এতটুকু বিস্মৃত হননি এবং পরবর্তীকালে এই ধরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি।

ভৃত্যরাজকতন্ত্র এবং ঘর ও বাহির

'জীবনস্মৃতি'র এই দুটি অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের ওপর একটি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। তাঁদের অভিজাত পরিবারে দাসদাসীর অভাব ছিল না। পরিবারের নিয়ম অনুসারে বালকরা ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে থাকত। বিদ্যালয়ের স্মৃতি যেমন আনন্দময় ছিল না, তেমনই নির্মম ছিল এই ভৃত্যদের তথাকথিত তত্ত্বাবধানে থাকা। সরসভাবে বর্ণনা করেছেন শুচিবায়ুগ্রস্ত ঈশ্বরের কথা। তার অতিপরিচ্ছন্নতার সঙ্গে গুরুগিরির অভ্যাসটিও ছিল, সে ক্ষেত্রবিশেষে সাধুভাষায় কথাও বলত, যা তাঁর পরিবারে একটি কৌতুকের বিষয় ছিল। এই ঈশ্বর, বালকদের স্থির রাখার জন্য রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শোনাত, এক অপরূপ জীবনভাবনার জগতে মগ্ন থাকতেন। এই মগ্নতা থেকে যখন ব্যাকুল আগ্রহ জেগে উঠছে পরিণামকে জানার জন্য, তখন নিদ্রার সময় এসে গেছে। সেই বিশেষ ক্ষণে মহর্ষির এক অনুচর কিশোরী চাটুজ্জে "দাশু রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকী অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল.... অনুপ্রাসের ঝক্‌মারি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

জীবনের অনেক ঘটনাই একটি আরেকটির সঙ্গে জুড়ে মনের পটে তার স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখে। তাই সেই শিশু রবীন্দ্রনাথের দেখা কিশোরী চাটুজ্জে 'জীবনস্মৃতি'র বাইরে আবার দেখা দিয়েছেন 'ছড়ার ছবির' বালক কবিতায়।

---

১. দ্রঃ রবিজীবনী (১ম) শ্রী প্রশান্ত পাল, পৃঃ ৬৩-৬৪ ও ৭৬

"কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—
থাকত আমার খাত লেখা, পড়ে থাকত পড়া,
মনে মনে ইচ্ছা হত, যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হ'ত এই পাঁচালীর দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গায়ে।"

বিধিনিষেধের বেড়া পার হয়ে খোলনা মনে প্রকৃতির রাজ্যে 'ডাক হরকরা' হয়ে নতুন নতুন গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিল তাঁর 'ডাকঘর' নাটকের গৃহবন্দী অমল।

আবার ফিরে আসে ঈশ্বরের কথায়। ঈশ্বরের অনেকগুণের মধ্যে একটি ছিল আফিং সেবন, যার ফলে প্রায়ই বালকদের দুধের বরাদ্দে সে ভাগ বসাথ. এমন কি তাদের প্রাপ্য জলখাবারটুকু পুরোমাত্রায় দিতেও তার সম্মতি থাকত না। সেই ঈশ্বরকে প্রসন্ন রাখা একটি কাজ ছিল। সুতরাং বাড়ীতেও খুব আনন্দ ছিল না ভৃত্যদের কঠোর শাসনে।

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে জোড়াসাঁকোর বিশাল পরি ারে এই বয়সের শিশুদের প্রতি অভিভাবকরা নজর দিতেন না। পরিবারের রীতি অনুযায়ী জন্মের পরেই তার স্থান পেত দাসীর কোলে, যে বয়সে মাতৃস্নেহই মূল আশ্রয় হওয়া উচিত ছিল। আরেকটু বড় হলেই অন্দরমহল থেকে একেবারে বাইরে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' স্থানান্তরিত। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চাঞ্চল্যকেই তারা দমন করত প্রহার করে। এইটিই রবীন্দ্রনাথের চার পাঁচ বছর বয়সের স্মৃতি।

ধনীগৃহের সন্তান হলেও সেই পরিবারে শিশুদের কোনো ভোগবিলাসের আ..াজন ছিল না। পিছনে ফিরে সেই সরল জীবনযাপনের এক বিরাট প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর পরিণত বয়সে লেখা জীবনস্মৃতির 'ঘর ও বাহির' অংশে। অনাদরের মধ্য দিয়ে বড় হলেও মনের স্বাধীনতা ছিল, নিয়ম নীতি প্রভৃতি সুসজ্জার বেড়াজালে তা বন্দী হয়নি। সেই কালের প্রেক্ষিতে তিনি বলছেন, "আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল....। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাতিাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁটি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না।" যে কোনো মহৎ প্রাপ্তির জন্য সাধনা করতে হয়, অর্জন করার গৌরবটুকু সংগ্রহ করতে হয়, হয়ত রবীন্দ্রনাথ সেইদিকেই ইঙ্গিত করেছেন অনাগতকালের দিকে তাকিয়ে।

এরপর এসেছে গন্ডীর কথা, এটিও রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, নানাভাবে, নানাভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। শ্যাম নামে ভৃত্য শিশু রবীন্দ্রনাথেক একটি খড়ি দিয়ে গন্ডী কেটে আবদ্ধ করত এবং গন্ডী ভাঙলে যে সমূহ বিপদ, সেই পাঠটুকু রামায়ণ কাহিনী থেকে নেওয়াই ছিল। কিন্তু সেই খড়ির দাগ না মুছেও শিশুকবি তাঁর আনন্দের উপলক্ষটি খুঁজে বার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মনের নিভৃতে মুক্তিপিয়াসী বালকটি দেখত ঘাটবাঁধানো পুকুর, পাঁচিলের গায়ে চীনা বট আর দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। সারাদিন সে পুকুরটি দেখত, সেখানে কত ধরনের মানুষের আনাগোনা, কত বিচিত্রভঙ্গী তাদের স্নানের রীতিতে। ক্রমশঃ পুকুরঘাট নির্জন হয়ে এলে তাঁর মনকে ঘিরে ধরত সেই প্রাচীন বট। রবীন্দ্রনাথের সেই অনুভূতির গভীর চেহারা, চিরদিনই তাঁর হৃদয়কে জাগ্রত থেকেছে। বিশ্বের অনন্ত রহস্য তাঁকে হাতছানি দিয়েছে বারে বারে। অনেকদিন পরে ঝুরি নামা বটগাছকে প্রশ্ন করেছিলেন—'ছোট ছেলেটিকে মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট'। বর্ণনা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝেই স্মৃতিচারণে আসে

বিষণ্ণ বিশ্লেষণ, "কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! ..... আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।"

'ঘর ও বাহির' অংশে যেন বয়ঃপ্রাপ্ত মননশীল রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিগুলি উঠে আসছে বাল্যস্মৃতির ছায়ায়। কিন্তু সেকালে যা ছিল আলোছায়ার খেলা, পঞ্চাশ বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তারা রসজ্ঞ বিশ্লেষনে মন্ডিত। বিশ্বপ্রকৃতির দ্বার তাঁর কাছে তখনও রুদ্ধ, মিলনের বাধায় ভালবাসার আকর্ষণ তীব্র হয়েছে। একদিন গন্ডী মুছে গেছে, কিন্তু মনের বাধা সরে যায়নি। তাঁর সেই আক্ষেপই অনুরণিত খাঁচার পাখীর বিলাপে আর তারই পাশে বনের পাখীর কূজনে মুক্তির উল্লাস। মন জানে না—'আমি কেমনে বনে বাহিরিব'।

শিশুকাল অতিক্রম করে ভৃত্যশাসনের রাজ্যে যখন রবীন্দ্রনাথ একটু বড় হয়েছেন, তখনই একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে—বাড়ীতে নতুন বধূ সমাগম, সেই নাম না-জানা বধূটির নিবিড় স্নেহসান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু প্রসঙ্গটির তিনি উল্লেখ মাত্র করে নীরব হয়েছেন। ছাদে গিয়ে দেখতেন গৃহকর্ম অন্তে মধ্যাহ্নের এক নির্জন অবকাশ। চোখে পড়ত নানা আয়তনের বাড়ী, তার ছাদ, তার চিলেকোঠা। বন্ধনঅসহিষ্ণু শিশুমন কল্পনায় বাড়ীগুলির মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করত। আবার যে কোনো প্রসারিত ধ্বনি তাঁর মনকে 'উদাস' করে দিত। অনেক বর্ণময় চিত্রের মধ্যে অন্যতম আরেকটি হচ্ছে পিতার ভ্রমণের সুযোগে তাঁর তিনতলার ঘরটিতে অবাধে প্রবেশ এবং জলের ধারায় স্নান। মনের রাশ না টেনে মুক্তির আনন্দকে ছড়িয়ে দিতেন। ছবির পর ছবি এঁকে চলেছেন স্মৃতির পাতায়,—বাড়ীর ভেতরের বাগানে "শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ" আর শরৎকালের "স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি" এক অনাস্বাদিত পুলক নিয়ে আসত সেই প্রকৃতি-অন্বেষণী বালকটির মনে। আরও ছিল—গোলা বাড়ি ও রাজার বাড়ি, শেষেরটির অস্তিত্ব মিশে ছিল কল্পনার সঙ্গে। স্মরণ করি 'শিশু' কাব্যের 'রাজার বাড়ি'।

'আমার রাজার বাড়ী কোথায় কেউ জানে না সে তো
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেতো?

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে মর্ত্যপ্রেমের মাধুর্য ও আকর্ষণের প্রগাঢ় রূপ তুলে ধরেছেন। প্রজ্ঞাবান কবি রবীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে দেখছেন বার বার সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার শিশুটিকে। কিন্তু বর্ণনায়, বিশ্লেষণে কি গভীর অনুভূতি—"তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কি নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।" কৌতুক করে বর্ণনা করেছেন, ছোটবেলায় আতার বিচি পুঁতে জল দেওয়া, নকল পাহাড়ে ফুলগাছের চারা লাগানো প্রভৃতি ঘটনা; কিন্তু একদিন "আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালাসমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল।" বাল্যকালের এই খেলার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক কবির যে কৃষি-বিদ্যা নিয়ে কী অপরিসীম আগ্রহ গড়ে উঠেছিল, শান্তিনিকেতনে কৃষিবিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। কবির এই পৃথিবীপ্রেম তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত অটুট ছিল। শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির সাহচর্যের জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা, তাঁর সমগ্র জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে তৃপ্তি খুঁজে ফিরেছে, বাল্যজীবন থেকেই স্তরে স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে জীবনের বৃহৎ সত্যানুসন্ধানের পথে এগিয়ে গেছে।

কবিতা-রচনা ও নানাবিদ্যার আয়োজন

নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে আমরা অভিহিত করেছি বিশ্বকবি বলে। কিন্তু সেই বিশ্বকবির মনে কবে কবিতারচনার প্রেরণাটি এসেছিল, তার খবর নিয়ে আসে 'জীবনস্মৃতি'। তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এক ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ পয়ার ছন্দে চোদ্দ অক্ষরে কবিতা লেখার পদ্ধতি তাঁকে শেখালেন; তখন তাঁর বয়স সাত বা আট। রবীন্দ্র-জীবনীর গবেষকরা আরও তথ্য দিয়েছেন, তার কিছু উল্লেখ করছি। জ্যোতিঃপ্রকাশের নির্দেশ ছিল পদ্ম নিয়ে

কবিতা লেখা। রামায়ণ মহাভারত শুনে অভ্যস্থ কবি সহজেই পয়ারছন্দে শ্লেটে কবিতা লিখলেন। (জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আরও অতিরিক্ত কিছু জানা যায় (দ্রঃ প্রস্তাবনা অংশ)। মনে হয় এই পদ্মের ওপর কবিতাই তিনি নীলখাতাতে লিখে পড়ে শুনিয়েছিলেন নবগোপালবাবুকে। দাদা সোমেন্দ্রনাথ ভাইএর এই কৃতিত্বের প্রচারক ছিলেন। তবে কাব্যরচনার হাতেখড়ি হল জ্যোতিঃপ্রকাশের উৎসাহে। প্রবল আবেগে নীল কাগজের খাতা ভরে উঠল; ভ্রাতৃগর্বে গর্বিত সোমেন্দ্রনাথের কাজ ছিল শ্রোতা সংগ্রহ করা। নবগোপালবাবু প্রশংসা করলেও ভ্রমরের পরিবর্তে 'দ্বিরেফ' ব্যবহার করার কারণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন। রবীন্দ্রনাথের তাঁকে যথেষ্ট রসগ্রাহী মনে হয়নি। তাঁর মন্তব্য "দ্বিরেফ শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল"।

নর্মাল স্কুলে পড়া, কবিতা লেখার প্রথম পাঠ, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতেও তাঁকে নানাদিকে সুশিক্ষিত করে তোলার আয়োজন হল। "ছিপছিপে বেতের মতো", "মানুষ জন্মধারী" শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় গৃহশিক্ষক ছিলেন। পড়ানোর সময় ছিল সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত। তিনি পড়াতেন চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত, মেঘনাদবধ কাব্য। তার আগে ভোরের অন্ধকারে কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করতে হত। স্কুল থেকে ফিরেই ড্রইং ও জিম্‌ন্যাষ্টিক এবং অবশেষে ইংরাজী পড়া। রাত ন'টায় ছুটি হত। প্রাকৃতবিজ্ঞান পাঠ তাঁর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। সন্ধ্যাবেলায় ইংরাজী শিক্ষা মনে হয় না তাঁকে আকৃষ্ট করত। স্মৃতিতে যা রয়েছে সে অনুভূতি হচ্ছে, প্রাতঃকালে নিজের মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করায় আনন্দ অনেক বেশি। যে কোনো ধরণের শিক্ষার সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্থাপন তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই অঘোরবাবুর নিয়মিত ইংরাজী পড়াতে আসায় রবীন্দ্রনাথ মোটেই খুশী হতেন না। স্মরণ করে বলছেন—"সন্ধ্যাবেলায় টিমটিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিশ্বদূতের উপরও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।" অস্থিবিদ্যা শিখতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর মনে আঘাত দিয়েছিল।

এই বহুমুখী শিক্ষাদানের উৎসাহও নজর সবচেয়ে বেশি ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এই শিক্ষার ভার সুখস্মৃতি হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। তবুও অন্তরের নিভৃতে কবির আত্মসত্তা এক বিপুল কৌতূহল নিয়ে জীবনকে দেখতে চেয়েছে সবধরণের শিক্ষাচর্চাকে অতিক্রম করে।

বাহিরে যাত্রা

একটি শিশুমন কীভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে যায়, সেই প্রসঙ্গে এই অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আগেই দেখেছি, জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারে বালকদের স্বাধীন বিচরণের অনুমতি ছিল না। ডেঙ্গু রোগের তাড়নায় বাধ্য হয়েই পরিবারের অনেককেই আশ্রয় নিতে হল পেনেটির ছাতুবাবুদের বাগানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। তিনি একাত্ম হয়ে উঠলেন গঙ্গার সঙ্গে, এক নতুন দৃষ্টি জন্ম নিল। তিনি দেখতেন গঙ্গার ওপর জোয়ার ভাঁটার খেলা, কত নৌকোর বিচিত্র গতিভঙ্গী, সূর্যাস্তের বর্ণশোভা। তাঁর মনে হল, "কড়ি-বরগা-দেয়ালের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।" কবির সমগ্র জীবনেই এই পালাবদল এসেছে বারে বারে। এখানেই তার প্রথম সম্ভাবনা বা সূচনা। গঙ্গার বিশেষ জলরাশি একদিকে, আবার আরেকদিকে ঘাট-বাঁধানো খিড়কির পুকুর, তার চারিদিকে ফলের গাছের আচ্ছাদন—সে দৃশ্য বড়ই আকর্ষনীয় ছিল। "এ যেন ঘরের বধূ"। বড় সুন্দরভাবে শিশু রবীন্দ্রনাথের মনের এক গোপন আন্তরিক ছবি ফুটে উঠেছে। সব কিছুর আড়ালে অবনতমুখী বধূটির মনের গভীরের সবুজ রঙটি যেন রাঙিয়ে তুলেছে তাঁরও মনকে। আবার মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রকৃতি সেই পুকুরটির কাছে নিয়ে যায় বালকচিত্তকে, যেখানে সে দেখতে পাচ্ছে না সহজ দৃষ্টিতে, কল্পনা করছে "যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য"।

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণকামী চিন্তার জগতে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় পল্লীগ্রাম। নাগরিক সভ্যতার অন্তরালে মুখ লুকিয়ে থাকা পল্লীগ্রামের পরিচয় কলকাতা শহর নিবাসী রবীন্দ্রনাথ জানতেন না। তাই গ্রামের পথঘাট,

চন্ডীমন্ডপ, খেলাধূলা, এক কথায় সেখানকার জীবনযাত্রা জানতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। একদিন সে সুযোগ এল গোপনে অভিভাবকদের অনুসরণ করে। কিন্তু তাঁরা জানতে পারলেন তাঁর গোপন ভালবাসা এবং যথোপযুক্ত সাজপোষাক না থাকায় শিশুটিকে বাধ্য করা হল ফিরে আসতে। তবে গঙ্গার দৃশ্যে তাঁর চলমান মন পালতোলা নৌকার মতই ভেসে বেড়াত অবিরত। চল্লিশ বছর আগের এই স্মৃতিতে যেন কোথায় বেদনাবোধ বেজে উঠেছে। প্রথম দেখার যে বিস্ময়, যে অনাবিল আনন্দ—যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তাঁরা ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয় মনে নর্মাল স্কুলে যাওয়ার আতঙ্ক নিয়ে।

কাব্যরচনাচর্চা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনাচর্চা একটি অত্যন্ত সরস বর্ণনা। নীলখাতাটি ক্রমশঃ ভরে উঠছিল। কবির মনে মনে একটু যশপ্রাপ্তির আশাও জেগেছিল। জীবনস্মৃতির এই অংশ থেকেই আমরা জানতে পারি যে তাঁর ক্লাসের শিক্ষক সাতকরি দত্ত মশাই তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য দু' একটি পদ কবিতা দিয়ে সেটি পূর্ণ করে আনতে বলতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে তিরস্কৃত হতেন বার বারই তাঁর কবি খ্যাতি পাওয়ার পরও। কিন্তু এখানে তিনি প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে জানাচ্ছেন যে তাঁর এই বয়সের রচনায় সবটাই সুবোধ্য। একটির পর একটা ঘটনা সাজিয়ে গেছেন তিনি। কীভাবে স্কুলের কঠোর নিয়মবিধির পরিচালক গোবিন্দবাবুর স্নেহলাভ করেছিলেন, তাঁর সুনীতি সম্বন্ধে কবিতা লেখার আদেশপালন ও ক্লাসে উচ্চকণ্ঠে তার আবৃত্তি করেছিলেন, ইত্যাদি নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এটি যথার্থই তাঁর রচনা এই কথা মনে করতে তাঁর সহপাঠিদের মধ্যে বোধ করি কিছু হীনমন্যতা জেগেছিল। ক্লাসের একজন ছাত্র বলল, "যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির এইটিই বোধকরি প্রথম অভিযোগ। এইভাবে তিনি নানা কীর্তিকাহিনী বলে গেছেন সরস ভঙ্গীতে।

শ্রীকণ্ঠবাবু

বার্ধক্যে উপনীত এক বহুগুণসম্পন্ন মানুষের যে বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ঐ যুগের প্রেক্ষাপটে সে চরিত্রের মানুষ দুর্লভ। তিনি শ্রীকণ্ঠবাবু—নির্মল স্বভাব, হাস্যোজ্জ্বল উদ্ভাসিত চোখ, ফারসি পড়া মানুষ,কণ্ঠে বিরামহীন সঙ্গীত। তাঁর সব আচরণেই একটা দৃপ্তভঙ্গী প্রকাশ পেত। "সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধটি নিষ্কণ্টক ছিল। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মিশতে পারতেন তিনি। তিনিও বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন। ভবযন্ত্রণা অবলম্বনে তাঁর একটি কবিতা মহা উৎসাহভরে শ্রীকণ্ঠবাবু মহর্ষিকে শুনিয়েছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্রের দুঃসহজীবনজ্বালার পরিচয় পেয়ে তিনি খুব হেসেছিলেন। অপূর্ব ভঙ্গিতে গল্পটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীকণ্ঠবাবু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান সকলকে শুনিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করার অদম্য চেষ্টা ছিল তাঁর। তাঁর ভক্তহৃদয় ব্রহ্মসংগীতের রসমাধুর্যে পূর্ণ থাকত। সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে মহর্ষিকে শোনাতেন—"অন্তরতর অন্তর তুমি যে—ভুলো নারে তাঁয়।" জীবনের অন্তিম লগ্নেও তাঁর কণ্ঠে ছিল—"কি মধুর তব করুণা প্রভো"। শিশু রবীন্দ্রনাথের যে প্রবল আকর্ষণ ছিল এই মানুষটির প্রতি, বিনম্র শ্রদ্ধা নিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছেন।

বাংলা শিক্ষার অবসান

জোড়াসাঁকোর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে বাড়ীর সন্তানদের নানা বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাশিক্ষা, যার অন্তর্গত ছিল পদার্থ বাদ দিয়েই অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা, ভাষাসাহিত্য শিক্ষার পক্ষে 'মেঘনাদবধ' কাব্যপাঠও অতি গুরুপাক হয়েছিল, সন্দেহ নেই। তবুও নর্মাল স্কুলের বাংলাশিক্ষা থেকে তারা অনেক এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁদের বেশিদিন থাকতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ মহর্ষির কাছে এই বইএর জন্য "সাধু গৌড়ীয় ভাষায় মেন অনিন্দিত রীতিতে

সে বাক্যবিন্যাস" করেছিল যে দেবেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝেছিলেন যে এই বাংলাভাষা শিক্ষাপদ্ধতি একেবারেই সঠিক নয়, ফলে বাংলাশিক্ষকেরও প্রয়োজনবোধ করলেন না। নীলকমল পন্ডিতমশাইকে সংবাদটি জানাবার পর তাঁর একটি মন্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিধি আলোচনায় যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন। পন্ডিতমশাই বলেছিলেন, তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে"। সে মূল্য তাঁর মনোভঙ্গীর ভিত্তিস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাই শিশুকালে বাংলা পড়া বন্ধ হওয়ার যে নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় তাঁরা অতি আনন্দিত হয়েছিলেন, জীবনের কোমলে কঠোরে ভরা স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—"মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।"

এরপর 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে এক ফিরিঙ্গী স্কুলের ছবি তুলে ধরেছেন। এখানকার অন্যান্য ছেলেদের নানা দৌরাত্মা ছিল। কিন্তু তা নিছকই আমোদ, অপমান নয়। নিয়মিত বেতন দেওয়া ছাড়া লেখাপড়ার সঙ্গে বিশে সম্পর্ক ছিল না। ফলে "স্বাধীনতার প্রথম তলাটিতে উঠিয়াছি।" তবুও "ইস্কুল" এমন একটি জায়গা যেখানে "ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই।" দাদাদের ফারসি পড়ানোর শিক্ষক মুনশী, ছায়ার সঙ্গে লাঠি খেলতেন, বেসুরো গলায় গান গাইতেন। তাঁকে তুষ্ট করে প্রায়ই অধ্যক্ষের কাছে জোড়াসাঁকোর কনিষ্ঠ সন্তানের ছুটির আবেদন আসত এবং গ্রাহ্যও হত। এখানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র ও শিক্ষকের একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করে বলছেন যে নির্ঝরের সচলতার মতই বাল্যবয়সের সব অপরাধ চলমানতার সঙ্গে নিঃশেষ হয়। কিন্তু শিক্ষকের ক্ষেত্রে সচেতনতার প্রয়োজন অনেক বেশি সেই জলপ্রবাহকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য এরপর আসছে জাত বাঁচাবার জন্য বাঙালী ছাত্রদের স্বতন্ত্র খাবার ঘরের কথা, রাগরাগিনীর চর্চা, ম্যাজিকের খেলা, ম্যাজিক সম্পর্কে চটি বইএর প্রকাশ ইত্যাদি। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের বাল্যকালে অঘটন ঘটানোর প্রস্তুতি, তারই রচিত নাটকের ষ্টেজ ছাড়া অভিনয়, আমের আঁটিতে আঠা লাগিয়ে শুকিয়ে গাছ বার করার পরিকল্পনা, বাঁ পায়ে লাফানোর ভুল পদক্ষেপ প্রভৃতি বাল্যস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে স্মরণীয় হয়ে ছিল। স্বভাবের সরলতা, তার বিস্ময়বোধ, তার লাজুক প্রকৃতি সব মিলিয়ে এক বালকের মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে তাঁর স্মৃতির পাতায়।

পিতৃদেব

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের প্রথমদিকের অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী, অনেক ভাবনার সূত্র, প্রকৃতির অনাবৃত রূপে অপার আনন্দ, জীবনের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববোধের জাগরণ প্রভৃতির সংমিশ্রণে এই স্মৃতিচিত্রটি বিশেষ মূল্য বহন করে।

পিতৃদেবের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি জানাচ্ছেন যে দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই দেশভ্রমণে যেতেন; শিশুকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সান্নিধ্য দূরে থাক, পরিচিত ছিলেন না বললেই হয়। মহর্ষির পাঞ্জাবী ভৃত্য লেজু, য়িহুদী গ্যাব্রিয়েলের আতর বেচা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। পাঞ্জাবীরা যোদ্ধার জাত, আর য়িহুদীদের সুদূর বিদেশে বাস—ঘরের চার দেয়ালে বন্ধ কবির মন চলে যেত দূর থেকে আরও দূরে। আবার বিচিত্র পোষাক পরা কাবুলীওয়ালাদের সম্বন্ধে একটা ভীতি থাকলেও কোথায় তাদের ঘিরে এক রহস্য বাসা বাঁধত। পিতার কাছে তাঁর প্রথম লেখা চিঠির একটি সরস গল্প বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি তখন পাহাড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন; গুজব উঠল রাশিয়া ভারত আক্রমণ করবে হিমালয়ের কোনো এক ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে। প্রবল আশংকায় মহর্ষি পত্নী রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁর পিতাকে একটি চিঠি লেখালেন। চিঠি লেখায় অনভিজ্ঞ পুত্র মহানন্দে মুন্সির সাহায্যে সেরেস্তার খাতা লেখার ভাষায় লিখেছিলেন মায়ের আবেদন; উত্তর পেলেন পিতার কাছ থেকে অভয়দানসহ। এই পত্রবিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎই পিতার সম্পর্কে অনেক সহজ হয়ে উঠলেন। বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে তিনি মহর্ষিকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সরস মন্তব্য যে মাশুলের অভাবে "এ চিঠিগুলি হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই"। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সমস্ত পরিবারকে যে কীভাবে সংহত করে রাখত, সেই চিত্রও বাদ যায়নি তাঁর অল্পদিনের জন্য কলিকাতায়

আগমনবার্তার বিবরণে।

এরপর আসছে তাঁদের তিনটি বালকের উপনয়ন-প্রসঙ্গ। মহর্ষি বেদের মন্ত্র থেকে উপনয়নের মূল বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন। বিশুদ্ধ রীতিতে উপনিষদের মন্ত্র বার বার তাঁদের আবৃত্তি করতে হত। অবশেষে উপনয়ন হল; "মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতলার ঘরে তিনদিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম"। উপনয়নের নিয়ম অনুসারে কঠোর সংযম পালন কখনই হত না এবং পুরাণের গল্পে দশবারো বছরের ঋষি বালকদের যে আহুতিদানের গল্প আছে, বালক রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাকে প্রামাণ্য বলে মনে করেনি "....কারণ শিশুচরিত্র নামক পুরানটি সকল পুরাণ অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গায়ত্রীমন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করত। তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলেও এই মন্ত্রোচ্চারণে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, সেটি তাঁর হৃদয়ের গভীরে বেজে উঠত। এখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনের পটভূমিতে শিশুমনস্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন।

একটি বালকের মনের তন্ত্রীতে নানা অনুভূতির সুর বেজে ওঠে, কিন্তু সে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। উদাহরণ দিচ্ছেন নিজের জীবন থেকে। গঙ্গার ধারে মেঘোদয়ে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত' আবৃত্তির যে ধ্বনিঝঙ্কার, শিশু রবীন্দ্রনাথ তার অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি, কিন্তু মনের গভীরের একটা ঘুমন্ত আবেগকে যেন নাড়া দিয়েছিল। 'Old curiosity shop' নামে প্রচুর ছবি দেওয়া বইটির কিছু না বুঝেও একটি ছবির মালা গেঁথেছিলেন তাঁর শিশু মন দিয়ে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হাতে পেয়ে না বুঝেও বাংলা ভাষাপরিচয় থাকায় তাকে বারংবার পড়েছেন, ছন্দ ও কথার মিলন এক আলোড়ন তুলেছিল সেই বালক হৃদয়ে। এই স্মৃতিগুলি থেকে বেরিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের আজীবনের শিক্ষাচিন্তা, যার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে শিশুমন। শুধুমাত্র পরীক্ষার ফল দিয়ে মেধার বিচার হয় না; কারণ জ্ঞানের রাজত্ব অপেক্ষা ভাবের রাজত্বে বিচরণই শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দিকটি ভাল করে ভাবার প্রয়োজন আছে। "শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া"। মনের সঙ্গে সংযোগসাধন না হলে শিক্ষা সত্য হয় না। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিতদের থেকেও দেশীয় কথকদের কথকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন; কারণ ভাষা, তত্ত্বকথাকে অতিক্রম করে তাঁদের বলার ভঙ্গীতে শ্রোতা সব না বুঝেও কিছু একটা হৃদয়ঙ্গম করে। সেই আভাসই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ ছবি হয়ে ওঠে পরিণতমননে। যুক্তিতে বুদ্ধিতে সব সময়ে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হয় না।

'পিতৃদেব' অংশে পিতার কথা সামান্যই আছে। কিন্তু তিনি যে উপনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই ক্রিয়াকর্মের অনুভূতি থেকেই বালক রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের এবং সেইসঙ্গে তাঁর পরিণত চিন্তাভাবনার এক সুসংবদ্ধ রূপ দেখতে পাই।

হিমালয় যাত্রা

এই অংশে পিতৃদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নিবিড় সান্নিধ্যের চিত্র রয়েছে। উপনয়নের পর মুন্ডিত মস্তকে স্কুলে গিয়ে কি অভ্যর্থনা জুটবে, সেই আশংকায় চিন্তিত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক অভাবনীয় প্রাপ্তিযোগ এল সেইসময়ে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে হিমালয় যাত্রার সঙ্গীরূপে নিলেন। পিতার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করতে গিয়ে তা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে কনিষ্ঠ পুত্রের চোখে। তিনি বলছেন, মহর্ষির সকল কাজেরই একটা সুচিন্তিত পদ্ধতি ছিল। তিনি নিজে যেমন নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, অপরের ক্ষেত্রে সেই আচরণই আশা করতেন। তিনি অভিজ্ঞ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপটি তিনি তাঁর মনের মধ্যে গঠন করে নিতেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনাতেই যে সংসার পরিচালিত হবে, এ অধিকার অতি সঙ্গতভাবেই তাঁর ছিল। তাঁর সুপরিকল্পনায় প্রত্যেকটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে, কোথাও ব্যতিক্রম ঘটবে না—এইটিই তিনি আশা করতেন। নানা মানুষের বর্ণনাকে তিনি মনের মধ্যে পর পর যুক্ত করে ঘটনাটি উপলব্ধি করতেন। কোথাও শৈথিল্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর হিমালয় যাত্রার প্রেক্ষাপটেই পিতার চিরিত্রধর্মকে বর্ণনা করেছেন সন্তানের একদিকে ছিল পূর্ণ সাধীনতা, "অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল," কোথাও কোনো বেনিয়মের ছিদ্র ছিল না।

যাত্রার পথে প্রথম থামার কথা বোলপুরে। এইখানে তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের কথা বলছেন, যিনি সরল কবিকে প্রচুর ভয় দেখিয়েছিলেন রেলগাড়ী সম্বধে। কিন্তু রোমাঞ্চকর কিছু না ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিমর্ষ হয়েছিলেন। সত্যপ্রসাদ তাঁর বালক স্বভাবের সুযোগ নিয়ে সম্ভব অসম্ভব নানা ঘটনা বলতেন, আর কিশোর কবি তার চাক্ষুশ প্রমাণ দেখতে চাইতেন। রেলগাড়ি যখন ছুটে চলেছে, তখন কবি মুগ্ধ হয়ে আস্বোদন করেছেননিসর্গের সৌন্দর্যকে। সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা বোলপুরে পৌঁছেলেন।

অভিজাত নাগরিক পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ। তিনি কখন ধানক্ষেতে দেখেননিয রক্নায় দেখেছেন রাালবালকের সঙ্গে একসঙ্গে ভাত খাচ্ছেন। কিন্তু কল্পনার রেশ মিলিয়ে যেতেই দেখলেন রুক্ষ মাটির বিশাল প্রান্ত, সেখানে তাঁর অবাধ বিচরণে কোনো নিষেধ ছিল না। 'খোয়াই' রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীবন্ধ ছিল। কাকে খোয়াই বলে তার বিবরণ তিনি দিচ্ছেন 'জীবনস্মৃতি'তে।" বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লালকাকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোট ছেটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বাল্যবিলাদের দেশের ভুবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই টিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথের পথের সামান্য সঞ্চয়ের আগ্রহকে উৎসাহিত করতেন। তিনি পুত্রের সর্বব্যাপী কৌতূহলের দরজাটি অবারিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শিশুর মনের আক্ষেপ যে এই পরম যত্নে সঞ্চিত পাথরগুলি তাঁকে ফেলে আসতে হয়েছিল। পরিণতবয়সের রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধি তাঁকে নিস্পৃহ হবার শিক্ষা দেয়নি। তাই সঞ্চয় ও সম্বমম্ববোধের নিকটত্ব তাঁর অনুভূতিতে চিরদিনই জাগ্রত ছিল। বোলপুর বাসকালে তাঁর কোনো প্রার্থনাই দেবেন্দ্রনাথ অপূর্ণ রাখতেন না। পুত্রের অদম্য প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাগতিক বাস্তববোধেও সচেতন করে তুলেছিলেন। তাই পয়সার হিসেব রাখতে দিলেন, দামি সোনার ঘড়িতে দম দিতে বললেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সম্ভবত পুত্রকে দায়িত্বশীল করার জন্য এই প্রচেষ্টা। কিন্তু স্মৃতির সরল রোমন্থনে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন— সেই বালকরি হিসাবও সঠিক হত না, তহবিল বেড়ে যেত, এবং অতিরিক্ত যত্নের অত্যাচারে ঘড়িটিও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করল মেরামতের জন্য। বড় হয়ে জমিদারীর কাজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালীন হিসাবপত্রের ব্যাপারে কোনোদিন কোনো অসংগতি থাকলে দেবেন্দ্রনাথ তা সহজেই বুঝতে পারতেন। অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল দেবেন্দ্রনাথের। ভগবদ্গীতার তাঁর পছন্দের শ্লোকগুলি বাংলা-অনুবাদসহ রবীন্দ্রনাথকে লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়ায় বালক কবি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। বোলপুরে তাঁর সচেতন কাব্যচর্চার একটি রসাল বর্ণনা দিয়েছেন। বাগানে নারকেলগাছের তলায় পা ছড়িয়ে যা দেখছেন যা ভাবছেন তাই দিয়ে পাতার পাতার পাতা ভরে তলেছেন একটা কবিজনোচিত ভঙ্গাগতে। আজকের যুগে ভাবতে বিস্ময় লাগে যখন রবীন্দ্রনাথ সরল মন্তব্য করেন, "শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। সেই বালক কবির সৃষ্টিপ্রচেষ্টা সার্থকতামন্ডিত হয়ে যে দুরন্ত গতি ঝরণার মত দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে, কে জানত সে কথা।

আরও অনেক কথা এই যাত্রাবিবরণে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে টিকিট পরীক্ষকের 'সন্দেহের ক্ষুদ্রতা' তাঁর পিতাকে অত্যন্ত অপমানিত করেছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কঠোরভাবে। আবার অমৃতসরে শিখ গুরুদরবারে গিয়ে ভজন গান শুনতেন, সেই গানে দেবেন্দ্রনাথও যোগ দিতেন। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথকে তিনি ডাকতেন ব্রহ্মসংগীত শোনানোর জন্য। জ্যোৎস্নার আলোছায়ার মধ্যে এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশে বেহাগ রাগে তিনি গাইতেন—

'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব অন্ধকারে।'

মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ শুনতেন। আবার রবীন্দ্রনাথ একটি সহাস্য পরিবেশ নিয়ে আসছেন স্মৃতির কথায়। আগের একটি অংশে উল্লেখ করেছিলাম শিশু রবীন্দ্রনাথের 'ভবযন্ত্রণা' বিষয়ক গান রচনায় দেবেন্দ্রনাথ হেসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "বড়ো বয়সে আরেকদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম"। ঘটনাটি এই—মাঘোৎসবে অনেকগুলি গান রচনার মধ্যে একটি গান ছিল—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'। দেবেন্দ্রনাথ তখন চুঁচুড়ায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে তিনি সব গানগুলিই গাইতে বলেছিলেন এবং গানের শেষে পাঁচশত টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ইংরাজী, সংস্কৃত,বাংলা সব কিছু চর্চাই তাঁর পিতার সঙ্গে চলত। সরলপাঠ্য ইংরাজী জ্যোতিষগ্রন্থ থেকে মুখে যা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ তা বাংলায় লিখতেন। অমৃতসরের পর ডালহৌসী পাহাড়ে যাত্রা, তখন চৈত্রমাস। পিতৃদেবের মতো হিমালয়ের আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনিও। পার্বত্য উপত্যকার নৈসর্গিক চিত্র তিনি দু'চোখ ভরে দেখতেন। চৈতালী ফসলের রঙের বাহার পথের বাঁকে নিবিড় ছায়ারচনাকারী বনস্পতি, পাথরের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরণার কলধ্বনি—চলার পথে এইসব দৃশ্য তাঁকে আবিষ্টকরে রাখত। ডাকবাংলায় বসে সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্র দেখে পিতার সঙ্গে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা হত। মনে হয় এই সূত্র থেকেই বিশ্বজগৎ ও বিশ্বসৃষ্টির বিপুল রহস্য সম্বন্ধে তাঁর চেতনার প্রথম জাগরণ। তাঁদের বাসা ছিল পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া বক্রোটায়। বৈশাখ মাস হলেও প্রবল শীত এবং তুষার আচ্ছাদিত। পায়ের যে শিকল কাটেনি পেনেটির বাগানবাড়ীতে, এখানে ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র—গতিবিধির অবাধ স্বাধীনতা। এই সময়ে পাহাড়ের নানা জায়গায় তাঁর ভ্রমণের যে চিত্র সেখানেও প্রকৃতির শোভার সঙ্গে কবিমনের বহু বর্ণময় গাঢ় অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন স্মৃতির রেখায়। বনস্পতিতে তিনি দেখতেন "কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ"। এই বৃক্ষ তাঁর কাব্যরচনায় নানা উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে; সূচনাপর্বটি এই হিমালয় যাত্রা। এই বনানীর মধ্যে একটি নিঃশঙ্ক হৃদয় ঘুরে ঘুরে শুনতে চায় সেই বনবাণীকে। বনের ছায়ায় তাঁর উপলব্ধির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করছি—"যেন সরীসৃপের গাত্রের মত একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া আলোকের পর্যায়ে যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী"। এই গাঢ় শীতল অনুভূতি কবির মনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র উপলব্ধির সৃষ্টি করেছে তাঁর রচনায়—কোথাও নির্জনতা সৃষ্টিতে, কোথাও মনের একাকীত্বের অনুভূতিতে, আবার কোথাও তীব্র মানসিক সঙ্কটের সম্ভাবনায়।

রাত্রে পিতার উপাসনার দৃশ্য কবিকে অভিভূত করত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ছন্দপতন, যখন সংস্কৃত শব্দরূপ মুখস্থ করার জন্য সেই শীতের ভোরে বিছানার উষ্ণ সুখস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে হত। সূর্যোদয়কালে তিনিও পিতার সঙ্গে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতেন। অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় চলতে হত—প্রাতঃভ্রমণের পর ইংরাজী পড়া, তারপর বরফগলা জলে স্নান। শিশুকাল থেকেই বরাদ্দ দুধ না পাওয়ার অভ্যাসে এখানে অভাব না থাকলেও তাঁর রুচি ছিল না। মধ্যাহ্নভোজনের পর আবার পড়া, কিন্তু ভোরের ঘুম যথেষ্ট না হওয়ায়, তাঁকে নিদ্রাদেবী আশ্রয় করতেন এবং ছুটি মঞ্জুর হত। ততক্ষণাৎ নিদ্রা অন্তর্ধান করত। তিনি বিনা বাধায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার হৃদয়ধর্মকে এই ভ্রমনকাল থেকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছেন যে চরিত্রগঠনে তাঁর কত সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি ছিল। মানুষের প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে তার অন্তর সম্বন্ধযুক্ত হবে, মনের গভীর থেকে যে সত্যবোধ জেগে উঠবে, তা হবে চিরস্থায়ী, সেইখানেই সত্যের কাছে মাথানত হবে। "তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায়, কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।" মনোবল এবং সাহসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি সমর্থন করেছেন, পুত্রের মানসিক বিকাশে সাহায্য করেছেন। নানা অসম্পূর্ণতা মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছে তাঁর জীবনের বহু পদক্ষেপে। কিন্তু প্রতিকারের পূর্ণ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ভাঙা সমীচীন নয়—এইটাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা কিন্তু নিজের মতকে প্রাধান্য না দিয়ে

সন্তানকে ভুলভ্রান্তি অসাবধানতার মধ্য দিয়ে তাঁর গম্যস্থানকে চিনে নিতে সাহায্য করেছিলেন। এ তো হল জীবনের আদর্শ তৈরী করার মহান ব্রত। কিন্তু প্রাত্যাহিক কর্মজীবনটিও তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। পাহাড়ে থাকাকালে অচেনা পিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন, যেখানে বাড়ীর অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর একটা অভেদ্য দূরত্ব ছিল। বালকপুত্রের মুখে তিনি তাঁর বাড়ীর গল্প শুনতেন। আবার দাদাদের কাছ থেকে চিঠি এলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিতেন চিঠি লেখার পদ্ধতি শেখার জন্য। কোনো বিষয়ে তর্ক উঠলে বিপুল ধৈর্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন।

পিতাপুত্রের মধ্যে যে ক্রমশঃই একটি সস্নেহ প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠছিল, পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন কৌতুকের গল্প তাঁর প্রমাণ। তারপর এসেছে প্রত্যাবর্তনের পালা। কয়েকমাস থাকার পর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন।

'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত পিতার সঙ্গে পুত্রের এই সংযোগ রবীন্দ্রজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে দেখার এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। "শৈশবে, বাল্যকালে ও যৌবনে যখন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে উঠে নির্দিষ্ট আকার লাভ করে এবং তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে তখন দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে মহত্তর মানুষ দেখবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয়নি; এই মহাপুরুষের নিত্যসান্নিধ্য অগোচরে ও সগোচরে তাঁর মন ও মতামত গঠিত করে তুলেছে; পিতা ও পুত্র ভিন্ন পথের পথিক হলেও পুত্রকে এমন পাথেয় দিয়েছে, যে পুঁজি কখনও নিঃশেষ হয়নি বরঞ্চ পুত্রের প্রতিভার সংযোগে ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে।"[১]

দেবেন্দ্রনাথ কি এমন বিশেষত্ব দেখেছিলেন তাঁর এই সন্তানটির মধ্যে সেটিও এখানে ভাবা প্রাসঙ্গিক। স্কুলে যাওয়ার ভীতি থেকে রক্ষা পেলেন রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের আহ্বানে। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারে অনেক শিশুর মধ্য থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আনলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে একটি নিঃসঙ্গ সত্তা রয়েছে, যে বহুজনের মধ্যে থেকেও একাকীত্ব রক্ষা করে, এটি মহর্ষি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। হিমালয়ের নির্জনতা ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র; তাঁর নিভৃতচারী এই পুত্রের মননবিকাশের প্রশস্ত স্থান হিসাবেও তিনি পার্বত্য বনভূমির নির্জনতাই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ ঘটনাটি নানা সরস মন্তব্যের মধ্য দিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখলেও, তিনি নিজেও জানতেন কয়েকটি মাস পিতার এই সান্নিধ্য থেকেই তাঁর অন্তরমুখী কবিসত্তা সারাজীবনের পাথেয় সঞ্চয় করেছে।

প্রত্যাবর্তন

হিমালয় ভ্রমণ থেকে রবীন্দ্রনাথ দেহে মনে এক স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে ফিরলেন—'প্রত্যাবর্তন' অংশে তারই পরিচয় পাই। শিশুকালে তিনি ছিলেন ভৃত্যমহলে নির্বাসিতের দলে। সে গণ্ডী তিনি ভাঙলেন, অন্তঃপুরে যাওয়া আসার অবাধ অধিকার পেলেন। সব থেকে বড় লাভ, মায়ের ঘরের আসরেও তাঁর প্রবেশ ঘটল, বাড়ীর তখনকার কনিষ্ঠ বধূটি তাঁর স্নেহ উজাড় করে দিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বস্মৃতির একটি ছবি তুলে ধরেছেন। ভৃত্যদের অভিভাবকত্বে মানুষ শিশু রবির কাছে অন্তঃপুর ছিল এক কল্পনার রাজ্য। মেয়েদের অযাচিত আদর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। মনে হত সব স্বাধীনতা রয়েছে অন্তঃপুরের অন্তরালে। মেয়েদের নিয়মবিধির সঙ্গে তাঁদের ছিল দুস্তর ব্যবধান। মন আরও বিকল হয়ে যেত যখন সুসজ্জিতা নববধূটি বাইরের পরিবার থেকে তাঁদের অন্তঃপুরে স্থান নিত, কিন্তু তার সঙ্গে শিশুর হৃদয়বিনিময়ের কোনো যোগ থাকত না, তার সঙ্গে আবার আলমারীতে কত রঙীণ

---

১. প্রমথনাথ বিশী-রবীন্দ্র কাব্য প্রকৃতি ও জীবনসাধনার উপরে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব। দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা—বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫

উজ্জ্বল দ্রব্যের সম্ভার। সবই ছিল অধিকারের বাইরে, দূরের ছবি। "বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি।' ' সেই অর্ধপরিচিত কল্পলোকবাসী অন্তঃপুরিকাদের আকস্মিক ভালবাসার আতিশয্য স্বল্পসময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি দূর করতে পারেনি, এ খবর তিনি নিজেই বলেছেন। কল্পনার বিরাট জাল বুনে তাঁর ভ্রমণকাহিনী ঘরে ঘরে তিনি বলতেন এবং বারংবার বলা পুরানো গল্পের আকর্ষণ বাড়ানো হত আরও রঙে বৈচিত্র্যে দিয়ে। মায়ের "বায়ুসেবনসভায়" প্রধান বক্তার পদ পেয়ে তিনি খুবই গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, অলংকারসমৃদ্ধ কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা তিনি দেখাতে চাইলেন, "যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড় নয়।" কিন্তু আসর বেশি জমে উঠল পাঁচালি গায়ক কিশোরী চাটুজ্জের নানা রঙ নানা ভাবের গানে। বালক রবীন্দরনাথ অতি উচ্ছ্বাসিতভাবে সলের মধ্যে নিজে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কৃত্তিবাস বাদ দিয়ে বাল্মীকির রামায়ণ শোনাতে চাইতেন মাকে। মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু ঋজপাঠের সামান্য বিদ্যা দিয়ে আসল ও তার স্বরচিত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য হলো না। তবুও মাতা পুলকিত হয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে শোনাতে চাইলে, তিনি সহজেই তাঁর বালকভ্রাতার অসম্পূর্ণতা বুঝতে পারলেন।

আবার এল স্কুলে যাবার পাল, প্রথমে 'বেঙ্গল একাডেমি', সেখানে থেকে পালানোর পর 'সেন্টজেবিয়ার্স স্কুলে'। বিদ্যালয়ে মনের বিরুদ্ধ পরিবেশের ধাক্কা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসহনীয় ছিল নিঃসন্দেহে। 'জীবনস্মৃতি'র অনেকটাই জুড়ে আছে সেই ক্ষোভের চিত্র। শিক্ষাপদ্ধতির পীড়ন শিশুমনকে পিষ্ট করে দেয়; রবীন্দ্রনাথের সেই আংশকা আজকের নুতন শতাব্দীতে কি বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, সে কাহিনী কারুরই অজানা নয়। কিন্তু এই স্কুলে কোনো কোনো শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ সম্মাননত ছিলেন। একজন্য প্রধান অধ্যাপক, ফাদার হেনরি, আরেকজন স্পেনীয় শিক্ষক ফাদার ডি পেনেরাডা, এক গভীর মমত্ববোধ নিয়ে তাঁর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মুখশ্রী সুন্দর নয়, ইংরাজী উচ্চারণ সঠিক নয়, তবুও তার সহৃদয়তায় রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার মনে হয়েছিল এক নিবিড় স্তব্ধতায় তিনি নিজেকে আবৃত রেখেছেন। অল্প কয়েকটি শব্দে তাঁর স্নেহের যে স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তার থেকেই সেই হৃদয়টি বিশ্বকবির মনে দেবমন্দিরের স্থান নিয়েছিল।

ঘরের পড়া

বিদ্যালয়ের গন্ডীতে যখন রবীন্দ্রনাথকে বাঁধা গেল না, তখন তার শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য কুমারসম্ভব, ম্যাকবেথ প্রভৃতি বাংলায় বোঝাতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে ম্যাকবেথকে বাংলা ছন্দে তর্জমা করতে বাধ্য করলেন। সংস্কৃত শিক্ষক রামসর্বস্ব পন্ডিত শকুন্তলা পড়াতেন. এই সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ম্যাকবেথের তর্জমা শোনানোর জন্য তাকে নিয়ে গেলেন পন্ডিতমশাই, সেখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। উভয়ের কাছেই তিনি উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ বসু বলেছিলেন— ".....ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।"

রবীন্দ্রনাথ বারবারই ফিরে এসেছেন শিশুমনের প্রসঙ্গে। তাঁর যুগে আজকের মত বাংলাসাহিত্যের অপরিমিত ভান্ডার ছিল না, তাঁরা পাঠ্য অপাঠ্য সব বই-ই পড়েছেন, ক্ষতি হয়নি কিছু। তিনি ছেলেভুলানো শিশুসাহিত্যকে সমর্থন করেননি, সেগুলি মনের বিকাশে সাহায্য করে না। তাঁর মতে ছেলেদের বই পড়ার মধ্যে কিছু বোঝা কিছু না বোঝা অংশ থাকে, তার মধ্য দিয়েই মন নিজেকে তৈরী করে নেয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' রজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' কৃষ্ণকুমারী' উপন্যাস প্রভৃতির কোনোটিই তাঁর বয়সে পড়ার উপযুক্ত না হলেও তিনি একটি মন্তব্য করছেন, যা বোধকরি আজকের যুগে খুবই প্রাসঙ্গিক। বলছেন, 'সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাইনা।"

এবার তিনি এমন একটি পত্রিকার কথা বলছেন, যার জ্ঞানবৃদ্ধির থেকেও মনের চাহিদা মেটাবার দিকেই প্রবণতা। পত্রিকাটির নাম 'অবোধবন্ধু'। এখানেই তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা—"তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।" বিলাতী পৌলবর্জিনী গল্পের বাংলা অনুবাদও তাকে খুব বেশি আকৃষ্ঠ ও প্রভাবিত করেছিল। সারাজীবন এই গল্পরসের আস্বাদনে অভিভূত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তারপর এল বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় অতি জনপ্রিয় পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'। প্রতিটি উপন্যাস এক একটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন পরেরটির জন্য। "—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি।" এই পড়ার অনুভূতি এক অনাস্বাদিত রসভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিল তাঁর মনে।

সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। নির্দ্বিধায় এবং নির্বিচারে বইপড়া যে মনের ক্রমবিকাশে সাহায্য করে 'ঘরের পড়া' অংশে রবীন্দ্রনাথের সেই অভিমতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বাড়ীর আবহাওয়া

উনিশ শতকের নবজাগরণের ঢেউকে স্পর্শ করেও রবীন্দ্রনাথের পিতৃপরিবার একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অবস্থান করত। সমগ্র পরিবারটিতে শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতি চর্চার এক বিপুল আয়োজন ছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের অধিকার ছিল না সেই জগতে। তবুও তিনি তার সন্ধান দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। তাঁর পরিবারের অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ কিছু মানুষের কথা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বলেছেন তাঁর খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথের কথা। তিনি দীর্ঘায়ু হননি, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বেঁধে রাখার। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে গানে চিত্র-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস চর্চায় গধদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল।"

এরপর বলছেন গণেন্দ্রনাথের ছোটভাই গুণদাদার কথা। তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলকেই গভীর মমতা দিয়ে নিজের প্রশস্ত হৃদয়ে আপন মনে করে স্থান দিতেন। "আমোদ উৎসবের নানা সঙ্কল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত।" এই গুণদাদার স্নেহসরস হৃদয়টি রবীন্দ্রনাথ চিরদিন স্মরণে রেখেছেন। গুণদাদার কোলের কাছে বসে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস শুনতেন, এমন কি শিশুকবির কবিতারও রসগ্রহণে তিনি বিমুখ ছিলেন না।

তারপরে বলেছেন তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের স্রষ্টা এই মানুষটির প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস তাঁকে নানাবিধ রচনায় অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু লেখাগুলি তাঁরই অনাদরে হারিয়ে গেছে, থাকলে বাংলাসাহিত্যের সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তাঁর বিপুল আবেগ নিয়ে লেখা 'স্বপ্নপ্রয়াণ' শিশুমন অনেকটাই বুঝত না, "কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম, তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।"

পরিবারের দু' একজনের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন এক বিরাট উপলব্ধির জগৎকে, যা ছিল এক গভীর আত্মিক অনুভূতির সমন্বয়ে উজ্জ্বল। জীবনস্মৃতি যখন লিখছেন, তখনই সে সম্পর্ক অস্ত গেছে। কালের ব্যবধানে মানবমনের পরস্পরের সম্পর্কে দূরত্ব এসে গেছে। মানুষ একত্রিত হয় প্রয়োজনে। "মজলিশে" বসে অপ্রয়োজনের আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার সেই দিনটি হারিয়ে গেছে। একান্নবর্তী পরিবারে সব আয়োজন ছিল সকলের জন্যে।

আত্মকেন্দ্রিকতায়র মোহ তখনও গ্রাস করেনি মানুষকে। কিন্তু পরিবর্তনের ঢেউ বিপর্যস্ত করেছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, সাদাসিধে পোষাকে বিনা আহবানে আর ঘরে ঢুকে আসর জমানের অধিকার নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথ সমাজের যে ভাঙনের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করছেন, সেই ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তাঁর যুগের থেকেও বোধকরি আজকের যুগে বেশি। ইংরেজদের নিজেদের প্রণালীমত সমাজ ও 'বহুব্যাপ্ত' সামাজিকতা রয়েছে। আমাদেরও আছে। কিন্তু সাহেবি রীতিতে আত্মসমর্পণ করে আমার ঘরকে হারিয়েছি আর পরও আমাদের গ্রহণ করেনি। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, আদানপ্রদান বন্ধ হয়েছে আর নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে নিঃশ্ছিদ্র দূর্গে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, এটি একটি কুশ্রী সামাজিক কৃপণতা।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

জোতিরিন্দ্র ঠাকুরের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন্য সাহিত্যানুরাগী মানুষ ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে স্নাতকোত্তর করলেও মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালা পর্যন্ত তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। বঙ্গদর্শনে তাঁর 'উদাসিনী' কাব্য প্রশংসা অর্জন করেছিল। নিজে অজস্র লিখে থাকলেও সেগুলি রক্ষা করার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন না। অত্যন্ত প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন। যেখানে থাকতেন, সেখানেই আসর জমাতেন। মানুষের গুণটিই দেখতেন, সদানন্দ মানুষটির সাহিত্যরস আস্বাদনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, সেইসঙ্গে ছিল সাহিত্যস্রষ্টাকে তা সে যে বয়সেই হোক, প্রবলভাবে উৎসাহিত করা। অনেকে না জেনেই তাঁর লেখা গান গাইতেন।

তাঁর সাহিত্য উপভোগের ঔদার্যের সঙ্গে ছিল সকল বয়সের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। অপরিচিতের সভায় হত তিনি খুব স্বচ্ছন্দবোধ করতেন না, কিন্তু নিজের চেনা মহলে তিনি সকল মানুষের কাছেই সমাদৃত ছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দাদাদের সভা থেকে অনেকসময়েই গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতেন তাঁর এলাকায় সেখানে তখনও শুনতেন ইংরাজী কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা, কখনও আবার বালক কবির রচনাকেও অপর্যাপ্ত প্রশংসায় ভরিয়ে তুলেছেন।

গীতচর্চা

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই তাঁর শিশুকালের দাসত্বের বন্ধনকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে চিত্তের অবাধ স্বাধীনতার যদি অপব্যবহারও হয় তার থেকেই সদ্ব্যবহারের শিক্ষাও লাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গটি তিনি এনেছেন 'গীতচর্চা' প্রসঙ্গে। এখানে তাঁর অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিলেন তার অগ্রজদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। "জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়ে আমাকে আপনার অন্বোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের শতসহস্র গান রচনা করার প্রথম প্রেরণা এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে। তিনি পিয়ানোয় যে বিভিন্ন ধরনের সুরসৃষ্টি কতেন, সেই সুরগুলিকে কথায় বেঁধে রাখার অনেকটা দায়িত্বই রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বলেছেন, সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথে তিনি এগোননি। সহজাত ভাবেই গানে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

সাহিত্যের সঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার সহমর্মী হয়েছেন, এমন অনেক মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতিকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রীতির অনতম সঙ্গী ছিলেন তার বউঠাকুরানীও। সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়ার আগের চিত্রটি রসিক রবীন্দ্রনাথকে চেনায়। তিনি বলছেন হিমালয় তাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল, তিনি ভৃত্যশাসন এবং বিদ্যানিকেতেনর বন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর গৃহশিক্ষকরাও নিয়মচালিত শিক্ষায় তাকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। ফলে তিনি যে জীবনে কিছু করতে পারবেন না এ সম্বন্ধে বাড়ির লোকের

সঙ্গে তাঁর নিজেরও সন্দেহ ছিল না। তাঁর একটিমাত্র কাজ ছিল, কবিতার খাতার পাতা ভরানো। বলছেন, অনেক কথা যেন তপ্ত বাষ্পের মত ফেনিয়ে ওঠে, আবেগের দুর্দমনীয় গতি নিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই যুগের কবিতার ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল চেষ্টা ছিল। কিন্তু সার্থকতা না আসায় দুরন্ত আক্ষেপ। যখন সৃষ্টির পরিণতি হয় নাই অথচ যেন জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

এই সময়েই বৌঠাকুরানীর সাহিত্যবোধ ও চর্চার তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা দুজনে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য পরম শ্রদ্ধায় পড়তেন। এই কাব্যের কল্পজগৎ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবেই প্রলুব্ধ করত। তার ভাব, তার রূপ, তার বিন্যাসপদ্ধতি— সর্বত্রই এক নিপুণ শিল্পীর কৃতিত্বের ছবি। এর সমতুল্য লেখার আশা রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবতেই পারতেন না।

তাঁর বউঠাকুরানীর অরেকজন কবির বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন। তিনি 'সারদামঙ্গল' কাব্যের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ছিল। জীবনস্মৃতি লিখবার কালে রবীন্দ্রনাত এই রোমান্টিক ভাবঐশ্বর্যর কাব্য ও তার স্রষ্টা সম্বন্ধে বলেচিলেন, "তাঁহার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ কবির আনন্দ ছিল", যাকে আত্মস্থ করার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন বালক কবি।

'সাহিত্যের সঙ্গী'র প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপুরাণ ' কাব্য ও বিহারীলাল চক্রবর্তী র প্রসঙ্গে এনেছেন। বউঠাকুরনী ও রবীন্দ্রনাথে মনে সাহিত্যপ্রীতি এক সুরে বাঁধা ছিল। এই মধুর সম্পর্কে মাঝে মাঝে এক কোমল অভিমান ঘিরে ধরত রবীন্দ্রনাথকে। কারণ বিহারীলালের ভক্ত পাঠিকাটি কোনোমতেই তাঁর দেবরের কবিত্বশক্তিকে গান নিয়েও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই উচ্ছ্বাসিত হতেন না। তবুও কবি নিরাশ হননি, কবিতা রচনার বিপুল উন্মাদনাকে রোধ করা তাঁর অসাধ্য ছিল।

রচনাপ্রকাশ

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাইরের জগতে প্রকাশের ইতিহাস এই অংশে। তিনি পরিহাস করে বলছেন, জ্ঞানাঙ্কুর নামে একটি নতুন পত্রিকা— 'কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদগত কবির কাগজের কর্তপক্ষরা সংগ্রহ করলেন"। কালের বিচারে এই 'পদ্যপ্রলাপগুলি অপাংক্তেয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। একটি স্মরণীয় ঘটনা সেই প্রসঙ্গে এসেছে। সেটি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য, মনে করা হত এটি কোনো মহিলা কবির লেখা। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিদগ্ধ সাহিত্যসবোদ্ধার প্রশংসাকে খন্ডন করে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় একটি গদ্যপ্রবন্ধ লিখলেন, তাতে বললেন এখানে ভাব ও ভাষার যে অসংযম, তাতে স্ত্রীলোকের লেখা বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। বেশ আড়ম্বর করেই তিনি খন্ডকবিতা, গীতিকবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার লক্ষণ কি প্রভৃতি আলোচনা করেছিলেন। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে তিনি তার মানসিক বিপর্যয়ের কথা খুব রসিকতা করে এখানে বর্ণনা করেছেন— 'কুক্ষণে জনম তোর, রে সমালোচনা'।

ভানুসিংহের কবিতা

'জীবনস্মৃতি'তে বিভিন্ন স্মৃতিকথার প্রেযাপটে ভানুসিংহ ও রবীন্দ্রনাথের অভিন্নতা তাঁর কাব্যজীবনে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষা কীভাবে তাঁর অধিগত হয়েছিল, সেই বিবরণ রয়েছে এই অংশে। 'ঘরের পড়া'তে রয়েছে যে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করত, কিন্তু মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা তাঁর আয়ত্তগম্য না হওয়ায় তিনি আরও তৎপরতার সঙ্গে প্রবেশপথটি খুঁজেছেন। প্রাচীন কাব্যগুলি বহুল প্রচলিত না হওয়ায় অনুসন্ধান তিনি আরও তৎপরতার সঙ্গে প্রবেশপথটি খুঁজেছেন। প্রাচীন কাব্যগুলি বহুল প্রচলিত না হওয়ায় অনুসন্ধান করে 'কাব্যরত্ন' খুঁজে বের করতে তৎপর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর আগে তিনি শুনেছিলেন বালক কবি চ্যাটারটন প্রাচীন কবিদের হুবহু নকল করতেন। রবীন্দ্রনাথও সেই চেষ্টাই

করলেন। "মেঘলাদিনে ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে' লিখলেন "গহনকুসুম কুঞ্জমাঝে"। তাঁর লেখা হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় ছলনার আশ্রয় নিয়ে বললেন যে ভানুসিংহ নামে এক প্রাচীন কবির পদ তিনি সংগ্রহ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি উচ্চমানের মর্যাদা পেল এবং এগুলি ছাপার দরকার এমন উৎসাহও তিনি পেলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথ সত্য কথাটি জানালেন। আরেকটি ঘটনাও সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। 'ভানুসিংহ', 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। সেইসময়ে জার্মানী প্রবাসী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বাংলা গীতিকাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং প্রাচীন পদকর্তা হিসাবে ভানুসিংহ যে মর্যাদা পেয়েছিলেন "কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভানুসিংহের কবিতার সমালোচনা করেছেন। ভানুসিংহ এবং প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তার অনেকেই একই ভাষায় লিখেছেন, কিছু পার্থক্য ছিল নিঃসন্দেহে। এই ভাষা কৃত্রিম, মাতৃভাষা নয়। কিন্তু ভাবের দিক থেকে এক অনাবিল অবয়ব ফুটে উঠেছিল। ভাষার অনুকরণ থাকলেও ভানুসিংহের অন্তরধর্মের কৃত্রিমতা অস্বীকার করা যায় না। "তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজিকালকার সস্তা অর্গানের বিলাতী টুংটাং মাত্র"।

স্বাদেশিকতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধা নিয়ে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর চরিত্রে স্বদেশপ্রীতির এক দৃপ্ত ঔজ্জ্বল্য ছিল, যা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন নিজের পরিবারের মর্মমূলে। সেখানে জীবনাচরণে কিছু বিদেশীপ্রথা থাকলেও মহর্ষির স্থির হৃদয়ে স্বদেশভাবনা সদা দীপ্যমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের যুগ কিন্তু জাতীয়তাবোধ বিকাশের যুগ নয়। "তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন"। কিন্তু মহর্ষির পরিবারে মাতৃভাষা চর্চারই প্রাধান্য ছিল, এমনকি চিঠিপত্রের আদান প্রদানেও তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। পরিবারের স্বাদেশিকতার এক ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত ভাবনার বিশ্লেষণসহ।

হিন্দুমেলার আয়োজন হয়েছিল তাদের বাড়ীরই পৃষ্ঠপোষকতায়। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।" "মিলে সবে ভারতসন্তান" গানটি এই উপলক্ষেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন। দেশানুরাগের বিভিন্ন দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথও মহা উৎসাহে লর্ড কার্জনের সময়ে দিল্লীদরবার নিয়ে গদ্যপ্রবন্ধ এবং লর্ড লিটনের সময় কবিতা লিখেছিলেন দেশপ্রীতি আশ্রয় করে, কিন্তু ইংরাজসরকার বিচলিত হননি, পরম কৌতুকে সে কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।

আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের যে দীর্ঘ আন্দোলন, প্রথম অঙ্কুরটি কোথায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'স্বাদেশিকতা' পর্বের বিভিন্ন অংশে। 'স্বাদেশিক' সভার উল্লেখ করেছেন—প্রধান উদ্যোগী ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। গলির মধ্যে পোড়ো বাড়ীর সেই রহস্যময় সভার প্রধান লক্ষ্যই ছিল গোপনীয়তা, যে উদ্দেশ্য বালক রবীন্দ্রনাথের বোধগম্য ছিল না। তিনিও একজন সভ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনের গঠনে কীভাবে দেশাত্মবোধের স্বদেশচেতনার ভিতটির পত্তন হয়েছিল, অতীতের সেই কাহিনী এই অংশে স্থান নিয়েছে। ইংরাজশাসনের ফলস্বরূপ যে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সম্ভাবনা ক্রমপ্রসারিত হয়ে উঠছিল, তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিষম বিকার'। 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে, তাঁদের শিশুকালের সুপ্ত বীরত্বের উদ্‌গীরণ, "উত্তেজনার আগুন"কে শ্রদ্ধার আবরণে সংহত করাকে তাঁর পরিণত চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন, কারণ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত মর্মান্তিক সত্যটিকে ধরতে পেরেছিলেন। "একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরাণীগিরির রাস্তা খোলা থাকিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নইলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া

হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।" রবীন্দ্রনাথের এই পূর্বকথা স্মরণ ও বিশ্লেষণ সচেতন মনকে সজোরে ধাক্কা দেয় নিঃসন্দেহে।

তারপর আবার সহাস্য বর্ণনা— জ্যোতিদাদার পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা। ধুতি ও পাজামার মাঝামাঝি একটি পোষাক পরে তিনি কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অসীম বীরভাবে চলাফেরা করতেন। রবিবারে ছিল সদলবলে শিকারে যাওয়ার বিশেষ আয়োজন। সেখানে রক্তপাত ছিল না, বরং বৌঠাকুরানীর দৌলতে আহারের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। ডাব পেড়ে পানীয়ের ব্যবস্থাও হত। জাতি-ধর্ম নির্বিচারে যেমন আহার চলত, তেমনি অপরাহ্নের প্রচন্ড ঝড়ে সুরে অসুরে সমস্বরে গানেরও বিরাম ছিল না।

স্বদেশী দেশলাই তৈরীর গল্প বলেছেন। সেই অগ্নিশিখা তৈরী করার যেমন খচর, তেমনি সেগুলি ক্ষীণপ্রাণ। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগের প্রখরতা স্বদেশী দেশলাইতে রক্ষা পেল না। দেশীয় কাপড়ের কল শুধুমাত্র 'গামছার টুকরা' বার করলি। ক্রমেই কিছু বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে দেশপ্রেমের মত আলোড়ন স্তিমিত হয়ে গেল।

তারপর এসেছে রাজনারায়ণ বসুর কথা। নানা বিপরীত উপাদানে গড়া ছিল রাজনারায়ণ বাবুর প্রকৃতি। অপরিসীম পান্ডিত্য সত্ত্বেও মনটি ছিল শিশুর মত অনাবিল। তাঁর হাস্যমুখর স্বভাব বালকবৃদ্ধ সকলকেই সমানভাবে গ্রহণ করত। তিনি একদিকে ছিলেন ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদিত আরেকদিকে দেশের হিতসাধনের চিন্তায় সদাসচেতন। ইংরাজীর ছাত্র হয়েও বাংলাভাষাসাহিত্য উপভোগের দরজাটি খুলে নিয়েছিলেন। একদিকে শিশুসুলভ সারল্য, আবার প্রখর তেজস্বীও। রবীন্দ্রনাথ আজীবন শ্রদ্ধাবনত ছিলেন এই মানুষটির প্রতি।

ভারতী

আরম্ভ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর তারুণ্যের অস্থিরতা দিয়ে। ঠাকুরবাড়ী থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'ভারতী' পত্রিকা। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। প্রথমেই তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কারণ "নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায়।" 'দাম্ভিক' সমালোচনা দিয়েই 'ভারতী'তে তাঁর লেখার সূচনা। 'ভারতী'র প্রথম বছরেই তাঁর 'কবিকাহিনী' প্রকাসিত হল। এই কাব্যটি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কবিই নিজেত আত্মচিতরকেই বড়ে করে দেখার চেষ্টা করেছে। নিজেকে কবি হিসেবে কি করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেথা সরসভাবেই অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশিত হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে। বাল্যরচনাগুলি সম্পর্কে চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তিবোধ করতেন। 'কবিকাহিনী' লেখার সময়ে আত্মজীবনের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কখনই ছিল না, কিন্তু প্রথম উদগত লেখাগুলির মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রস্বরূপ প্রতিভাত হবার লগ্নটি আভাসিত হচ্ছিল তবুও রবীন্দ্রাথ নিজেই তীব্র সমালোচনা করেছেন। এইটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং তার প্রকাশে তিনি প্রসন্নই হয়েছিলেন। তবে তাঁর মতে সমালোচনার তীব্র বাল্যকালেই বিদ্ধ হওয়া ভাল, যদিও রবীন্দ্রনাথ আজও মুক্ত নন সেই প্রহার থেকে। তখনকার বাংলাসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ অপরিণত বলছেন, অল্পবয়সের সৃষ্টিপ্রয়াসে অপ্রয়োজনীয় কথা, অপরিণত বিন্যাসপদ্ধতি দিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক শক্তিকে অতিক্রম করার একটা প্রবণতা থাকে। কিন্তু লেখার কমচর্চার মধ্য দিয়ে সেই কৃত্রিম গতিকে ঘনীভূত সৌন্দর্য ও সত্যকে চিনতে শেখায়। 'ভারতী'র পাতায় তাঁর এমন অনেকেই কাঁচা লেখা আছে, কিন্তু লেখার অদম্য বাসনাকে তিনি ছোটো করে দেখাননি। "সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল"। সেই উৎসাহের আগুন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিপ্রাণের, তাঁর আত্মানুসন্ধানের পথ দেখেছিলেন— এ তাঁর নিজেরই অভিব্যক্তি।

আমেদাবাদ

আপাতদৃষ্টিতে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি আমেদাবাদে জজ ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার আগে, তাঁর বাড়ীতে থাকার ঘটনা, এই অংশের উপজীব্য। শাহীবাগের বাদশাহি আমলের এই প্রাসাদের এক বিরাট আকর্ষণ ছিল এবং তাঁর গল্প ও গানরচনার প্রেক্ষাপটও ছিল। প্রাসাদের পাঁচিলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে 'ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা শবরমতী' নদী। সম্মুখভাগে খোলা ছাদ এবং নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে পায়রার কূজন। রাত্রে এই ছাদটির আকর্ষণ ছিল তাঁর কাছে, এখানে বেড়াতে বেড়াতে তিনি নিজে সুর দিয়ে প্রথম পর্বের অনেক গান রচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের বিশাল গ্রন্থ সঞ্চয়ের মধ্যে টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থ খুব সহজবোধ্য না হলেও তাঁকে আকৃষ্ট করত। সেইসঙ্গে ছিল অভিধানের সাহায্যে ইংরাজী বইপড়া। রবীন্দ্রনাথ খুব লঘু চালে বর্ণনা করলেও, এই অবস্থানের একটা সুদূর প্রসারী ফল তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনে।

বিলাত

বিলাতযাত্রা প্রসঙ্গে কাঁচা বয়সের অনভিজ্ঞতা নিয়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কিছু চিঠির উল্লেখ করেছেন। 'অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস"। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতা না থাকলেও সত্যেন্দ্রপত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিদেশযাত্রায় অভিজ্ঞতা না থাকার ধাক্কা খেতে হল না। তুষারপাত তাঁর কাছে এক সৌন্দর্যলোক খুলে দিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাদের সঙ্গে খেলাধূলায় নিজেকে মাতিয়ে রাখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু বিদেশযাত্রার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে। ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে তিনি কিছুমাত্র বিড়ম্বিত হননি, কিন্তু বেশিদিন থাকা হল না, অবশ্য স্কুলের দোষে নয়। লন্ডনে তখন ছিলেন তারকনাথ পালিত, তিনি বুঝেছিলেন যে এই প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর লাভ হবে না। লন্ডনের তীব্র শীতের মুখে একটি বাসায় তাঁকে একলা রাখলেন। লন্ডনের শীতঋতুর বিবর্ণ দীপ্তিহীন চেহারায় তিনি প্রকৃতির ঔদার্য দেখেননি। সঙ্গী ছিল একটি হারমোনিয়ম, ভারতবর্ষীয় কেউ এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। এখানে তাঁকে ল্যাটিন পড়ানোর একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজের ভাব ও সভ্যতাভেদে তার রূপান্তর নিয়ে বিরাট গবেষণার চেষ্টা করতেন, যেদিন তথ্য পেতেন সেদিন উল্লাস ধরত না, আবার বিপরীত হলে বিমর্ষ হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের একটি সহৃদয় অনুভূতি ছিল। তিনি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ছিলেন। কিন্তু গবেষণাজনিত বিষণ্ণ এই অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষটিকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। শিক্ষকের মত ছিল—"পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই "—এই মত রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে কোনোদিনও খণ্ডন করেননি।" এখনো আমার বিশ্বাস সমস্ত মানুষের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।"

এরপর তিনি এলেন এক সুযোগ্য শিক্ষক মিঃ পার্কারের বাসায়। তাঁর নিজের স্ত্রীকে পীড়ন করার পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখজনক ছিল। এরপর জ্ঞানদানন্দিনী ডেকে পাঠালেন তাঁকে ডেভনশিয়রে টার্কিনগর থেকে। দুটি শিশুসঙ্গী নিয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খোলা দরজায় তার অপরূপ সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন। 'ভগ্নতরী' কবিতাটি তিনি এইখানেই রচনা করেছিলেন। আবার লন্ডনে ফিরে গিয়ে স্থান পেলেন ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্র গৃহস্থের ঘরে। স্ত্রী ও তিনকন্যাকে নিয়ে তিনি থাকতেন। এই পরিবারের সঙ্গে এক মধুর প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্ক তাঁর গড়ে উঠেছিল। মিসেস স্কট তাঁর চোখে ভারতীয় পতিব্রতা নারীর মতই ছিলেন। ঘর গৃহস্থালীর কাজে তিনি সুগৃহিনী ছিলেন। শুধুই কাজ নয়, সান্ধ্যআসরে পড়াশুনা গানবাজনার চর্চায় তিনিও অংশ নিতেন। সর্বোপরি ছিল এই য়ুরোপীয় মহিলার পতিভক্তি। অল্পবয়সের চোখে দেখা অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে আমরা নতুন কিছু ভাবনার

পরিচয় পাই। "স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাবাবিক চরম পরিণতি ভক্তি। ....যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদ প্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিা রাখে সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে, সেখানে স্ত্রী-প্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।" কয়েকদিন পরে দেশে ফিরে যাবার ডাক এলেও এই পরিবারটি রবীন্দ্র-জীবনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। আরও দু' একটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবেই মুগ্ধ করেছিল— দুই ব্যক্তি সততা একটি যুবক ও একটি মালবাহককে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই কিছু বেশি মুদ্রা দিয়েছিলে, কিন্তু সেই দুই ব্যক্তি মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভুলবশতঃ তাদের প্রাপ্যের অধিক দিয়েছেন। বঞ্চনার দিকটি তিনি বড়ো করে মনে রাখেননি। কারণ বিশ্বাস করাটা মানুষের এক বিশেষ ধর্ম। আরেকটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা বলেছেন— এক ইংরাজ রমণী তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে বিলাপগান 'বেহাগ' রাগিনীতে গাইতে অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন এবং বারবারই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার বাড়ীতে আসার জন্য। কলকাতায় ফেরার আসন্নকালে তিনি এই বিধবামহিলার গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অনেক বিপত্তি কাটিয়ে তিনি পৌঁছলেন, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সেই বর্ণনা। সেখানে যাওয়ার পর তিনি যে দেহেমনে কি পরিমাণ বিড়ম্বিত হয়েছিলেন তারও সরস বর্ণনা রয়েছে এখানে।

লোকেন পালিত

লোকেন পালিত ছিলেন বিলাতে যুনিভার্সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথের সহধ্যায়ী বন্ধুয যদিও বয়সে তিনি ছোটোই ছিলেন, কিন্তু বন্ধুত্বসম্পর্কে অসুবিধা ছিল না। লাইব্রেরিতে বসে তাদের "নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ" চলত, সেইসঙ্গে সাহিত্য আলোচনাও চলত।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানান ও শব্দতত্ত্ব আজকের যুগেও যথেষ্ট আলোচনার বিষয়। তার সূচনার ইঙ্গিত এই অংশে রয়েছে। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যাকে বাংলা বর্ণমালা শেখাতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে ইংরাজী বানানরীতির মতই "বাংলা বানানও বাঁধন মানে না। যুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরীতে বসে এই নিয়ম ব্যতক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে বাহির হইলাম।" এই বিষয়ে লোকেন পালিতের সাহায্য রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল।

লোকেন পালিতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ভারতবর্ষে ফেরার পরেও রবীন্দনরাতের সহেগ সেই হাস্যমুখর দিনগুলি সমানভাবেই চলতেলাগল, ক্ষেত্র প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হল। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার কালেও লোকেন পালিতের বিপুল উৎসাহে তাঁর উদ্যম দ্বিগুণ বেগে ছুটে চলেছে। তাঁর পঞ্চভূতের ড়ায়ারি, অজস্র কবিতা লোকেন পালিতের মফস্বলের 'বাংলা ঘরে' বসে লিখেছেন। সারারাত ধরে কাব্যালোচনা চলেছে। লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বৃহৎ মর্যাদার আসনে স্থান পেয়েছিলেন।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, বিলাতে আরেকটি কাব্যরচনা আরম্ব হয়েছিল এবং সমাপ্ত হল কলকাতায় ফিরে এসে। মুদ্রিত হয়েছিল এবং সেই বয়সে তা রবীন্দ্রনাথের পছন্দও হয়েছিল। পাঠকরা সমাদর করেছিলেন। সর্বোপরি ত্রিপুরার মহাজার বীরচন্দ্রমাণিক্য উচ্চপ্রশংসা করে কবির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্বাবনা দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠারো। আরেকটু পরিণত বয়সে এই কাব্যটি সম্বন্ধে তাঁর লেখা একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। সেখানকার বক্তব্য হচ্ছে, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে মনের মধ্যে যে আলোছায়ার লীলাখেলা চলে, তাতে বাস্তবতা অপেক্ষা কল্পনার অস্ফুট মায়ালোক ধরা পড়তে চায়। মনে হ সকেলেই যেন আঠারো বছর বয়সে স্থির হয়ে রয়েছে। "আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নে সুখদুঃখের মত।"

রবীন্দ্রনাথ তার পনেরো-ষোল বছর থেকে বাইশ-তেইশ বছর বয়সকে বলেছেন "অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল। এই মানসিক অস্থিরতা তিনি বর্ণনা করছেন প্রচ্ছন্ন সহাস্য কৌতুক নিয়ে। মন তখন একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যহীন ছায়ালোকে

ঘুরে বেড়ায়। দৃষ্টির অসচ্ছতা আবৃত হয় অনুকরণপ্রবণতায়। কিন্তু নিজেকে ব্যক্ত করার একটা অদম্য বাসনা তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। মনের সেই আবেগের তপ্ত প্রবাহ যতক্ষণ না যথার্থ সত্যরূপের সন্ধান পায়, ততক্ষণ "তাহারা ব্যাধির মত "মনকে পীড়া দেয়"। এই যন্ত্রণা থেকে যখনই কল্যাণের পথ বেরিয়ে আসে, তখনই আনন্দরূপ সেখানে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বর্তমান যুগে ঔপনিবেশিকতার বিষ সম্পর্কে যখন আমরা তীক্ষ্ণ সমালোচনায় অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছি, অনেক যুক্তিজাল ছিন্ন করেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনের প্রান্তভাগে এসে তাঁর ভাবনাগুলি পাঠকদের গোচরে এনেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে তাঁর কালেই অর্থাৎ উনিশশতকে ইংরাজের জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যের মাদকতায় মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে তাঁর দেশজ মন সেখান থেকে এমন কিছু পায়নি, যা মনের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। সেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রণ খুবই উঁচুমানের সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন তাঁদের "হৃদয়াবেগের প্রবলতা" নিয়ে। এই আবেগের উত্তাপ একটা দুরন্ত উন্মাদনার সৃষ্টি করত। আমাদের নিরুত্তাপ জীবনাচরণে যে ঝড় তুলবে এই সৃষ্টিকর্ম, সে তো জানা কথা। স্নিগ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির বিপরীতে এই উত্তাল হৃদয় অনেক মলিনতাকে দৃশ্যমান করে। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্যকে মোটেই অসম্মান করেননি। য়ুরোপের রেনেশাঁর প্রেক্ষাপটে "মানুষ আপনার হৃদয় প্রকৃতিকে তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল।" আমাদের স্থির গতিহীন সমাজে যখন জীবনের বিকাশ প্রতি পদে ব্যাহত হচ্ছিল, সেইরকম সময়েই পাশ্চাত্য সাহিত্যের "স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অংশ নিয়েছিলেন সেই মত উত্তেজনায়, সংযমের লক্ষই ছিল না।

এবার রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলছেন একবিংশ শতাব্দীতে তার গুরুত্ব প্রবলভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। প্রত্যেক দেশের মাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। য়ুরোপের ইতিহাসে যে বজ্রকঠোর শৃঙ্খলের চেহারা ছিল, সেই বন্ধনমুক্তির বিশাল প্রয়াসই সেখানে দেখা গিয়েছিল। অন্তর ও বাহির ছিল সেখানে অঙ্গাঙ্গীবদ্ধ। আমাদের সমাজে সামান্য দোলাতেই আমরা "ঝড়ের ডাকের নকল" করতে গেলাম। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাধনায় এবং শিল্পসৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও সরলতার যে সমন্বয় দেখেছিলেন, তার পাশে ইংরাজী সাহিত্যের প্রবল অতিশয়তা তাঁকে ততটা অভিভূত করেনি। য়ুরোপীয় সাহিত্যকলাতেও আবেগপ্রাচুর্যের পরিবর্তে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের বিকাশ আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যপর্বে সেগুলি স্থান পায়নি, তাই আমাদের সাহিত্যরচনারীতিতে নিজস্ব স্বভাববৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে বাধা পেয়েছিল।

এর পরের প্রসঙ্গটি য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতা প্রবক্তা বেন্থাম মিল ও কোঁত। য়ুরোপে এটি স্বাভাবিক পর্যায়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আরোপিত। তাই নাস্তিকতার সমর্থন ছিল একটা আপাত-উত্তেজনার উপকরণ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তর্কের ঝড় উঠত। এই উত্তাল প্রবাহে বালক রবীন্দ্রনাথও আন্দোলিত হতেন। আবেগ-উত্তেজনাপ্রেমিক আরেকটি দলও ছিল, তাঁরা ভক্তিবিলাসী, কারণ পার্থিব সম্ভোগে তাঁদের অনীহা ছিল না। কিন্তু এতরকম আন্দোলনে সত্যসন্ধানের অনুপ্রেরণা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিকায় তাঁর জীবনদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যানুধ্যান রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা। তাঁর প্রথম যৌবনে সমাজবিবর্তনের যে চিহ্নগুলি ফুটে উঠেছিল, 'জীবনস্মৃতি' লিখবার কালে সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রমানসের একটি বড় দিক ধরা পড়েছে। সত্য একটা স্থির প্রত্যয়বোধ, "তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা নিতান্ত বাহুল্য, কিন্তু যেন তাহা ভাঙিয়াছে এমন একটা ভাবাবেগ মনের নেশার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক.....ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া।" এই কথা প্রসঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়টি তিনি শেষ করেছেন, বলছেন দেশসেবা করতে হলে দেশের যথার্থ মূর্তিটি অনুভবের মধ্যে আনা চাই। শুধু হৃদয়াবেগ দিয়া দেশসেবা হয় না।

বিলাতী সংগীত

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনার একটি বিশ্লেষণী দিক এই অংশের উপজীব্য। তিনি এখানে ভারতবর্ষের ও য়ুরোপের সংগীতের একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে কবির বক্তব্য অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসে পাঠকের মনে। ব্রাইটনে আশ্চর্য কণ্ঠশক্তিসম্পন্না এক গায়িকার গান তিনি শুনেছিলেন। আমাদের দেশের ওস্তাদী গায়কদের তিনি সমালোচনা করেছেন, গান গাইবার মধ্যে কণ্ঠের যথাযথ সুরারোপ তাঁরা করেন না, উপরন্তু সুললিত গায়নভঙ্গিতে বিদ্রূপ করেন। মানুষ আবরণকে উপেক্ষা করে যেন তাঁর গানের স্বরূপকে প্রকাস করতে চান। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আঙ্গিক বিন্যাস নিখুঁত হওয়া চাই। সোনে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সচলতা নিয়ে তারা অপরিসীম শক্তি দেখায়। তাদের গাইবার পদ্ধতিতেই শ্রোতাদের আকর্ষণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, "মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে।.....নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মত।" কিন্তু পুরুষকণ্ঠে একটা জীবন্ত মানুষের গানের উপলব্ধি হয়েছিল। তবে য়ুরোপীয় সংগীতের যথার্থ রসগ্রহণ করার মবোধ তাঁর তখন হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি অনুভব করেছেন যে, য়ুরোপের গান যেন মানুষের বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের গান জীবনসম্পৃক্ত হয়েও তাকে অতিক্রম করে মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরসের সৃষ্টি করে। "সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো সুব্যবস্থাই নাই।"

য়ুরোপের গানকে তিনি বলছেন রোমান্টিক। শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাকেই রোমান্টিক বলছেন যা মানবজীবনবৈচিত্র্যকে গানের সুরে রূপান্তরিত করে প্রকাশ করছে। আমাদের গানে সে প্রচেষ্টা সার্থকতামণ্ডিত হয়নি। সেখানে ব্যক্ত হয় বিশ্বচরাচরের অব্যক্ত ভাষা, প্রকৃতির তাপ, স্নিগ্ধতা, বিষণ্ণতা, নিস্পৃহতা ও পরিণামে প্রকাশের উল্লাস— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

বাল্মীকি প্রতিভা

বাল্মীকি প্রতিভা নাম দিয়ে আরম্ভ করলেও কবির স্মৃতির প্রেক্ষাপটে অনেক ঘটনা, অনেক আকাঙ্খা অনেক উচ্ছলতা ভেসে উঠছে। এক-একটি করে তিনি পট উত্তোলন করেছেন। বিলাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু বিলিতী সংগীত শিখেছিলেন, সেইসহেগ চোটিবেলায় দেখা, কবি ম্যুরের রচিত আইরিশ মেলডীজের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং শিখেছিলেন। দেশে পিরে বিলিতি গানের শ্রোতারা বলেছিলেন যে তাঁর গান গাইবার ও কথা বলার সুরে বিলেতের হাওয়া লেগেছে। দেশি ও বিদেশি সুরের সংমিশ্রণেই বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম। হার্বার্ট স্পেন্সরের লেখায় রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন যে, মনে যে কোনো আবেগ ব্যক্ত হবার সময়ে তার একটি বিশেষ সুর থাকে। নানারকম চর্চার মধ্য দিয়ে আরও সুন্দর করার আগ্রহ এই আবেগগুলিকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছে। বাল্মীকী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলি এই পরিপ্রেক্ষিকায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। নটিকের মধ্যে যে বিভিন্ন অভিব্যক্তি থাকে, তারই উপযোগী করে এখানে সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীতের একটি স্বাধীন বিচরণক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছে নাটকে। কোথাও বৈঠকি-গান-ভাঙা, কোথাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথে গতের সুরে বসানো, কোথাও বিলিতি সুরের প্রয়োগ দেখা গেছে। বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত নিয়ে নতুন পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই একটি বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নাটকটি অপেরাধর্মী নয় 'ইহা সুরে নাটিকা'। বিষয়টি সুরের দ্বারা অভিনীত, সঙ্গীতের স্বতন্ত্র গৌরব এখানে নেই। কবির বাল্মীকি প্রতিভা রসগ্রাহী শিক্ষিত মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করেছিলেন— এই বিষয় অবলম্বনে লিখেছিলেন 'কালমৃগয়া', সেখানেও পূর্ব পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। করুণরস এখানে মুখ্য ছিল। অনেকদিন পরে লিখেছিলেন 'মায়ার খেলা'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যই যথেষ্ট, বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মেলা মায়ার কেলা তেমনই নাট্যের সূত্রে গানের মেলা।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত প্রবাহের অবিশ্রান্ত গতির একটি চিত্র দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মার্গসংগীতের সুরকে পিয়ানোর সুরে নতুনরূপে দেবার চেষ্টা করছিলেন, এই পরীক্ষায় অনেক সময়েই রাগরাগিনীগুলি কিছু নিয়ম ভাঙার মধ্যে অপূর্ব সুরে রূপ নিত। সুরগুলি যাতে যথার্থ বাণীবহ হয়ে ওঠে, সেই চেষ্টায় কবি ও অক্ষয়বাবু শব্দযোজনার চেষ্টা করতেন। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়াতে প্রথাবিরুদ্ধ দুঃসাহসিকতার যে প্রমাণ দেখিয়েছিলেন, কেউই তার বিরুদ্ধে বলেননি, বরং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। সশ্রদ্ধ নম্রতায় রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান ও দুটি গানে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গলসংগীতের দু'এক স্থানের ভাষার ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। প্রাণশক্তির বিপুল আবেগে তখন রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছেন, নিত্যনতুন সুর প্রচন্ড উদ্যমে অবিশ্রান্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। "নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনই করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি।" তাঁর প্রেরণার উৎসমূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্ববিষয়ে উৎসাহকে তাঁর এগিয়ে যাবার অদম্য প্রচেষ্টাকে তিনি দক্ষ সারথির মত চালনা করেছিলেন।

সন্ধ্যাসংগীত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বিশাল পরিসরে সন্ধ্যাসংগীত রচনার কালটি তাঁর কাছে বিশেষ স্মরণযোগ্য। কারণ এই সৃষ্টিতে তাঁর প্রথম চেতনা যে তাঁর কবিতা একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব, তার কোনো পূর্বসংস্কার নেই। অন্তরের বাঁধভাঙা আবেগ দিয়ে তার সৃষ্টি। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলকাতায় না থাকায় তাঁর তিনতলার নিভৃত ঘরটিতে কবির হৃদয়চারী নিভৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন ক্রমশঃ ব্যক্ত হতে চাইছিল। আপন মনের ধ্যান দিয়ে তিনি লিখেছেন আর মুছেছেন শ্লেটের গায়ে; যা লিখেছেন তা তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত। সেখানেই স্বাধীনতার আনন্দ। ছন্দের দৃঢ়বন্ধনকে রক্ষা করলেন না, কারণ সবটাই নিজের হাতে গড়ার দুর্দম বাসনা, "তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন নয়"। এখানেও আনন্দিত ও বিস্মিত শ্রোতা ছিলেন অক্ষয়বাবু। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের ছন্দ রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতাতেই অনুসরণ করেছেন, তা তিনমাত্রামূলক। কিন্তু "এই বেগবান গতির নৃত্য" রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন সন্ধ্যাসংগীতে। শৃঙ্খল ভাঙাতেই তাঁর আনন্দ, তাঁর কাব্যের গতির বহমানতা। তিনি নিজেই বলেছেন, কাব্যবিচারে সন্ধ্যাসংগীতের উৎকর্ষ তেমন না থাকলেও কবিতারচনায় কবির স্বাধীন মনের উন্মোচনই তাঁর কবিজীবনের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়েছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য ও অনুভূতির বিবর্তনের একটি চিত্র এই অংশে পরিস্ফুট। ব্যারিষ্টার হবার আশায় রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহর্ষি তাঁকে ডেকে পাঠান। দ্বিতীয়বার আবার ব্যবস্থা হলেও ঘটনাচক্রে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার আগের দিন তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকেল কলেজ হলে। বিষয়টি ছিল সংগীত এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল গানের সুর গানের কথাকে ফুটিয়ে তুলবে, সকণ্ঠে গান গেয়ে তিনি তার প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং উচ্চপ্রশংসিতও হয়েছিলেন। "জীবনস্মৃতি"তে তিনি জানাচ্ছেন যে পরবর্তীকালে সেই মত তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন। কারণ গানের যে বিশিষ্ট প্রকৃতি, তাকে কখনই কথার প্রাধান্যে দমন করা যায় না। কারণ কথা "গানেরই বাহনমাত্র"। গানের বাক্য শেষে সুরের অনুরনন, সেইখানেই তার অনির্বচনীয়তা। কিন্তু আমাদের দেশে চিরকালই কথায় সুর বসানো হয়েছে। তাতে যে মাধুর্য প্রকাশ পায়নি এমন কথা বলা যায় না। তবুও কথাকে অতিক্রম করে সুরের একটা গভীর সুদূরতার মধ্যে মনকে টানে। এই অংশে "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী"—তাঁর এই বিখ্যাত গানটি কীভাবে সুরগুঞ্জনের মধ্য দিয়ে এক অপরূপ চিত্র রচনা করেছিল, সংক্ষেপে সে ঘটনা বলেছেন। "খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কমনে আসে যায়....." —বাউল গানের এই সুরেও তিনি উপলব্ধি করেছেন "এই অচিন

পাখীর নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।"

গঙ্গাতীর

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শিশুকাল থেকে অনেক আনন্দ উজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তের সাক্ষী গঙ্গার জলপ্রবাহ। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা স্থগিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ এলেন চন্দননগরে গঙ্গার তীরে মোরান সাহেবের বাগানে। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন। গঙ্গার জলপ্রবাহের সহেগ প্রকৃতির উদাহর অতচ রাজকীয় মনোরম পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে এখানে ব্যক্ত করেছেন। ঘনঘোর বর্ষায় বর্ষারাগিনীর গান, সূর্যাস্তের সময়ে নৌকায় জ্যোতিদাদার বেহালাবাদন ও রবীন্দ্রনাথের গান সন্ধ্যায় পুরবীর বিষণ্ণ বেদনার বেহাগের আনন্দে রূপান্তর, পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্ত থেকে চন্দ্রোদয় তারপর অন্ধকারে নিবিড় তীরের বনরেখা, শান্ত নদী— রবীন্দ্রনাথের কাছে "সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মত।" মোরান সাহেবের বাড়ীর বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে বিসেষ উল্লেখযোগ্য দুটি ছবি। এক ঘন পাতায় ঘেরা গাছের ডালে নিভৃতে একটি দোলায় দু'জনে দুলছে, আরেকটি ছিল উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীর দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে। এই ছবি দুটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার পাখা অনেক দূর উড়িয়ে দিত। সন্ধ্যাসংগীতের যে সৃষ্টিকণা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এখানেও সেই কাব্যরচনার কাজই চলছে। সন্ধ্যাসংগীত তার অস্পষ্ট হৃদয়ানুভূতি প্রথাভাঙা ছন্দ নিয়ে কাব্যসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তার কাব্যজীবনের দারায় সন্ধ্যাসংগীত সূত্রহীন নয়। তিনি লোকালয়ের কলরবের মধ্যে তেকেও ছিলেন নিভৃতলোকের বাসিন্দা। তবুও সকল মানুষের আবেগের রূপসৃষ্টি এক ফতেআসেনা, নানা পরিবেশের নানা অভিব্যক্তি। কোথাও নিজেক প্রকাশ করতে না পারার বেদনা কোথাও অস্পষ্টতার বিষণ্ণতা। মানুষ এক এক পরিস্থিতিতে কাব্যের আধারে তার বাণীকে রূপ দেয়। সেই প্রেক্ষিতে সন্ধ্যাসংগীতের এক মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা করেচেন রবীন্দ্রনাথ। বাইরের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্কটি যখন স্পষ্ট হয় না, তখন কবিপ্রাণের ক্রন্দনও অশ্রুত থাকে। এক অব্যক্ত বিষণ্ণতা তাকে ঘিরে রহস্যময় হয়ে ওঠে। অন্তরের অ-প্রকাশের ব্যর্থতার জাল ছিন্ন করে কবিসত্তা উদগ্রীব হয়েছিল আত্ম-উন্মোচনে।" সেই যুগের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে। " একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় যে মালাটি দিয়েছিলেন সেইটিই বঙ্কিমচন্দ্র পরিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সন্ধ্যাসংগীতের জন্যই এই পুরস্কার।

প্রিয়বাবু

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন। তিনি 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে বিশেষ তুষ্ট হননি, কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীতে' তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশ্বাসাহিত্যের আসরে যেমন তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল, তেমনই আত্মবিশ্বাস ছিল নিজের মত প্রতিষ্ঠায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, প্রিয়বাবুর ভালমন্দলাগা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনের কাব্যসৃষ্টিতে যে নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি।

প্রভাতসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালে ছোট ছোট রঙীন কল্পনা নানা আকারে রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার দিত। সেই রঙিন ভাবনাগুলিকে তিনি গদ্যের আকারে রূপ দিয়েছিলেন, যা পরে 'বিবিধ প্রসঙ্গ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেও ছিল নিজের মত করে লেখার সঙ্কল্প। যদিও প্রভাতসঙ্গীত রচনার ইতিহাস সুবিদিত, তবুও রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর "হৃদয় আজি মোর কেমনে গলে খুলি"— এই বৃত্তান্তটুকু জীবনস্মৃতিতে অতি সরসভাবে বলা হয়েছে। জ্যোতিদাদার সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকাকালীন এক বিচিত্র অচেনা অনুভূতি তাঁর মনের গভীরে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। " তখন তিনি 'বউ ঠাকুরানীর হাট' ও 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখছেন। একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ার ছাদে সন্ধ্যার আলোয় বিশ্বচরাচর তাঁর চোখে সুন্দররূপে প্রতিভাত হল। এ এক অজানা অভিজ্ঞতা। তারপর এল সেই বিশেষ

দিনটি। সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে গাছপালার মধ্য দিয়ে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য মনের বহিরাবরণ ভেদ করে "সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি জন্ম নিল সেই পরম লগ্নে। এতদিন চোখ ভরে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছেন, আজ তা অন্তরমুখী হয়ে সত্তার গভীর থেকে বেরিয়ে এল। বলছেন রবীন্দ্রনাথ—"সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" জীবনস্মৃতির কথনে সেই কবিই আত্মপ্রকাশ করলেন যিনি চৈতন্য দিয়ে অখন্ডতার উপলব্ধিকে তাঁর জীবনসাধনায় অচ্ছেদ্যবন্ধনে বেঁধেছিলেন।

এরপর তাঁর হিমালয়ভ্রমণ, কিন্তু সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তিনি মানবজীবনের কলধ্বনিকে মেশাতে পারলেন না। তবুও মনের ব্যাকুলতা রইল, সেই আবেগে সৃষ্টি করলেন 'প্রতিধ্বনি' কবিতা। বিশ্বের সৌন্দর্য 'প্রতিঘাত' পেয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। সেইখানেই কবির ভালবাসা। যে জটিলতার অরণ্যে কবির পথভ্রষ্ট মন অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল এতদিন, সেই অরণ্যেই তীব্র আলোর ছটায় কবি বিশ্বময় এক সর্বব্যাপী আনন্দকে প্রত্যক্ষ করলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর উপলব্ধির দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি প্রসঙ্গে। 'প্রভাতসংগীত' সম্বন্ধে নানাস্থানেই তাঁর অভিমত দিয়েছেন। সর্বব্যাপী হৃদয়-অভিযানের যে দুর্দমনীয় চলমানতা তা প্রথম যৌবনের ধর্ম। ক্রমশঃই তা ঘনীভূত হয়ে সীমা ও অসীমের রহস্যালোকে প্রবেশ করে। "প্রভাতসংগীত" আমার অন্তঃপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেজন্য ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছবিচার নাই।"

এখানেও তাঁর শিশুকালের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। চেতন জগৎ প্রসারিত হত কল্পনার জগতে। কিন্তু বুভুক্ষিত হৃদয়ে আলো জ্বলেনি। সেই ব্যথা থেকে ঝরে পড়েছে সন্ধ্যাসংগীত কিন্তু শিশুর চোখে দেখা সেই উপলব্ধির ওপর থেকে আবরণ সরে গিয়ে হঠাৎ যেন বিশ্বসৌন্দর্য নতুন রূপে ধরা দিল কবির চোখে। একটি অনুভবকে কেন্দ্র করেই পর্ব থেকে পর্বান্তরে তাঁর যাত্রা, সেই যাত্রার পথের আনন্দের প্রথম সঙ্গী 'প্রভাতসংগীত'।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ঠাকুরবাড়ীর সন্তানরা প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন নিঃসন্দেহে, তাঁরা সর্বদাই একটা গঠনমূলক চিন্তায় সক্রিয় থাকতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি পরিষৎ স্থাপনের সঙ্কল্প করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি হলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সভ্য হয়েও নিষ্ক্রিয় রইলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একক প্রচেষ্টায় ভৌগলিক পরিভাষা নির্ণয়ের কাজে হাত দেওয়া হল। কিন্তু অল্পদিনেই সমিতি বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অক্লান্ত কর্মীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সদাপ্রসন্ন রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল, বহু নতুন বিষয়ও তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর বাংলাভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রবীন্দ্রনাথকে উপকৃত করেছিল। তাছাড়া তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন সমিতির তিনি অন্যতম প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁর কাজ করানোর ক্ষমতা ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনার কাজে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর তেজস্বী চরিত্রকে প্রতিপক্ষ ভয় পেত। তিনি ছিলেন মননশীল লেখক। সর্বোপরি তা মনুষ্যত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই তাঁর স্নেহধন্য ছিলেন। কিন্তু আক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত মনস্বীপুরুষ দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান অর্জন করেননি।

কারোয়ার

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কারোয়ার জজ থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথরা সদলবলে সেখানে গিয়েছিলেন। নগরটি বোম্বাই-এর দক্ষিণে কর্ণাটের প্রধান নগর—"তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমির মলয়াচলের দেশ।" পাহাড়বেষ্টিত এই সমুদ্র-বন্দরটির বেলাভূমি যেন আকাশের নীলিমায় মিশে যেতে চাইছে। এ এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঝাউগাছের

অরণ্যের পাশ দিয়ে শীর্ণ কালানদী পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। একদিন তাঁদের নৌভ্রমণ হয়েছিল এই নদীতে, নৌকায়। মোহানার কাছে বালুতট দিয়ে হেঁটে ফেরার কালে নিশীথ রাত্রে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মায়াময় সৌন্দর্য তাঁদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। অসীম গভীরতায় মগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে কবিতাটি যে ভাল এমন দাবি তিনি করেননি, স্মরণের মধ্য দিয়ে অনেক পরিমার্জিত হয়েছে। এখানে রচনার বিষয়টিই প্রধান। তবুও মনে হয় এই অভিজ্ঞতাঅর্জনের উল্লাসে তিনি যা রচনা করলেন, সেই অল্পবয়সের স্মৃতির মালা গাঁথতে বসে তাকে তিনি বর্জন করেননি, মমতাভরে স্থান দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

কারোয়ারে বসেই এই নাট্যকাব্যটি লেখা। 'জীবনস্মৃতি'র প্রেক্ষণে মনে করা অসংগত নয় যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনাটিকে সাহিত্যসৃষ্টির ধারায় রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ স্থায়ী মূল্য দিয়েছেন। মানবজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকেই বৃহতে উত্তরণ হয়, বহু রচনায় তার পরিচয় আছে। সন্ন্যাসী সংসার মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করে অনন্তর ধ্যান করেছে, কিন্তু বোঝেনি অনন্ত অসীম আছে সীমারই মধ্যে; বহু রচনায় তার পরিচয় রয়েছে। সন্ন্যাসী সংসারের মায়াবন্ধনকে অনন্তর ধ্যান করে গেছে, কিন্তু বোঝেনি, অনন্ত অসীম আছে সীমারই মধ্যে। বালিকার স্নেহপাশ উপেক্ষা করতে না পেরে অনন্তের ধ্যান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সংসারসীমায়। কারণ "সীমার মধ্যেও সীমা নেই"। কারোয়ার সমুদ্রের দূরবিস্তৃত রূপ ভুলিয়ে দেয় প্রত্যক্ষ বাস্তব সংসারের রূপকে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অচেতনতা, আরেকদিকে মনগড়া অসীমের ধ্যান—প্রেমের আশ্রয়েই এই দুইএর মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরী হয়। আরেকদিকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্ধকার পথের অনিশ্চয় পদক্ষেপ থেকে বেরিয়ে এসে তবেই প্রকৃতির আনন্দময় স্পর্শ পেয়েছিলেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সেই অনুভূতিই অন্য রঙে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি—"পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।" এই তত্ত্বব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনায় ছড়িয়ে আছে। এই অংশের আরেকটি ঘটনা—কারোয়ার থেকে ফিরে ১৮৯০ সালে ২৪ শে অগ্রহায়ণ, বাইস বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল।

ছবি ও গান

'প্রভাতসংগীতে'র পালা শেষ হয়ে আরম্ভ হল 'ছবি ও গান'। তখন বাস করছিলেন চৌরঙ্গীর নিকটবর্তী সার্কুলার রোডের একটি বাগানবাড়ীতে। লোকালয়ের দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তিনি নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটি ছবি আঁকতে চাইছিলেন। পটতুলিতে না হলেও কাব্যে ও ছন্দে সেই চিত্র তাঁর হাতে বর্নময় হল। এই নতুন পালায় তিনি বলছেন, অনেক বেহিসেবী শব্দবর্ণ রয়েছে। কিন্তু সামান্যকে হৃদয়ের রসে জারিত করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। 'জীবনস্মৃতি' লেখার কালে তাঁর পরিণত উপলব্ধিতে তিনি দেখিয়েছেন বাইরের অতি তুচ্ছতার মধ্যেও বিশ্ববোধের অনুভূতি থেকে থেকে হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে ওঠে; তার জন্য সচল জীবনপ্রবাহকে ত্যাগ করে দূরে যেতে হয় না। সত্যবোধ সেখান থেকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

বালক

সেজবউঠাকুরাণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছোটদের জন্য বালক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং বাড়ীর বয়ঃকনিষ্ঠরা মুখ্যতঃ সেখানে লিখবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা যথেষ্ট না হওয়ায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন লেখা দেওয়ার জন্য। একটি স্বপ্নলখ গল্প রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল, যার থেকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সৃষ্টি। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত ছিল গল্পের পটভূমি, অন্তরধর্মে ছিল

প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্ব। স্বপ্নে আভির্ভূত বালিকার রক্ত দেখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, রূপ নিল নিদারুণ সংঘর্ষের বলিদান হিসাবে জয়সিংহের আত্মদানে। প্রতিমাসেই 'বালকে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।

এর পর রবীন্দ্রনাথ লঘু চালে তাঁর নির্ভার জীবনের কিছু ঘটনা বলেছেন। সংসারের রূঢ়তার সঙ্গে তখনও তাঁর তেমন পরিচয় হয়নি। পথে মানুষের আনাগোনা, বর্ষা, শরৎ, বসন্তের আগমন সবই তিনি উপভোগ করতেন। কিছু আবেগতাড়িত অনুভূতি তাঁকে চঞ্চল করত। "দু'একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত।" রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এই ছলনার প্রয়োজন ছিল না, তিনি অকৃপণ হাতেই বিনা বিচারে সাহায্যদানে প্রস্তুত ছিলেন সেই সময়ে। কিন্তু সাহায্যের জন্য অত্যাচারের মাত্রা এমনই বাড়ল, যাতে ছেদচিহ্ন টানতে তিনি বাধ্য হলেন।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কথাও এখানে জানিয়েছেন। প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তিনিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান ও সাহিত্যালোচনার সঙ্গী। রবীন্দ্রজীবনের এই পর্যায়টি উপভোগের আনন্দ নিয়ে গঠিত। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের সূচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং এই সম্মিলনীতে কবিতাপাঠের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ অতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন—সকলের মধ্যে থেকেও যিনি স্বতন্ত্র। এতদিন তাঁর লেখার মাদকতায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে দেখার পর তিনি শুধু অভিভূতই হননি, বিস্মিতও হয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, "তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল"। পরে তাঁকে দেখার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ আসেনি।

জীবনের স্তরে স্তরে নিজের আচার আচরণ মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন। তিনি লেখকদলে সর্বকনিষ্ঠ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। ইংরাজ কবিদের নামজুড়ে নামকরণের প্রবণতায় তিনি 'বাংলার শেলি' হয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই তুলনাকে একেবারেই সমর্থন করেননি। বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, ভাবুকতা, সাজপোষাক—কিছুই তখন পরিণত ছিল না—"অত্যন্ত খাপছাড়া হইয়াছিলাম"।

অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' পত্রিকায় দু' একটা লেখা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' অপেক্ষা ধর্মালোচনায় বেশি আগ্রহী হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও একটি গান ও বৈষ্ণব পদ অবলম্বনে ভাবোদ্বেল গদ্যরচনা করেছেন। প্রায় এই সময় থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। খুব অল্পকথায় রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। প্রথম শশধর তর্কচূড়ামণির কথা, বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করান। তখন হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করছে এবং তার প্রচারও হচ্ছে। তবে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন 'দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়োসফি এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল"। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারেননি, 'প্রচার' পত্রে তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবও ছিল না। রবীন্দ্রনাথও পিছিয়ে ছিলেন না। ধর্মান্দোলনের তর্কবিতর্ক কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুক নাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল'। রবীন্দ্রনাথ 'মল্লভূমি'তে উপস্থিত ছিলেন। সেই উত্তেজনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল। 'ভারতী' ও 'প্রচারে' তার বিবরণ রয়েছে। কিন্তু বিরোধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি তাঁর ক্ষমাসুন্দর স্বভাবের গুণে বিরোধের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছিল।

অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

জাহাজের খোল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনায় দেশলাই কাঠি প্রস্তুত করার কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতি চালানোর জন্য প্রচুর উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু দেশলাইও জ্বলেনি এবং কলে একটিমাত্র গামছা প্রস্তুত হয়েছিল। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদার খেয়ালী ভাবনাগুলি পাঠকদের জানিয়েছেন। কিন্তু হাসির অন্তরালে তাঁর একটি গভীর বেদনাবোধ ছিল। কারণ এইসব বেহিসাবি মানুষরা কর্মক্ষেত্রকে উৎসাহের আধিক্যে ফলফুলশোভিত করার চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যন্ত তা নিষ্ফল হয়। কিন্তু সেটা আপাতদৃষ্টিতে। তাঁরা সৃষ্টিকর্মে যে প্রেরণার ঢেউ তোলেন, তাতে অনেক কিছু ভেসে গেলেও ক্ষেত্রের উর্বরতা হারায় না। সেইখানে যখন নতুন সৃজনের ফুলটি ফুটে ওঠে, তখন সেই উৎসাী প্রাণপুরুষরা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান, তাঁরা চিরদিনই 'ক্ষতিবহনে ভারাক্রান্ত', কিন্তু তার জন্য গতি থামে না।

'জাহাজের খোল' এমন একটি ঘটনাকে বর্ণনা করছে, যেখানে একটা অভিনবত্ব সকলকেই উৎসাহিত করেছে। সাতহাজার টাকা খরচ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন একটি খোল কিনেছেন, যাতে ইঞ্জিন বসিয়ে কামরা লাগিয়ে দিলেই জাহাজ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা পাবে। তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিলেন বিলাত কম্পানি, একটির পর একটি জাহাজ তৈরী হল, যাত্রীবৃধির জন্য ভাড়া অত্যন্ত কমানো হল, এমন কি বিনা পয়সায় খাওয়ানোও হত। শুধুমাত্র যাত্রীতে জাহাজ ভর্তি হল না, হল "ঋণে এবং সর্বনাশে। তাঁর 'স্বদেশী' নামে জাহাজ ডুবে গেল, তখন তিনি কপর্দকশূণ্য। দেশের লোক তাঁকে না বুঝলেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর অন্তরসত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিরাসক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন থেকে লাভবান হলেন— "সে তাঁহার এই সর্বস্ব ক্ষতিস্বীকার"।

মৃত্যুশোক

মাতৃহারা হওয়ার বেদনা তীব্রতা নিয়ে আসেনি শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবনে। একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, এই উপলব্ধিটুকু হয়েছিল। প্রাণহীন মায়ের চেহারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছিল না। এক পরম শান্তির রূপ প্রত্যক্ষ করল বালকপুত্র। জীবন ও মৃত্যুর দুস্তর ব্যবধান বুঝবার মত বয়সে তখনও তাঁর হয়নি শুধু শ্মশানযাত্রার সময়ে মায়ের চিরবিদায় একটা শূন্যতার অনুভূতি ছড়িয়ে ছিল সমস্ত মনে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তখন উপাসনায় স্তব্ধ।

বাড়ীর তখনকার কনিষ্ঠা বধূ মাতৃহীন বালকদের পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এ বিচ্ছেদ চিরদিনের, কিন্তু শিশুমনের অপরিসীম প্রাণশক্তি সেই মৃতার কালিমায় বাঁধা পড়ে না, ক্রমশঃ সে স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। শুধু শুভ্র বেলফুলের কোমলতায় শিশুকবি যেন মায়ের সুন্দর হাতের স্পর্শ পেতেন।

কিন্তু চব্বিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলেন, সেই বিচ্ছেদের অনুভূতি তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টিকর্মে বিধৃত হয়ে আছে। কার মৃত্যু, সে সম্বন্ধে এখানে রবীন্দ্রনাথ নীরব। 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষফাগুনের মেলায় যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন এই মৃত্যু তার শীতল স্পর্শ দিয়ে একটা বিরাট গহ্বর তৈরী করল তাঁর মনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারে এক অজানা পথে তিনি ঘুরতে লাগলেন, সবই আগের মতই আছে শুধু হারিয়ে গেছে তাঁর মনের সবথেকে কাছের মানুষটি। কিন্তু চিরদিনই আলোর সন্ধানে কবির অন্বেষণ, তাই না থাকার গভীর বিষাদকে অতিক্রম করে আলোর দীপ্তিতে সেই হারানো মানুষটি যেন নতুনভাবে উদ্ভাসিত হবার চেষ্টা করল। চলমান জীবন জন্মমৃত্যু বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে, সে ভাবে কেউ আবদ্ধ নয়—সত্যের এই নিশ্চিত রূপ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন তখন। জীবনের ছন্দে তাঁর চিরদিনের আকর্ষণ সেইসঙ্গে সত্য উপলব্ধির এক প্রশান্ত বৈরাগ্য তাঁকে ঘিরে ছিল। বেশভূষায় নির্লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু জগৎকে নতুন করে চিনলেন

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এতদিন কাছে থেকে জীবনের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আহরণ করেছেন; এবার তাঁর অনুভূতিতে জাগল সেই কথা যে, সৌন্দর্যকে কাছ থেকে নয়, দূর থেকে অন্তর দিয়ে স্পর্শ করতে হয়; আর মৃত্যু সেই সুন্দরকে দেখার জন্য দূরত্বের সৃষ্টি করে। "আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তারা বড়ো মনোহর।"

শুধু রাত্রির অন্ধকারে তাঁর চোখ যেন কাকে খুঁজে ফিরত অসীম আকর্ষণ নিয়ে, সেই অন্ধকারের আবরণকে উন্মোচন করে সকালের প্রথম সূর্যোদয়ের আগে জীবনের বিস্তৃত পরিধির স্বচ্ছ সুন্দরকে চিনিতে দিত।

বর্ষা ও শরৎ

জীবনের দুটি পর্যায়কে এই অংশে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। এখানেও সেই সত্যবোধের অনুসন্ধিৎসা, যা জীবনের বহুবিধ প্রেরণা ও উপলব্ধি থেকে তৈরী হয়েছে।

তাঁর শিশুমন বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের উদ্বেলিত হয়ে উঠত। বর্ষাস্নাত বাস্তবজীবনের ছবি সেই শিশুর স্মৃতি পটে আঁকা ছিল। জলের তোড়ে বারান্দা ভেসে যাচ্ছে, সেখানে ছুটে বেড়ানোয় প্রবল আনন্দ পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের মধ্য থেকে বৃষ্টির জলধারা, চারিদিক অন্ধকার, মেঘের গর্জন, পন্ডিতমশাই ছুটি দিয়েছেন—এই মাতামাতির নিখুত চিত্র ফুটে উঠেছে। আর তারই মধ্যে এই শিশুটির মন চলে গেছে লোকালয় ছাড়িয়ে তেপান্তরের মাঠে। শ্রাবণের ধারায় রিম্‌ঝিম্ শব্দ, বৃষ্টি না আসার প্রার্থনা, জলে ভাসমান গলি—বর্ষা ঋতু যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়।

পঞ্চাশ বছরের রবীন্দ্রনাথ এক শিশুর চোখ দিয়ে বর্ষাঋতুকে দেখেছেন, কিন্তু শরতের কথায় তাঁর পরিণত মনের দেখাটাই বেশি সক্রিয় হয়েছে। তিনি বলছেন সোনাগলানো রোদে ঝলমল শরৎঋতুর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। গানের আবেশে তাঁর মন মেতে থাকত। যৌবনের দিনগুলিতে শরৎঋতুর মাদকতা কবির মনকে নিয়ে যেত আলোর জগতে; সেই ঋতুর আকাশ বাতাস তাঁর সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। দুটি বয়সে দুই ঋতুকে দেখার মধ্যে যে দৃষ্টির কত বিবর্তন ঘটে, সে কথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর স্মৃতির পাতা খুলে। বর্ষা এসেছিল তাঁর কাছে বহির্বিশ্বের সাজসজ্জা নিয়ে আর শরৎ যেন মানুষের সুখদুঃখের লীলাসঙ্গী।

তাঁর কবিতা এখন মানবজীবনকে মুখ্যতঃ আশ্রয় করেছে। কিন্তু সে জীবন বড়ো জটিল, চলার পথে পথে বাধা আর নানা আবর্তন-বিবর্তন—"মনের সঙ্গে মনের আপোস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া।" জীবনের সেই বহুমুখী বিচিত্রতার মধ্য দিয়েই তাঁর কবিতা ঝরণার মত উচ্ছ্বসিত কলধ্বনিতে ব্যক্ত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমল' সেই গানেরই প্রস্রবণ। পৃথিবী ও তার মানবজীবন তাঁর আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই বিদায় চান না এই অপরূপ ধারণার কোল থেকে যেখানে অন্তহীন মানবজীবনস্রোত অখন্ড ধারায় এগিয়ে চলেছে, তার নিজের মত করে।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

জীবনস্মৃতির অনেকটাই জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা কালে আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তিনি কেমব্রিজে যাচ্ছিলেন ব্যারিষ্টার হবার জন্য। কয়েকদিন তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে। বিলাত থেকে ফেরার পর তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আশুতোষ চৌধুরী আরও ঘনিষ্ঠ হন। তখন তিনি ব্যারিষ্টারী করে বিশেষ অর্থোপার্জ্জন না করলেও সাহিত্যচর্চায় ক্লান্তি ছিল না। বিরাট পড়াশুনা বা গ্রন্থাগারপ্রীতি—এগুলি কিছুই ছিল না তাঁর; কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের যে নির্যাসটুকু তিনি পেয়েছিলেন তাকেই উপলব্ধি করা যেত। ফরাসী কাব্যসাহিত্যে তাঁর উৎসাহ ছিল। মানবজীবনরস সমৃদ্ধ 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলিতে তিনি কোনো কোনো

ফরাসী কবির সঙ্গে মিল দেখতেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন জীবনের দ্বার খুলে প্রবেশ করার যে অপরিতৃপ্ত বাসনা, সেই অতৃপ্তিই 'কড়ি ও কোমলে'র মূল ভাব। আশুতোষ চৌধুরী উৎসাহভরে এই কবিতাগুলি সাজিয়েছিলেন। প্রথমেই ছিল—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'— এখানেই কবির জীবনেরপিপাসা উৎসারিত হয়েছে। বাল্যের বন্ধুত্ব ঘুচে গেছে যৌবনে এসে তবুও তাঁর মনে হচ্ছে জীবনের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়েই তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন, ভিতরে যাওয়ার অধিকার তখনও হয়নি।

কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথ একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান বলেই যে সকল মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারেননি, একথা শুনলেও তাঁর আক্ষেপ ছিল না, কারণ অনুমানটি সত্য নয়। কারণ জীবনের মাঝখানটাও বাঁধা পুকুরের মত, ছোট ছোট গন্ডীতে বাঁধা বিচ্ছিন্নতায় ঘেরা সেই জীবন। ভৃত্যরাজকতন্ত্রে খড়ির দাগের মধ্যে বসে যে উন্মুক্ত জীবনটির জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকতেন, যৌবনে এসে সেই তাকেই ধরতে চেয়েছেন। 'সে যে দুর্লভ, দুর্গম, দূরবর্তী'। কবিরে এই বিষণ্ণতা কিন্তু নৈরাশ্য সৃষ্টি করেনি তাঁরমনে। 'কড়ি ও কোমল'এ তিনি যথেষ্টই স্পর্শকাতর ছিলেন। বর্ষার পর যেমন শরৎ নিয়ে আসে নতুন ফসলের সম্ভার, 'কড়ি ও কোমলে সেই ফসলের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। এবার আরও বিস্তৃত হবার ব্যাকুলতা।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, জীবনের বিচিত্রের গতিপথে একটার পর একটা স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। মানবজীবনের জয়-পরাজয় ভালোমন্দের একটা ঘূর্ণাবর্তে পড়া যে জীবন, তার ভার বড় কম নয়, এই নতুন চেতনার সূচনাতেই তিনি তাঁর স্মৃতিলেখার পাতা বন্ধ করেছেন।

কঠিন পথের যাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সত্তার বিকাশের একটি অস্পষ্ট অনুভূতির কথা বলেছেন। "আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটিঅন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।" তিনি জীবনচরিত লেখেননি, তাঁর অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীমনের আনন্দময় সত্তাটির ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস, তারই উন্মোচনের অভিপ্রায় নিয়েই বোধকরি এই স্মৃতিচিত্র। জীবনের পর্বে কোথাও মন বর্ণময় হয়ে উঠেছে, কোথাও জীবনের কোলাহল থেকে দুরে সরে গেছে, সেইসঙ্গে ঘটেছে সমকালের বহু মনীষীর সংস্পর্শ, গতানুগতিকতার বাইরে অবস্থান, নতুন সৃজনের তীব্র আকাঙ্খা— সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসবিকাশের রূপ ধরা পড়েছে বিভিন্ন পর্বের সমহারে। 'জীবনস্মৃতি' থেকে আরম্ভ করে 'ছেলেবেলা' ও 'আত্মপরিচয়ে' যে উপলব্ধি তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের মহান অভিপ্রায়ের পরিচয়বাহী হয়েছে।

৫.৪ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

'নবজাতক' কাব্যের সূচনার একটি অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ফুল চোখে দেখবার আগেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিকের হাওয়ায়।" 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের এমনই একটি বৃত্তান্ত যেখানে পর্বে পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনভূমিতে সেই 'ফুলগন্ধ'কে ছড়িয়ে দেবার আভাস রয়েছে। অপরিণত মন সেই সৌরভকে একভাবে গ্রহণ করেছে, আবার পরিণতির দিকে যত অগ্রসর হয়েছে, মননজাত অভিজ্ঞতা ততই নির্যাসটুকু বার করে নানা ভঙ্গীতে কাব্যসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। এই পালাবদলে বৈচিত্র্যের সন্ধান থাকলেও কবিজীবনের প্রথম লগ্ন থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কাব্যধারায় একটা সংযোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সেটি হচ্ছে সবরকম বন্ধনমুক্তির প্রেক্ষাপটে জীবনের বিপুল গতিবেগ, সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও সেই আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে সত্যবোধের প্রতিষ্ঠা।

'জীবনস্মৃতি'র বিভিন্ন অধ্যায়ে কবির অভিজ্ঞতায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বিশেষ তাৎপর্যবাহী, আত্মবিকাশের আনন্দ সেখানেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেইটুকুতেই সবটা নিবদ্ধ নয়, সরস কৌতুক নিয়ে বর্ণিত শিক্ষারম্ভের পর্ব থেকে দেখতে হবে। সেখানে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, তার প্রভাব রয়েছে পরবর্তীকালের অনেক কবিতায়। 'শিক্ষারম্ভ' দিয়ে তিনি আরম্ভ করেছেন। সেই স্মৃতির দিকে বার বার ফিরে দেখেছেন পরম মমতা নিয়ে। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে লিখছেন 'আকাশপ্রদীপ' কাব্য, সেখানে "দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা নয়ন ছলোছলো" (আকাশপ্রদীপ)। তখনও 'ছেলেবেলা' লেখেননি। জীবনবৃত্তান্তকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন একটি গ্রন্থে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। তাই প্রশ্ন জাগছে—

'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কি অর্থ ইহার মনে ভাবি।

বার্ধক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই শিশুমনের স্মৃতি মন্থন করছেন—

"মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে। (যাত্রাপথ)

কিম্বা— "মাষ্টারি শাসন-দুর্গে সিধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে"। (স্কুল-পালালে)

এ যেন 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যভাষা। স্মরণ করছেন—পাতালের নাগলোক, বৃদ্ধ বট, বাড়ীতে নতুন বৌ আসা যে কবির মনকে "বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় করে"—। 'বধূ' কবিতাটির অন্তরালে একটি কাহিনীর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সাবেক কালের খাজাঞ্চী কৈলাস মুকুয্যে ভারি রসিক লোক। তাঁর দ্রুতবেগে ছড়া বলা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করত। "সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল।" সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলায় ঝলকের মন মেতে উঠত। তাছাড়া 'বধূ' কবিতায় প্রথম ছত্রে 'ঠাকুরমার' শব্দটি 'মুকুজ্জে' শব্দটির পরিবর্তে ছিল এবং তিনি নিঃসন্দেহে কৈলাস মুকুয্যে।

বালক রবীন্দ্রনাথের ছাদে এসে যে চারিদিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জীবনস্মৃতিতে 'ধ্বনি' কবিতাটিও সেই স্মৃতি বহন করে লেখা। শুধু তফাৎ হচ্ছে 'জীবনস্মৃতি'র সরস মনটি বাস্তবের অনেক কঠিন অভিজ্ঞতা পেরিয়ে যখন বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে তখন পুরোনো দিনের কথায় বেজে উঠেছে এক বিষণ্ণ বেদনা—

'আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন'।

'ঘর ও বাহির' অংশে রবীন্দ্রনাথ গণ্ডীবাঁধা জীবনের কথা জানিয়েছেন এবং সেই অনুভূতি থেকেই উৎসারিত হয়েছে 'সোনারতরী'র 'দুই পাখি' কবিতাটি, যেখানে বালকের প্রাণে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে অবগাহন করার ব্যাকুল বাসনা থেকে একটা অক্ষমতার দুঃখ জেগে উঠেছে—'হায় মোর শকতি নাহি উড়িবার'।

আবার স্মৃতিগুলি যখন ছবির মত একটির পর একটি রচনা করেছেন, সেইকালে লেখা কিছু কবিতা পাঠকের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। যেমন, 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 'দিল্লি-দরবার' বলে একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। পরে অবশ্য এই বিষয় নিয়ে গদ্যপ্রবন্ধ লিখেছিলেন। ৮ই ফাল্গুন, ১২৮৩ তে হিন্দু-মেলা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে তা আর প্রকাশ করা হয়নি। কারণ সে রাজত্ব তখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, সময় ১৮৭৭, রবীন্দ্রনাথ তখন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে। সেই সময় থেকেই পরাধীনতার অপমান জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে—'প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে'। কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন, শুধু 'ব্রিটিশ' শব্দ পরিবর্তন করে 'মোগল' ব্যবহৃত হয়েছিল। অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে তিনি কবিতাটি হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতা বলে বুঝতে পেরেছিলেন।' সেই ঘোর দুর্দিনে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ার উৎসবের শরিক হতে পারেননি সেই অপরিণত কবি—

'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা যে
গায় গাক আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান, ..."[১]

আবেগমথিত এই অসন্তোষ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় তীব্র ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

এই উত্তেজনার বিপরীত চিত্রও আছে পৌলবর্জিনীর কাহিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায়। বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ প্রকৃতির আশ্রয়ে পল ও ভার্জিনিয়ার প্রেমের কাহিনী বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গচিত্র মূলতঃ বঙ্গভূমিকে ঘিরে। পৌলবর্জিনীর সমুদ্রে, পাহাড় উপত্যকায় বর্ণনার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। সুদূরের দিকে যে মন সবসময়েই ধাবিত হবার কল্পনা করে, এখানে তার আকর্ষনও বড় কম ছিল না। যে চঞ্চলতা তাঁর দৃষ্টিকে দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে গিয়েছিল, তার উৎস এইখানেই নিহিত। নরনারীর স্নেহ-ভালবাসা-বিচ্ছেদ বেদনা এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম; জীবনের উদ্দামতা অপেক্ষা তার সরল গতিপথ সেই বালককে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ছোটগল্পগুলিরও অনেক সূত্র রয়েছে এখানে। সেইসঙ্গে আছে তাঁর কৈশোরের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা নারকেল গাছগুলি, যেগুলি ব্যবহার করেছেন পৌলবর্জিনীর তালগাছের পরিবর্তে। কাব্যকবিতার মনোহর গীতিময় সুরটি কবিহৃদয়ের ধরা ছিল পৌলবর্জিনীর কাহিনী থেকে। কবিজীবনের প্রারম্ভিক পর্বে তিনি যে বনফুল কবিকাহিনী লিখেছিলেন সেখানে প্রকৃতির পটভূমিতে নরনারীর দ্বন্দ্বময় জীবনের চিত্র; অনেকটাই তাঁর পূর্বসুরীদের গাথাকাব্যের অনুকরণ। কিন্তু সেই শৃঙ্খল ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন

---

১. দ্রঃ — রবীন্দ্ররচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০৮, মে ২০০১ পৃ. ৫০০

'সন্ধ্যাসংগীত' রচনা করতে গিয়ে। সৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অনুগত করার তাগিদে এক বিষণ্ণ সুরমূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে এখানে। সন্ধ্যাসংগীতের অনেক আগেই তিনি লিখেছিলেন 'ভগ্নহৃদয়', কবিকাহিনী ও বনফুল। এই রচনাগুলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন। 'বনফুল'কে তিনি বলেছেন কাঁচা হাতের লেখা। "কিন্তু কবিকাহিনীতে ভগ্নহৃদয়ে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে এই জন্যেই ওদের কৃত্রিম প্রগলভতাকে বলা যায় জ্যাঠামি। সদরে তার প্রদর্শনীটা ভাল নয়। .....আদুরে সাহিত্য তাতে মেয়ের প্রশ্রয়ই বেশি, বেশ একটু আর্দ্রভাবের সেন্টিমেন্টালিটি। বাল্যযুগের পরবর্তী আমার সাহিত্য, বিশেষত সন্ধ্যাসংগীত আদিতে সেই স্যাঁতসেতে ভাব রোগের মত লেগে আছে। আর তাতে সাধারণের দরদ পাওয়ার আগ্রহ। সেটা ক্রনিক হয়নি এই আমার রক্ষা, নইলে কোনকালে সেই রুগ্ন (রুগ্ণ কাব্যের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।" ১৯৩৮ সালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে এই মন্তব্য করেছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে প্রধানত তিনটি কাব্যের কথা বলেছেন, যেগুলি কবির মনের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত এবং কড়ি ও কোমল কাব্যের উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেকটি প্রেক্ষাপটে তাঁর মনের এক একটি বিশেষ অবস্থা ধরা পড়েছে। এক বিচ্ছেদবেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে আত্মনিমজ্জিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। তাঁর মতে কবিকাহিনী (১৮৭৮) থেকে কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) পর্যন্ত তাঁর মনোভঙ্গীর স্বাধীন বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্যকরা যায় যে, কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অস্ফুট প্রতিফলন। বিশ্বসংসারকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অপরিণত অভিজ্ঞতায় সেযুগের কাব্যরীতিকে অনুকরণ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ছেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ন করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা"।[২] সুতরাং বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের লেখাগুলি নিয়ে সঙ্কুচিত হলেও, তাঁর অভিজ্ঞতার বিপুল পরিধির সঙ্গে জড়িয়ে এই কাব্যগুলির ভাব ও ভাষা এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীত' বিশ্লেষণে যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণতা থাকুক 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে এতদিনে তিনি এমন একটি রচনা করছেন যা তাঁর একান্তই নিজস্ব, অর্থাৎ পূর্বসূরীদের কাব্যরচনা রীতি থেকে তিনি সরে এসেছেন। শব্দতত্ত্বের ঔৎসুক্য থেকে ব্রজবুলি ভাষায় ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছেন। এককথায় তিনি নানাভাবে কবিতায় তাঁর স্বাধীন সত্তাকে ভাষায় রূপ দিতে চাইছেন 'প্রভাতসংগীত' সেই নিষ্ক্রমণের ইতিহাস, যার বিস্তৃত বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে।

ভোরের সূর্যোদয় থেকে তাঁর আত্মসত্তার আকস্মিক জাগরণে বিশ্বসৌন্দর্য এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠল। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে পাই—'একটি অদ্ভুত অভূতপূর্ব হৃদয়ানুভূতির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে? এই অনুভূতি কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়ানো কবির পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর কাব্যরচনার ধারা তখন 'খেয়া' এসে পৌঁছেছে। সেই পর্ব পর্যন্ত কবির অভিজ্ঞতায় তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যটির, আবদ্ধ গুহামুখ থেকে প্রবল বেগে নিঃসৃত জলরাশির মত অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলেছে তাঁর সৃষ্টিধারাতে। সন্ধ্যাসংগীতের বিষণ্ণতা মুক্তির আনন্দে রূপান্তরিত হল। সেই আনন্দ থেকে যে আলোর ছটা দেখা দিল, সেই আলোই উজ্জ্বলতর হয়েছে তাঁর মহাসত্যে উপলব্ধি। ১৯৩০ সালে দেখা মানুষের ধর্মের অন্তর্গত 'মানবসত্য' প্রবন্ধে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রেক্ষিতে সত্যবোধে এক তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যখন প্রভাতসংগীত লিখেছিলেন, তখন কিন্তু একটি বিশেষ আবেগের দ্বারা

---

১. দ্রঃ — রবীন্দ্ররচনাবলী (ষোড়শ খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২৫ শে বৈশাখ, ১৪০৮, মে ২০০১ পৃ. ৪৮৬

চালিত হয়েছিলেন, তত্ত্ব সেখানে ছিল না। সেখানে স্বপ্নভঙ্গে নির্ঝর তার প্রবল গতিবেগ নিয়ে সব বাধা চূর্ণ করে ধাবিত হয়েছে সামনের দিকে, এক মহামিলনের আহবানে। একটি মনোগ্রাহী আলোচনার অংশ উদ্ধৃত করছি—"নির্ঝরের এই আবেগ যাতে কবিব্যক্তিত্বের ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে, অন্যত্র বহু কবিতায় তা ফুটে উঠেছে জীবনের প্রেমে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, সৌন্দর্যের মগ্নতায়। ছিন্নপত্রে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তিনি যখন বলেন 'ওই যে পৃথিবী ওকে এমন ভালবাসি' চিত্রায় যখন সৌন্দর্যরূপিনীর সৌন্দর্যের আবাহন করেন, বলাকায় যখন ঋতুচক্রের নিত্য আবর্তনে মুগ্ধ হয়ে যান, তখনই আমরা বুঝি নির্ঝরের এই স্বপ্নই সার্থক হয়ে অসাধারণ কাব্যরূপ লাভ করেছে।"[১] বিদেশভ্রমণ থেকে ফিরে এসে গতিবাদের যে দার্শনিক চেতনা বলাকা পর্ব (১৯১৬) থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেই গতিচেতনা প্রথমাবধিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনবিশ্লেষণে অনুভূত হয়। তিনি এক জায়গায় স্থির থাকেননি, এক বোধ থেকে আরেক বোধে উত্তীর্ণ হয়েছেন; এক চিরসজীব, চিরনূতন জীবনভঙ্গি আত্মস্থ করেছেন, যে জীবন "উল্লাসে ছুটিতে চায়"। সেই দুরন্ত যাত্রায় তাঁর গভীর মর্ত্যপ্রীতি ও সেইসঙ্গে সুন্দরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাকে নিত্যনতুন রূপে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সৃজনে। 'সোনার তরী' থেকে 'বলাকা' সর্বত্রই এই গতিচেতনা। নাটকগুলিও সেই অর্থে এক বাঁধভাঙা উল্লাসকে নিয়ে এসেছে, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী সর্বত্রই—

অচল শিলার ভ্রূভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যটির পটভূমি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতির বিচরণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমল' দুই বিপরীত ঠাটের সুরধ্বনি থেকে একদিকে যেমন ব্যক্ত হয়েছে এক শোকাহত কবিমনের গভীর বেদনা জগতের মাঝখানে বেরিয়ে আসতে না পারার বিষণ্ণতা তেমনই আবার দেখা দিয়েছে কবির প্রবল মর্ত্যপ্রেম—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। কিন্তু এই বৈপরীত্য 'কড়ি ও কোমলে' প্রথম নয়। সন্ধ্যাসংগীতে সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে যে বিষাদে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন, প্রভাতসূর্যের প্রথম আলো তাঁকে নিয়ে এল বন্দীগুহামুখ থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে। 'প্রভাতসংগী'তে সেই গানেই মুখরিত। এই দুই সুর 'কড়ি ও কোমল' নামে অভিব্যক্ত হয়েছে। বহু বিদগ্ধজনের রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে বার বার। তার মধ্যে একটি উল্লেখ করে 'জীবনস্মৃতি'র শেষ পর্ব সমাপ্ত করছি। "দুঃখ ও মৃত্যুর উপলব্ধি কীভাবে কবির মনে জীবনের প্রতি উচ্ছ্বাস এবং প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগকে প্রভাবিত করেছে,, কেমন করে তাঁর জীবনদর্শনকে স্বপ্নাল্পতা ও ভাবাবেগপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে ক্রমশঃ গভীর, কঠিন, আত্মসচেতন এবং আত্মকৌতুকময় করেছে—সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে তার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত ভাবা যেতে পারে।[২]

।। রবীন্দ্র-জীবনবৃত্তান্তের তিনটি আধার—
জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ও আত্মপরিচয় ।।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহুমুখী ঘটনা, সেই পটভূমিতে তাঁর মনোবিকাশ এবং জীবনের তাৎপর্য নিয়ে বিশ্লেষণ, তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে লেখা কিছু প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে আত্মপরিচয় নামে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনস্মৃতি তিনি লিখেছেন প্রবাসীতে, ১৯১১ সালে। তার আগের একটু ইতিহাস আছে। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি আত্মপরিচয় দেন, যা নিতান্তই বিবরণধর্মী। সেই বিবরণটি জানা স্মৃতিচিত্রে ব্যক্ত হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে।

---

১. কবি তথ মনোভূমি—ড. ভবতোষ দত্ত (আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা) পৃ. ৩৩
২. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—দ্বিতীয় সংস্করণ—আবু সইয়দ আয়ুব, প. ২৭

সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি অনুভূতি ও মনের রূপরিণতির একটি সুসংলগ্ন ইতিহাস ছড়িয়ে আছে জীবনস্মৃতির বিভিন্ন অধ্যায়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ কোনো সাল তারিখ উল্লেখ করেননি, কিন্তু জীবনের বহু ছোট ছোট ঘটনার পটভূমিতে তাঁর শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে যৌবনের প্রবেশ পথে পৌঁছে আর তিনি এগিয়ে যাননি; তবুও রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যসাধনার বহু সূত্র, তার পটভূমি, তার ব্যাখ্যা। জীবনের বৃত্তান্ত আছে কিন্তু ইতিহাসের বর্ণনার মত তার ধারাবাহিকতা নেই, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। আরও বলছেন যে জীবনের অনেক চিত্রই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, কিন্তু প্রকাশের সুযোগ সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ অতীতচারণ করলেন তাঁর প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পা দিয়ে, সেখানে অতীতের সঙ্গে গভীর মমতার সম্পর্ক, কিন্তু তার থেকেও বেশি সেই পরিপ্রেক্ষিকায় এক শিশুমনের বিবর্তনের চিত্র। সেখানে দেখার আনন্দ আছে, কিন্তু ঝড় তোলেনা মনের সমুদ্রে।

ছেলেবেলায় জীবনস্মৃতির কিছু কিছু অংশ পুনরক্ত হয়েছে। যেমন শিক্ষারম্ভের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে ছেলেবেলার সূচনাতে যে মাষ্টারমশাইএর কাছে প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক পড়া শিশু রবীন্দ্রনাথের চোখে গভীর ঘুম নিয়ে আসত, কিছুতেই তা ঠেকানো যেত না। মাষ্টার পন্ডিত সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে বুঝেছিলেন লেখাপড়া শেখার বাঁধা রাস্তায় তাঁকে চালানো যাবে না। জীবনস্মৃতির একরম অনেক ঘটনাই ছেলেবেলাতেও বলেছেন, সেইসঙ্গে পরিবার এবং পরিবারবহির্ভূত অনেক মানুষের কথা তাঁর কাবারচনা চর্চা, বিলাত যাত্রার কথা দিয়ে শেষ করেছেন। অনেক কাহিনী নতুন করে বলা হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা দুটিই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু দেখার চোখ এবং বলার ভঙ্গিতে দুটি গ্রন্থ স্বতন্ত্র। ছেলেবেলার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল বাকলি, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে"। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন ছেলেদের জন্য কিছু লিখতে। "ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের" কথা লেখার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগে। তখন রবীন্দ্রনাথ মংপুতে বাল্যস্মৃতির স্পর্শকাতর অনুভূতি নিয়ে লিখছেন ছড়া। ছেলেবেলার ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ এই রচনার বিষয়বস্তু তার উদ্দেশ্য ও বিচারবিশ্লেষণ করে গেছেন। বক্তব্যের দিক থেকে জীবনস্মৃতির সঙ্গে পার্থক্য হচ্ছে যে, "এই বিবরণটিকে ছেলেবেলার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সে মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে।" জীবনস্মৃতি যৌবনের প্রারম্ভে এসে থেমেছে। দুটি গ্রন্থের সমন্বয়ে পরিস্ফুট হয়েছে শিশু থেকে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশঃ তা পরিণত হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিমনের ভিতটি গড়ে উঠেছে, আর জীবনস্মৃতিতে তার ওপর কারুকার্যময় প্রাসাদ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে তাঁর প্রথম জীবনের রচনাগুলির উল্লেখের মধ্য দিয়ে।

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে জীবনের স্মৃতিচারণে, কথায় ছবি আঁকার যে নেশা, সে নেশা তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে ছেলেবেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। জীবনস্মৃতি সাধুভাষায়, আর ছেলেবেলা চলিত ভাষায় লেখা, রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'বালভাষিত গদ্যে'। তবে রচনারীতিতে গদ্যের একটা ঋজু অথচ নমনীয় ভঙ্গী আছে যাকে প্রমথ বিশী বলেছেন দীর্ঘবিতানিত তা নমনীয় কণ্ঠস্বর।

জীবনস্মৃতিতে জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, সেইভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন, এ তাঁর নিজের আঁকা ছবি, কিন্তু দূর থেকে দেখা। আর "ছেলেবেলা রূপকথার জগৎ, সে যেন আর কাহারো সৃষ্টি, তাহার উপরে কবির কোন কর্তৃত্ব যেন নাই। আর দশজনের মত তিনিও একজন দর্শকমাত্র। এমন হইবার কারণ, কবির বাল্যকাল ও এই গ্রন্থরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। শুধু তাই নয়, কবির ছেলেবেলার সেই যুগ, সেই আবহাওয়া, সেই সব নরনারী কবে

বাস্তবলোক হইতে অপসারিত হইয়া কবির মনোলোকে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তব রূপ ছাড়িয়া তাহারা আজ যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে সে রূপকথার জগৎ"।[১] জীবনস্মৃতিতে যে কথা বা যে অনুভূতির সংকেত রেখে গেছেন ছেলেবেলাতে তার স্পষ্টতা অনেক বেশি, কিন্তু সেখানে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নেই, যে কোনো রূপকথার ভাষ্যকার তিনি। তাই বলার রীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। জীবনস্মৃতিতে বাস্তব প্রত্যক্ষ জীবনের কথা বলায় সাধুগদ্যের অন্তরালে একটা মৌখিক কথ্যভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। ছেলেবেলার ভাষাতেও কোনো তত্ত্বগত আলোচনা নেই, যা কথ্যভাষায় লিখিত হলেও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই দেখা যায়। একটি সুন্দর বক্তব্য রয়েছে এই প্রসঙ্গে। "আশ্চর্য ভাষা ছেলেবেলার। ছোটো ছোটো বাক্য, হসন্তের কলধ্বনি, উপমার পরিমিত প্রয়োগ, সর্বোপরি কথাগদ্যের যা প্রধান সার্থকতা—বক্তা মনের আচ্ছন্নতার চেয়ে বর্ণনীয়ের স্পষ্টতা। তাঁর দুটি আত্মজীবনী দুই রীতির চরম সিদ্ধি—সাধুরীতিতে 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) চলতি রীতিতে 'ছেলেবেলা' (১৯৪০)। দুটিই ছবি আঁকা।[২]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মপরিচয়মূলক ছটি লেখা সংকলিত হয়ে 'আত্মপরিচয়' নামে প্রকাশিত হয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বিশ্বভারতী থেকে; সংকলন করেন পুলিনবিহারী সেন। লেখাগুলি ধারাবাহিক নয়, বিভিন্ন সময়ে লেখা। এখানে পরিণতমনন রবীন্দ্রনাথের জীবনকে দেখার বিশ্লেষণাত্মক পটভূমিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনপরিচয় কিছু কিছু ব্যক্ত হয়েছে। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলায় যেমন পারিপার্শ্বিক জীবনবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে কবিমানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, আত্মপরিচয় গ্রন্থে অপরিণত মনকে বর্ণনা করার সহজ কৌতুকরসটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, পরিবর্তে কবির অন্তরস্থ জীবনদেবতা কীভাবে তাঁকে জীবনের পরম লগ্নে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেখানে মর্ত্যজীবনের সব অপূর্ণতা এক পরিপূর্ণ অখন্ড ঐক্যের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে।

'আত্মকথা'[৩] প্রবন্ধটি জীবনস্মৃতি রচনার আগে লেখা। অনুরোধ আসে, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লেখার জন্য। যদিও তিনি শ্রী পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রে সংক্ষেপে তাঁর জীবনের কিছু বিবরণ দিয়েছিলেন, কিন্তু 'আত্মকথা'য় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই তাঁর জীবনকাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে সম্মত হননি। এখানে তিনি তাঁর কাব্যসাধনার স্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করে আপাতখন্ডতার মধ্যেও এক 'অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য' উপলব্ধি করেছেন। জীবনস্মৃতি এবং ছেলেবেলারও অন্তর্নিহিত মূল সুরটি এই ঐক্যবোধে। সেখানে কোনো তিক্ততা নেই, কোনো জটিলতা নেই; এক নিবিড় ভালবাসার স্বচ্ছ প্রেরণা নিয়ে জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে। আত্মকথাতেও সেই 'প্রেমলীলার উদবেল তরঙ্গমালা'। কিশোর বয়স থেকেই যে প্রকৃতির শ্যামল সুন্দর রূপ তাঁকে আবিষ্ট করে রাখত, সে স্মৃতি ধরা রয়েছে মনের গভীরে। ভাষা তখনও অস্ফুট, জীবনস্মৃতিতে তাঁর কাব্যরচনার সূচনাপর্বে তিনি জানিয়েছেন সে কথা। কিন্তু বাধাবন্ধনহীন নির্ঝর আত্মপ্রকাশ করল, তখন থেকেই নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির অখন্ড যোগসূত্রটি অনুভব করেছেন। 'আত্মকথা' কবির মনের সেই আলো ফুটিয়ে তুলেছে, জীবনস্মৃতি আর ছেলেবেলার কথাতে তার পটভূমিটি রয়েছে। সেইসঙ্গে বলছেন, কবির জীবনের সাধারণ ঘটনায় সেই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম হয় না—'কবি রে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে'।

"আত্মপরিচয়ের দ্বিতীয় রচনা 'অভিভাষণ'—ভারতীতে প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৩১৮ সালে, তৃতীয় রচনা 'আমার ধর্ম' ১৩২৪ বঙ্গাব্দে সবুজপত্রে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল। খুব সহজভঙ্গীতে যে কথা জীবনস্মৃতিতে বলেছিলেন, তার আরও সম্প্রসারিত রূপ এই রচনাটি। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির গভীর পরিচয়ের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, বিশ্বে পূর্ণতা আসে তার সঙ্গে বিশ্বমানব যুক্ত হয়ে। ধর্মবোধ নিয়ে একটা তত্ত্বগত আলোচনাই

---

১. রবীন্দ্র-বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী, জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, পৃ. ১৪৯
২. রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা—ড. ভবতোষ দত্ত, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮; পৃঃ ১১৬
৩. উৎস—বঙ্গভাষার লেখক (১ম ভাগ) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভাদ্র ১৩১১

এখানে মুখ্য, অপরপক্ষে জীবনস্মৃতি সম্পূর্ণভাবেই তত্ত্বভারমুক্ত।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ এ প্রকাশ করছে 'কবির অভিভাষণ' যেখানে মূল প্রতিপাদ্য একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবিমাত্র'। জীবনস্মৃতি তাঁর কাব্যসাধনার পর্বগুলি চিহ্নিত করেছে, কিন্তু বলিষ্ঠ প্রত্যয়বোধে বালক থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রতিষ্ঠিত হননি। নাগরিক জীবনের মহাকোলাহল বদ্ধ পরিবেশে তাঁকে আঘাত দিত, ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতিতে তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে সেইসঙ্গে রয়েছে উন্মুক্ত জীবনে মুক্তির আনন্দে নিজের সত্তায় পূর্ণবিকাশের অভিপ্রায়। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে "মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে" তিনি রূপ দিতে চেয়েছিলেন. তার শিশুমনের প্রতি পীড়নকে তিনি কোনোদিনও ভোলেননি। তাই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য তিনি জানিয়েছেন। "প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভ-রূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যাবসায়ের আদি সূচনায় সে ঊষারুণ দীপ্তি যে নবোদগত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকে অবারিত করার জন্য আমার প্রথম প্রয়াস.....।" এই প্রয়াসের পটভূমিটি ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার স্মৃতির পাতায়। তবে শিশু কবি বন্ধনকে যেমন স্বীকার করেননি, তেমন আবার শাস্তিও পাননি তার জন্যে। তাঁকে সবদিক থেকে সুশিক্ষিত করার প্রবল আগ্রহ দেখেছি তাঁর অগ্রজদের মধ্যে। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলায় পরিবারের পরিচয় তাঁর সুপরিণত অভিজ্ঞ জীবনদর্শনের প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছেন। পুরাতন ও নূতনের সন্ধিলগ্নে তাঁর জন্ম। তবুও "যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। .....আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল.....". জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার নানা প্রসঙ্গের উপস্থাপনায় তাঁর পরিবারের গতানুগতিকতার বাইরে অবস্থানটি বোঝা যায়। আত্মপরিচয়ে সে রকম কোনো ঘটনার বিস্তৃত উল্লেখ নেই শুধু সংকেতটি আছে সেখানে। সব অনুভূতি ও বিশ্লেষণ তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ সালের প্রবাসীদের প্রকাশ পেল তাঁর 'জন্মদিন' রচনাটি। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন ও বিশ্বজগৎ পরস্পর সংযুক্ত, তার জন্য যে আনন্দের সহজ প্রকাশ, তার সঙ্গে কবির অতি নিবিড় সম্পর্ক। তাঁদের সাবেককালের বাড়ীতে ছোটবেলার স্মৃতির টুকরোগুলি তাঁর মনে অসাধারণ কল্পনার জাল বোনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন বন্ধ দরজার ছিদ্র দিয়ে প্রকৃতির মায়াময় এক টুকরো সৌন্দর্যের দিকে। তাঁর একান্ত ভালবাসা দিয়েই কাব্যসৃষ্টি করেন। কিন্তু সে যাত্রাপথ মসৃণ নয়। তবুও তিনি থেমে যাননি, বার বার স্মরণ করেছেন তাঁর পরিবারের ভূমিকা, "সেখানে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি।" কবি পৃথিবীকে সুন্দর দেখেছেন, মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন 'মানবের মাঝে' বেঁচে থাকার ব্যাকুলতা নিয়ে, উচ্চারণ করলেন এক মহৎ তাৎপর্যময় বাণী—

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণর পদপরণ তাদের পরে।

৫.৫ অনুশীলনী ঃ

১। শিক্ষার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা পর্বকে অবলম্বন করে অভিমতটি বিচার কর।

২। রবীন্দ্রমানসগঠনে তাঁর পরিজন পরিবেশের প্রভাব ও প্রেরণা নিরূপণ কর জীবনস্মৃতির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি অবলম্বনে।

৩। ঠাকুরবাড়ীর বাইরে যে সব স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সৃষ্টিপর্বে প্রভাব বিস্তার করেছেন, এমন অন্তত তিনজন ব্যক্তির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঋণস্বীকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৪। "মনে করিয়াছিলাম জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে— তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা"। উদ্ধৃতাংশের আলোকে জীবনস্মৃতির স্বরূপ নির্ধারণ কর।

৫। "আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনার পালা।" জীবনস্মৃতি অবলম্বনে মন্তব্যটির তাৎপর্য নির্ণয় কর।

৬। "জীবনস্মৃতি মূলত রবীন্দ্রনাথের লেখকসত্তার ক্রমবিকাশ, ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক উন্মোচন নয়"। বক্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা কর।

৭। সংক্ষেপে অধ্যায়গুলি আলোচনা কর— হিমালয় যাত্রা, গীতচর্চা, সাহিত্যের সঙ্গী, ভানুসিংহের কবিতা, স্বাদেশিকতা, বাল্মীকিপ্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। রবীন্দ্ররচনাবলী (প্রথম, দ্বিতীয়, দশম থেকে একাদশ খন্ড) জন্মশতবার্ষিক সং ১৩৭৩ পঃ বঃ সঃ
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (ষোড়শ খন্ড) পঃ বঃ সঃ ১৪০৮
৩। রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম-চতুর্থ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৪। রবিজীবনী (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রশান্তকুমার পাল
৫। রবীন্দ্রবিচিত্রা — প্রমথনাথ বিশী
৬। রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা — ভবতোষ দত্ত
৭। কবি তব মনোভূমি — ভবতোষ দত্ত
৮। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ — আবু সইয়দ আয়ুব
৯। বাংলাসাহিত্যে আত্মজীবনী — সৌমেন্দ্রনাথ বসু
১০। সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ — নন্দরাণী চৌধুরী
১১। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি — পঁচিশে বৈশাখ ১৩৯৪ ও ১৩৯৬ সাহিত্যপত্র
১২। বিশ্বভারতী পত্রিকা— বর্ষ ২৪ — সংখ্যা ৪ বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৭৫।

একক 6 ❑ 'গোরা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

6.0 ভূমিকা
6.1 রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা ও গোরা উপন্যাস
6.2 উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব ও গোরা উপন্যাস
6.3 যুগলবন্ধু চরিত্র—গোরা ও বিনয়
6.4 যুগলনায়িকান্ত সুচরিতা ও ললিতা চরিত্র
6.5 অন্যান্য চরিত্র
6.6 উপসংহার ঃ গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ
6.7 গ্রন্থপঞ্জী
6.8 নির্বাচিত প্রশ্ন

6.0 ঃ ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে প্রকাশকাল ১৯১০, বইটি তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গিত। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালা (১৯০৯-১১) গীতাঞ্জলি কাব্য (১৯১০), রাজা নাটক (১৯১০) আলোচ্য সমবৃত্তেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রসাহিত্য যেহেতু একটি অখন্ড ভাবপ্রবাহ আছে, গোরা উপন্যাসের আলোচনাকালে আলোচ্য প্রবন্ধকাব্য নাটক ইত্যাদিতে প্রকাশিত ভাব ও ভাবনার সঙ্গে উপন্যাসের আইডিয়া বা মতাদর্শের তুলনা ও প্রতিতুলনা সম্ভব।

মাঘোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দিলেন সমারোহ করে গগনেন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়নী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমার সঙ্গে। "ঠাকুর পরিবারে বা আদি ব্রহ্ম সমাজে এটা একটি বিপ্লব বা বিদ্রোহ, মহর্ষির জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হয়তো এমন বৈপ্লবিক সংস্কারকার্য সম্ভবপর ছিল না।" এই বিয়ে উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ পুত্রবৎ গোরা উপন্যাসটি উৎসর্গ করলেন। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই উপলক্ষে ১৩১৪ (১৯০৭) সালের ভাদ্র মাস থেকে 'গোরা' উপন্যাস সেখানে লিখতে শুরু করেন, শেষ করেন ১৩১৬ সালের ফাল্গুন (১৯১০) সংখ্যায়— অর্থাৎ আড়াই বছর সময় লাগে।

"প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্বে 'গোরা' উপন্যাস বাংলাস সমাজে ও সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজকের বাঙালি সমাজের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তার কারণ, গোরার অনেক সমস্যা এখন অদৃশ্য হয়েছে এবং তার স্থানে অন্য অনেক সমস্যা এসেছে। কিন্তু যুগসমস্যার প্রশ্ন বাদ দিলেও 'গোরা'র মধ্যে অনেক শাশ্বত প্রশ্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।" (রবীন্দ্রজীবন কথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১)। আজ 'গোরা' উপন্যাস রচনার পর ৯৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এ উপন্যাসের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং প্রকাশিত মানবতাবাদ অম্লান হয়ে রয়েছে।

6.1 ঃ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা ও গোরা উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসে অল্পস্বল্প বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল। তাঁর 'বৌঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত ও রোমান্স পর্যায়ভুক্ত। রোমান্স অর্থাৎ যে উপন্যাসে বাস্তবের যুক্তিশৃঙ্খলাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করা হয় অর্থাৎ এককথায় কল্পনা যেখানে অনায়াস ডানা মেলে দেয়।

নৌকাডুবি (১৯০৬) পরবর্তী উপন্যাস, এখানেও কল্পনা কার্যকারণকে অতিক্রম করে গেছে। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন। এই প্রথম দেখা গেল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যচয়ন। পরবর্তী 'গোরা' উপন্যাসে রয়েছে মহাকাব্যিক আবেদন, বৃহৎ ক্যানভাসে রচিত মানবজীবনের রসরূপ—মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতও এখানে বড় কম নেই।

'চতুরঙ্গ' থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু—চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪) প্রভৃতি উপন্যাসে রয়েছে গীতিধর্ম, সাংকেতিকতা ও আশিকতার লক্ষণ। অর্থাৎ ভাবের মধ্যে এসেছে সাংগীতিক আভাসময়তা, স্বপ্ন ও মনোগহনের অলোড়ন, কাহিনীর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিছিয়ে দেয়া কিছু কিছু ফাঁক। বহিরঙ্গে রয়েছে ভাষার শাণিত প্রখর দীপ্তি। এসবই বিংশশতকীয় উপন্যাসের সার্বিক লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে।

'গোরা' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ আলোচনা পাই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' নামক অধ্যায়ে। বস্তুত ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি উৎকর্ষে উপন্যাস নিয়ে লেখা ইয়োরোপ ও আমেরিকার সেরা সমালোচনা গ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। "ইহার মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি আছে—'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যটি অবশ্যই বহুমাত্রিক। তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যের একটি সংকলন করছি। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও অনন্যস্থানের অধিকারী। এর প্রসার ও পরিধি সাধারণ উপন্যাসের থেকে অনেক বেশি। এর পাত্র-পাত্রীদের যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন আছে তা নয়, আন্দোলন-বিশেষ বা ধর্মগত সংঘর্ষ বিশেষের প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরএকটা বৃহত্তর সত্তা আছে। বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এ উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে ধর্মবিষয়ে সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারক—এই উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তিতর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়গুলি সবিশেষ আলোচিত হয়েছে। তর্কের উদ্দামকোলাহলে তাহাদের জীবনের সূক্ষ্ম রাগিনী ও নিগূঢ় মর্মস্পন্দন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ বলেই বেশি মনে হয়। সমস্ত উপন্যাসের বিরুদ্ধেই অনেকটা এই ধরণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সমালোচকেরা বলেছেন এর চরিত্রচিত্রণ যথেষ্ট গভীর ও ব্যক্তিত্বদ্যোতক নয়, এর চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্বউন্মেষ যথেষ্ট উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নয়। উপন্যাস সম্বন্ধে এইসব অভিযোগের যাথার্থ্য অবশ্যই বিচারযোগ্য। অভিযোগগুলি কিছুটা স্বীকার্য। তর্কবিতর্ক ও মতবাদে কোন চরিত্রের সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়—মানবপরিচয়—প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও গভীর গোপন পরিচয়ের দিকেই উপন্যাসপাঠকের লোভ বেশী। মতবাদপ্রাধান্য যখন চরিত্রের ব্যক্তিপরিচয় ক্ষুণ্ণ করে তখন তার আচার-আচরণ কি রকম ঘটতে চলেছে পূর্বেই অনুমান করা যায়, এতে করে সে চরিত্রের জীবনঘটিত রহস্যময়তা কমে যায়। নমনীয়তা, বিস্ময়, দিকবদল—উপন্যাসের চরিত্রের এইসব বিশেষ গুণগুলি স্বভাবতই থাকতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে পরেশবাবুর উল্লেখ করতে পারি। গোরা উপন্যাসে "পরেশবাবুরও অভ্রান্ত ও অবিচলিত সত্যানুসরণ, তাঁহার ধর্মবুদ্ধির অবিমিশ্র উৎকর্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রকে অনেকটা নিষ্প্রভ ও বৈচিত্রবিহীন করিয়াছে।" সুতরাং এদিক দিয়ে যে সমস্ত চরিত্র মতবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায় নি, মতবাদ সমর্থনে দ্বিধা বা দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে অথবা যুক্তিতর্ক আলোচনার মধ্য দিয়ে যাদের জীবনে নিগূঢ় পরিবর্তন এসেছে তারা প্রাণরসে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। "এই হিসাবে দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত বিনয়, অভাবনীয় রূপে পরিবর্তিতা সুচরিতা ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণা ললিতা আমাদের নিকট অধিকতর জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়।"

উপন্যাসে অবশ্য যুক্তিতর্কের বিদ্যুৎঝলকের ভিতর দিয়েও মানব-অন্তঃকরণকে ছোঁয়া যায়। মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোন চরিত্রের যুক্তিতর্ক তার হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও একেবারে অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত হয় তবে সেই চরিত্র অবশ্যই উপন্যাসে মহৎ মানবিক বিভামণ্ডিত হতে পারে। গোরা চরিত্রে এই জাতীয় ছাপ আছে। বস্তুত তার চরিত্রে এক অসাধারণ হৃদয়জ সৌন্দর্য আছে। গোরার তর্ক নিছক বুদ্ধিসর্বস্ব নয়, তা একদিকে তার হৃদয়ের গভীরতম উৎস থেকে উৎসারিত অন্যদিকে উপন্যাসের অপরাপর মানবমানবীর সঙ্গে তার সম্পর্কের রঙ ক্ষণে ক্ষণে বদলে দেয়। তার মাতৃভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, এমনকি নিজে কে ততটা স্বীকার না করলেও আদর্শবাদের মোড়কে আবির্ভূত তার প্রণয়পিপাসা এসবই তাকে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত করেছে। নিজের একমুখী মনোভাব অবশ্য তাকে ওইসব চরিত্রের সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত করেছে। আনন্দময়ীর উদার মাতৃস্নেহ, বিনয়ের বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কাজনিত ভাবাবেগ, সুচরিতার প্রেম সমস্তই মিলেমিশে গোরার শুষ্ক মতবাদসর্বস্ব জীবনকে শেষপর্যন্ত জীবন্ত ও অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। সুচরিতাই শেষপর্যন্ত তার জীবনের মহতী রূপান্তর ঘটিয়েছে প্রেমের মায়াপ্রদীপের সংস্পর্শে। সাংসারিকতার সহজ সামাজিক পথে গোরার সঙ্গে সুচরিতার পরিচয় হয় নি, এ পরিচয় গাঢ় হয়েছে দুটি বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষের কারণে। বস্তুত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সুচরিতাকে স্বঘোষিত হিন্দুধর্মের ধারকবাহক ও মুক্তিদাতা গোরা আত্মসমর্থনে বজ্রনির্ঘোষে যে বানী শুনিয়েছে তারই ভিতরে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল প্রেমের লুকোনো আবির্ভাব। শেষ পর্যন্ত যুক্তিপরম্পরার পরাজয় ঘটেছে, আত্মদমনমূলক সন্ন্যাসের পথ থেকে যোগীশ্বর গোরা প্রেমের সহজ পথে অগ্রসর হয়ে গেছে। তার প্রবল আগ্রহ, তার বলিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ শক্তির পিছনে প্রেমের বৈদূর্যশক্তি সুতীব্র গতিসঞ্চার করেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে যথার্থই বলেছেন—"সুচরিতার সহিত প্রথম পরিচয়ের পর নির্জন গঙ্গাতটে তাহার কঠোর তপস্যারত ভাবমগ্ন চিত্তের এক অসতর্ক ফাঁক দিয়া যে মুগ্ধ প্রণয়াবেশের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই তাহাকে দেশাত্মবোধের প্রতিনিধিত্ব হইতে অভিঘাত-চঞ্চল, উষ্ণরক্ত-সঞ্চরণশীল ব্যক্তিগত জীবনে উন্নীত করিয়াছে। যে মুহূর্তে প্রেম আসিয়া দেশপ্রীতির হাত হইতে রশ্মি কাড়িয়া লইয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতে যে গোরার জীবনরথ ব্যক্তিত্বের অসাধারণ পথ বাহিয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না।"

যখন কোন উপন্যাসের চরিত্র একটা জাতির সমগ্র আশাআকাঙ্ক্ষা বা কোন ধর্ম বা সভ্যতার বিশেষত্বের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়, তখন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই অসাধারণ প্রসারের ফলে খর্বিত হয়ে পড়ে—এই হ'ল সাধারণ অভিমত। শতকণ্ঠের বাণী যখন একের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন তার সেই উক্তির মধ্যে তার নিজস্ব সুর তত থাকে না, এই আশঙ্কা কিছুটা রয়ে যায়। সেইজন্য গোরার জীবন যখন ব্যক্তিগত গন্ডীকে ছাড়িয়ে বহুদূরে সমগ্র দেশের সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, অথবা দেশকাল নির্বিশেষে এক রহস্যময় অসীমতার দিকে পক্ষবিস্তার করে তখন উপন্যাসের দিক থেকে তার ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ ফিকে বোধ হয়; সে রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে যেন মতবাদের বাহন হয়ে ওঠে। "গোরা যেখানে নিছক তার্কিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে, যেখানে সে ঘোষচরপুরের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণজন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালোভের জন্য গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিয়াছে, সেখানে জাতীয়তার প্রবল অভিভবে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্লিষ্ট, নিষ্পেষিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সে তার্কের সূত্র ধরিয়া আনন্দময়ীকে বেদনা দিয়াছে বা বিনয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তাহার অন্তঃকরণের তলদেশে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির আলোকপাত করিয়াছে, সর্বোপরি যেখানে সে সুচরিতার সহিত নিগূঢ় হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে সে প্রতিনিধিত্বের ছায়ামণ্ডলমুক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে ভাস্বর পুরুষ।

গোরার জন্মরহস্য গোরাচরিত্র সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গোরাকে আইরিশখ্যান প্রতিপন্ন করায় লেখকের কি উদ্দেশ্য সে সম্বন্ধেও কৌতূহলপূর্ব প্রশ্ন ওঠে। উত্তরটি একান্ত সহজ। লেখক গোরা চরিত্রকে বন্ধনমুক্ত

করে মুক্ত মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে সংকীর্ণ ধর্ম থেকে মানবধর্মের পথে, ভ্রান্ত স্বাজাত্যবোধ থেকে উদার বিশ্ববোধমুক্ত দেশপ্রেমের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। গ্রন্থের শেষে গোরার জন্মরহস্যপ্রকাশ অতর্কিত বজ্রপাতের মতই গোরার উপর এসে পড়েছে। এতে তার দেশভক্তির কোন হ্রাস হয় নি, কিন্তু এই দেশভক্তির সংকীর্ণ সাধনপথটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের যে কঠোর নিয়মসংযম, যে অবিচলিত আচারনিষ্ঠা গোরার জীবনের মহত্তম ব্রত ছিল, এক মুহূর্তেই প্রমাণিত হয়েছে, সে এই ব্রতপালনের অধিকারী নয়। দেশানুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠা যে শুষ্ক আচারআচরণরূপে তার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল তা নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে যে হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা ভক্তিমান, একনিষ্ঠ ও গভীর প্রত্যয়ী সাধক ছিল সে অহিন্দু বলে প্রমাণিত হ'ল। ফলে পূর্ব জীবনযাপনের থেকে বিচ্ছেদের বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন জীবনসম্ভাবনার এক বিপুল মুক্তির আনন্দ। গোরার পূর্বজীবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, তাকে ডাকছে নতুন জীবন। দেশপ্রীতি ও ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতি নতুন অর্থ পেল। আনন্দময়ীর মাতৃস্নেহ, বিনয়ের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা, সুচরিতার প্রেম তাকে ভবিষ্যতের এক সূর্য আলোকিত পথে ধাবিত করে দিল। এখন আর পরিবেশের সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রাম নয়, এখন ঘটল পরিবেশের সঙ্গে অনুকূল মিলন। গোরার এই জীবনরসায়নের রূপান্তর প্রক্রিয়াই চরিত্রটিকে মহৎ এবং আকর্ষনীয় করে তুলেছে।

বিনয় তার দ্বিধাসংকোচপূর্ণ সুকুমার হৃদয় নিয়ে রক্তমাংসের মানুষ। "একদিকে গোরার অনমনীয় মতবাদের প্রতি, অপরদিকে তাহার কোমল সামাজিক স্নেহবন্ধনের প্রতি, উন্মুখ হৃদয়ের বিশ্বস্ততার দাবি—এই দুইএর মধ্যে সতত বিরোধে সে উভয়সংকটে পড়িয়াছে। তাহার যুক্তিতর্কমতবাদ হৃদয়াবেগের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। গোরার সহিত বাকবিতন্ডায় উপেক্ষিত হৃদয়বৃত্তিরই সে পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর যখন বিনয় উচ্ছ্বসিত আবেগময় ভাষায় গোরার কাছে তার হৃদয়ে প্রেমের অপরূপ প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনা করেছিল তখন গোরা এই প্রেমআবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু সে নিজ আদর্শের বিভিন্নতারও উল্লেখ করেছিল। মনে হয়েছিল গোরা বিনয়কে স্বাধীনভাবে তার নবজাগ্রত দুর্বার গতি প্রেমপথে চলতে দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সে বিনয়ের এই নব উন্মেষিত প্রণয়াবেগকে এক তিল স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নয়। অতএব দেখা যায় গোরার পরবর্তী ব্যবহার বন্ধুর প্রেমপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণই করা।

বিনয়ের সঙ্গে ললিতার প্রেমের উদ্ভব ও পরিণতি খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। একটা প্রবল বিরুদ্ধতা, এমন কি তীব্র অবজ্ঞাপ্রকাশের ছদ্মবেশে প্রেম কিভাবে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে, প্রেমের সেই চিররহস্যময় প্রকৃতিরই উদ্ঘাটন বিনয়ললিতার সম্পর্কটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। প্রথম সাক্ষাতেই ললিতা বিনয়ের প্রতি এক অপূর্ব আকর্ষণ বোধ করেছে, তার উপর নিজের অধিকার জারি করার একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছে। তাই সুচরিতার সঙ্গে বিনয়ের প্রণয়সম্ভাবনায় তার মন একটা ক্ষণস্থায়ী তীব্র ঈর্ষাদ্বারা অভিভূত হয়েছে। এ সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে সে গোরার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিযোগিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কঠোর আঘাতও নির্মম ব্যঙ্গ দিয়ে সে বিনয়কে গোরার প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে, তাকে গোরার উপগ্রহের পদ থেকে বিচ্যুত করে নিজের কক্ষপথে আবর্তিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। বিনয়ের উপর গোরার প্রভাবে যে একটু অস্বাভাবিকত্ব, একটু অনুচিত অতিশয্য আছে, বিনয়ের প্রকৃতিতে যে একটা অবরুদ্ধ বিদ্রোহোন্মুখতা আছে, প্রণয়ের স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণদর্শিতার সঙ্গে ললিতা প্রথম সাক্ষাতেই তা আবিষ্কার করেছে ও দাড়িপাল্লার অপরদিকে তার প্রভাবের সমস্ত গুরুভার নিক্ষেপ করেছে। তার অবিরাম আকর্ষণে বিনয় অনেকটা বিচলিত হয়েছে ও গোরার মতের বিরুদ্ধে অভিনয়ে বা বিরোধিতার ভাণে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। এই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় ললিতা নিজ ব্যবহারে প্রেমের আকস্মিক ভাবপরিবর্তন ও অস্থির মতিত্বের পূর্ণমাত্রা প্রকাশ করেছে। স্টীমার যাত্রাকালে বিনয়ের প্রতি একান্ত নির্ভরেই ললিতার প্রেমের প্রথম অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত

প্রকাশ। কিন্তু এই অনিবার্য আত্মপরিচয়ের পরেও প্রেমের পথ ঠিক সরল রেখায় অনুবর্তন করে নি। শেষে ব্রাহ্মসমাজের নীচ আক্রমণও কাপুরুষোচিত ইতর ব্যঙ্গবিদ্রূপই এই অপরিণত প্রেমকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিল। ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতা তার প্রেমবিকাশে সাহায্য করেছে, তাকে সংকোচহীন ও মুক্তকণ্ঠ করে তুলেছে এবং বিনয়ের ভীরু দ্বিধাদুর্বল চিত্তেও তার উত্তাপ কিছুটা সঞ্চার করে দিয়েছে। তাদের মিলনের পথে যে সমস্ত কৃত্রিম সমাজে ও ধর্মমতমূলক বাধা মাথা তুলেছিল, ললিতার প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি সে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বিবাহ ব্রাহ্মমতে হবে কি হিন্দুমতে হবে—এই আপত্তি প্রায় তিন অধ্যায় ধরে পল্লবিত হয়েছে এবং এই সমস্যার শেষ পর্যন্ত যে সমাধান হয়েছে তা-ও মোটে সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত নয়। শেষ পর্যন্ত ললিতার একান্ত ইচ্ছায় স্থির হল যে শালগ্রামশিলা বাদ দিয়ে বিবাহ হিন্দুমতেই হবে, কেন না বিবাহের জন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া বিনয়ের পক্ষে অপমানজনক হবে। আবার ললিতার পক্ষেও সম্ভব ছিল না হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়া। এই সমস্যার আসল মীমাংসা হোত উভয় সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক আচারের সম্পূর্ণ বর্জনের দ্বারা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, গ্রন্থের এই অংশটি তার্কিকতার দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত। তর্কভার অবশ্য সমগ্র গোরা উপন্যাসটিরই এক লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য। আসলে এক সামাজিক মূঢ়তা ও গোড়ামির ছবি দেখানোতেই গ্রন্থের এসব অংশের উপযোগিতা।

ললিতার সঙ্গে সুচরিতার ভাবগত ঐক্য অথচ চরিত্রগত পার্থক্য খুব চমৎকারভাবে দেখান হয়েছে। ললিতার নির্ভীক বিদ্রোহঘোষণার পাশে সুচরিতার শান্তধীর বিনয়নম্র নূতন জ্ঞানআহরণের জন্য উন্মুখ ভক্তিপূর্ণ শিক্ষার্থীর মত প্রকৃতিটি একটি সুন্দর বৈপরীত্বের হেতু হয়েছে। পরেশবাবুর সঙ্গে তার সম্বন্ধটি ভক্তির সুরভিঅর্ঘে, উদ্বিগ্ন স্নেহব্যাকুলতায়, সর্বোপরি একটি গভীর অধ্যাত্মমিলনে, পিতাপুত্রীর পরস্পর সম্পর্কের আদর্শস্বরূপ হয়েছে অথচ এর মধ্যে আদর্শলোকের ছায়াময় অস্পষ্টতা কোথাও নেই। সুচরিতারমত আত্মসুখে উদাসীন, আত্মবিসর্জন উন্মুখ প্রকৃতি যে হারাণকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হয়েছে তার কারণ কিছুটা পরেশবাবুর প্রতি ভক্তি ও গোরার প্রতি নবজাত অনুরাগ, কিন্তু এই বিচ্ছেদসংঘটনের প্রধান দায়িত্ব হারাণেরই। তার আধ্যাত্মিক অহংকার, তীব্র অসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তির একান্ত অভাবই সুচরিতার মত মধুর স্বভাবকেও তিক্ত করে তুলেছে। ব্রাহ্মসমাজের মত নিজেদের আধ্যাত্মিক জাগরণ সম্বন্ধে প্রবলভাবে সচেতন, নবউৎসাহের মাদকতায় প্রচন্ডভাবে উগ্র, নবীন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই হারাণের মত চরিত্রের আবির্ভাব সম্ভব। জড়, নিদ্রালস ও গভীর উদাসীনতাপূর্ণ হিন্দুসমাজে সামাজিক অত্যাচারের আকার অন্যরকম। হিন্দুধর্মের অত্যাচার অনেকটা চেতনাহীন মূঢ় যান্ত্রিকতার অত্যাচার; হৃদয়হীন নির্বিকারতাই এর উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র; এর মধ্যে নির্মম ব্যূহরচনা, ক্রূর যুদ্ধকৌশলের বিশেষ প্রকাশ নেই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎপীড়নের মধ্যে আধ্যাত্মিক দম্ভের সমস্ত বিষজ্বালা বর্তমান; এর সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণতা, সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি আধ্যাত্মিকতার কপটবেশ পরিধান ক'রে, ভগবানের নামকে মিথ্যাভাণে জয়পতাকার মত আস্ফালন ক'রে—এর যারা লক্ষ্যবস্তু তাদের জীবনকে বিষজর্জর করে তোলে। এর নীতি চাণক্যনীতির মত কূটকৌশলময়, নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে এর বিশ্বাস আত্মম্ভরিতায় উন্নীত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মধর্মের জোয়ারে আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিপরীত লক্ষণও যে দেখা দিয়েছিল, হারাণবাবুর মত চরিত্রই তার প্রমাণ।

"সুচরিতার হৃদয়ে প্রেম নিতান্ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ম্লান সন্ধ্যালোকের মত অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছে। ললিতার মত তাহার তীব্র বিদ্রোহ ও অসহ্য অন্তর্জ্বালা নাই, আছে এক প্রকার শান্ত, মৃদু বিষণ্ণ বিস্ময়। গোরার উপেক্ষাতে একটা অনির্দেশ্য বেদনাবোধই তাহার প্রেমের প্রথম সূচনা। তারপর গোরার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, তাহার প্রবল আবেদন, তাহার স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতা, সুচরিতার সমস্ত বদ্ধমূল পূর্ব সংস্কারকে সবলে উন্মূলিত করিয়া দুর্নিবার বেগে তাহাকে গোরার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে।" গোরার আকর্ষণী শক্তি এতটাই অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে যে তার

আজন্মলালিত পরেশবাবুর প্রভাবও এর দ্বারা ম্লান হয়ে গিয়েছে। তার একনিষ্ঠ ভক্তিপ্রবণ মনে ধর্মবিপ্লবের আঘাতের গভীরতা খুব নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক আঘাতেই সে পরেশবাবুর আদর্শ ও শিক্ষাকে আরও ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে; পুরাতনের সঙ্গে দুর্জয় নবউপলব্ধির একটা সমন্বয় করতে চেয়েছে। প্রেমের গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গোরার নূতন আদর্শ তার অন্তরের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করে সেখানকার বদ্ধমূল ধর্মসংস্কারগুলিকে যেন বিস্ফোরক তেজে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সুচরিতা সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিজেকে হিন্দু নামে পরিচিত করেছে। হরিমোহিনীর সমস্ত মূঢ় বিরুদ্ধাচরণ তাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ পীড়িত করেছে কিন্তু তার স্বাভাবিক নম্র ও আদেশপালন তৎপর প্রকৃতিটিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করতে পারেনি। শেষে এক মুহূর্তে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। গোরার জন্ম রহস্যপ্রকাশ সুচরিতাকে দ্বন্দ্বহীন করেছে, গোরাকে সুচরিতার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, ওই নারীর ধর্মসংস্কারে কোন অস্থির ঢেউ না তুলেই। সুচরিতার আত্মজিজ্ঞাসাশীল হৃদয় অতীতের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ স্বীকার না করেই তার সমাগত প্রেমের নবীন আদর্শকে এক বৃহৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বরণ করে নিয়েছে। সুচরিতার প্রেমই যেন তার সুতীব্র আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সত্তাকে বহিঃ-সংস্কারের কঠিন আবরণ থেকে মুক্তি দিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে একাত্ম করে নিয়েছে। তাদের পরিণয় দুটি দীপ্ত মানবাত্মার একান্ত মিলন।

সুচরিতার চরিত্রের বিশেষত্বই এই যে, আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ দিয়েই এর পূর্ণবিকাশ। তার সমস্ত যুক্তিতর্ক, তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অস্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব ক্রমে উজ্জ্বল দীপশিখার মত ভাস্বর হয়েছে। সাংসারিক কর্তব্যের চাপে এ প্রকৃতি ফুটত না, উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণায় এ স্বাধীনতা পেত না, প্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়ে এর সার্থকতালাভ হোত না। "তর্কমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা গভীর জীবনরহস্য ধরা যায় না—এই সাধারণ বিশ্বাস সুচরিতার চরিত্রের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।"

হরিমোহিনীর চরিত্রের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। গ্রন্থের প্রথমাংশ সে একজন খাঁটি হিন্দু ঘরের বিধবা—তেমনি কুণ্ঠিত, তেমনি পরমুখাপেক্ষী, তেমনি সর্বংসহা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুচরিতার উপর নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তার দৃঢ় সংকল্প ও নূতন নূতন উপায়উদ্ভাবন কৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সুচরিতার শান্ত নম্র প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখা সহজ কিন্তু গোরার সঙ্গে সংঘাতেও সে লিপ্ত হয়েছে এবং গোরার মত অনমনীয় ব্যক্তিত্বকেও সে সংকোচের দ্বিধাভাব ও পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করিয়েছে। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। হরিমোহিনীর পূর্বজীবনের ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে তার দেবরেরা ফাঁকি দিয়ে তার সম্পত্তি অধিকার করেছিল, কিন্তু সুচরিতার উপর আধিপত্য বিস্তারে সে যথেষ্ট বৈষয়িক বুদ্ধি ও কূট চালের পরিচয় দিয়েছে।

আনন্দময়ী ও পরেশবাবুকে আদর্শস্থানীয় চরিত্র বলা যায়। এই ধরণের চরিত্রকে কিছুটা রক্তমাংসহীন ও অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর মধ্যে তবু আনন্দময়ী চরিত্রটিকে আমরা কিছুটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর পূর্ব ইতিহাস তাঁর চরিত্রের উপর অনেকটা সন্তোষজনক আলোকপাত করে। তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব—সর্বপ্রকার আচারবিচারগত সংস্কার নিরপেক্ষতা, সর্ববিধ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি, স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি,পরকে আপন করার ও সমস্ত বিষয়ের ভাল দিক লক্ষ্য করবার অসামান্য ক্ষমতা, নীরব অভিযোগহীন সহিষ্ণুতা ও করুণ সমবেদনা—গোরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করা থেকেই উদ্ভূত। আনন্দময়ীর ব্যবহার ও কথাবার্তায় যে গভীর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন পাণ্ডিত্য বা তার্কিকতার কাঠিন্য নেই, কোন অধীত বিদ্যার উগ্র গন্ধ নেই, তাঁর ব্যক্তিত্ব নিতান্ত স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক, দয়ামায়া ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল। বিনয় ও গোরার প্রত্যেক ভাব-পরিবর্তন, মনোজগতের প্রত্যেক তরঙ্গলীলা তাঁর নখদর্পণে—একপ্রকার সহজ সংস্কারের বলে যেন তিনি

তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখেছেন। যেখানে তাদের আচরণ অনুচিত বলে তাঁর মনে হয়েছে, সেখানেও উচ্চমঞ্চ থেকে উপদেশের আড়ম্বর নেই, আছে সস্নেহ অনুনয়। আনন্দময়ীর চরিত্রের খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণ না থাকলেও তার আশ্চর্য উদারতা ও অনাবিল করুণার্দ্র বিচারবুদ্ধি কোন মূল উৎস হতে প্রবাহিত তার একটা সাধারণ ধারণা আমরা করতে পারি। আনন্দময়ী নিজের পূর্বইতিহাস বিবৃতি প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন, তাঁর স্বামীর চাকরির সময় তাঁর পূর্ব সংস্কারগুলিকে একটি একটি করে সবলে উৎপাটিত করা হয়েছে এবং তাই তাঁর সংস্কারমুক্তির কারণ। কিন্তু পাঠক গভীরভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারে এই রমনীর সংস্কারমুক্তি এসেছে যেদিন তিনি জন্মমুহূর্তে শিশু গোরাকে মা রূপে কোলে তুলে নিয়েছেন, নিজে নিঃসন্তান হিন্দুনারী হয়েও আইরিশম্যানের সন্তানকে একই সাথে আত্মশিশু ও বিশ্বশিশুরূপে বুকে ধারণ করেছেন, সেদিন থেকেই এক অতর্কিত ভাব বিপ্লবের পথ ধরে।

পরেশবাবু চরিত্রটি আদর্শবাদপুষ্ট; তাঁর আধ্যাত্মিক পরিণতির পূর্ব ইতিহাস লেখক দেখান নি। তাঁর উক্তিগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের গুরুভার বা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার অহঙ্কার তত নেই, বরং রয়েছে এক গভীর অনুভূতি। কিন্তু তবু আনন্দময়ীর মত তাঁর জ্ঞান একেবারে সহজ বোধ ও সস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; এ যুক্তিতর্ক ও কঠোর তত্ত্ব-অন্বেষণ-নির্ভর। অতএব আনন্দময়ী চরিত্রের স্বাভাবিকতা এতে নেই। তাঁর অতীত জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জানা যায় না। বরদাসুন্দরীর মত সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন রমনীর সঙ্গে কিভাবে তাঁর বিয়ে হ'ল, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কিভাবে তিনি নিজেকে একদিন মিশিয়েছিলেন, যে বিরোধের ফলে তিনি সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করে নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন—সে সব পূর্ব ইতিহাস লেখক দেন নি। আবার পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কিছুটা তত্ত্বমূলক, ততটা কর্মমূলকনয়, এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধ্যানে পরিস্ফুট কিন্তু সংসারের বাস্তবপথে অন্যকে পরিচালনার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। তাঁর পরিবারের মধ্যে একমাত্র সুচরিতাও ললিতাকেই তিনি প্রভাবিত করেছেন, এমনকি ললিতার উপরও তাঁর প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয় নয়। মোট কথা পরেশবাবু আমাদের কাছে খুব একটা জীবন্ত চরিত্র বলে প্রতিভাত হন না, তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর উক্তিগুলির খুব একটা ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন হয় নি। বস্তুত এ চরিত্রে রয়েছে মহাপুরুষ-জনিত এক অসাধারণত্ব ও দুজ্ঞেয়তার ছাপ।

অন্যান্য গৌণচরিত্রের মধ্যে মহিমই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদর্শবাদ ও তত্ত্ব নয় এই চরিত্র বাস্তবতা ও সুবিধাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোরা ও বিনয়ের আশৈশব বন্ধুত্বের মূলধন ভাঙিয়ে সে নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য বর কিনতে উৎসুক। গোরার হিন্দুধর্মে আত্যন্তিক নিষ্ঠা, বিনয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রসূত উদারতা, পিতা কৃষ্ণদয়ালের যোগাভ্যাস ও গুরুভক্তি সমস্তকেই সে তার স্বার্থের আলোকে অভ্যর্থনা করে থাকে। সকল ধর্মমতের তলায় যে পঙ্কিলতা তার সংকীর্ণ মনে তাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তার নেই, ভণ্ডামি তার কাছে প্রতারণা নয় বরং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। সে একালীন বণিকধর্মী মানুষ, গোরার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে নিজের সাংসারিক সুবিধার তুচ্ছ প্রয়োজনে লাগাতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত তার নির্বাচিত জামাতা অবিনাশের সঙ্গে পাঠক তার মিল খুঁজে পেয়েছে, অবিনাশের বাইরের ভাবমুগ্ধতার ভিতরে—সে গোরার ভক্তশিষ্য—রয়েছে এক কঠিন বাস্তবতা ও স্বার্থবোধ। সনাতন হিন্দুধর্মের জয়গানেই সে আগাগোড়া ব্যস্ত। "উচ্চ আদর্শের বাদপ্রতিবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম মতদ্বৈধের মধ্যে, মহিমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাংসারিক বুদ্ধি, সরস বাকচাতুর্য ও অকুণ্ঠিত সুবিধাবাদের প্রতি আনুগত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।"

"কেবল তত্ত্বালোচনার দিক হইতে গ্রন্থটির স্থান খুব উচ্চে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মতদ্বৈধের বিষয়গুলি ইহাতে নিঃশেষভাবে ও গভীর চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।) তবে হিন্দুধর্মের অনুকূল যুক্তিগুলিই লেখকের সমধিক সহানুভূতিও সমর্থন কৌশল আকর্ষণ করেছে। এর গৌরবময় অতীত ইতিহাস, এর অধুনাবিকৃত উচ্চ আদর্শ, জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার পিছনে যে সূক্ষ্ম

ন্যায়বিচার, উচ্চাঙ্গের কল্পনাবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, আত্মরক্ষা ও নিজ উচ্চতর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে সমাজের যে নিগূঢ় অধিকার—হিন্দুধর্মের এই সমস্ত বিশেষত্ব—যা বিদেশীর চোখে এত হাস্যাস্পদ ও যুক্তিহীন বলে মনে হয়—লেখক আশ্চর্য সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতার অঞ্জন চোখে মেখে হিন্দুধর্মের বিকারগুলিকেও রমণীয় করে দেখিয়েছেন। এরসঙ্গে তুলনায় ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষতামূলক উক্তিগুলি নিতান্ত সাধারণ ও প্রাণহীন মনে হয়। হারাণবাবু বা বরদাসুন্দরী কেউই ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত সমর্থক বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়। পরেশবাবু কোন সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্র নন—তার উদারতা ও আধ্যাত্মিক পরিণতির জন্য কৃতিত্ব ব্রাহ্মসমাজ দাবী করতে পারে না। যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও সর্বত্যাগী ধর্মপ্রেরণা ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকদের শত অসুবিধা তুচ্ছ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, গোরাতে তার প্রতি কোন সুবিচার চেষ্টা দেখা যায় না। লেখকের যুক্তিতর্ক নূতন ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর সমস্ত করিকল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা, সমস্ত পরিতাপতীব্র ও খেদজনিত আবেগ হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবের লুপ্তপ্রায় ভগ্নবিশেষ—তার দিকে অনিবার্য বেগে আকৃষ্ট হয়েছে।

৬.২ উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব ও গোরা উপন্যাস

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"য় প্রকাশিত গোরা উপন্যাসের সমালোচনার প্রতিরূপ লিপিবদ্ধ করলাম। অতঃপর উপন্যাসের শিল্পতত্ত্বের নিরিখে গোরা উপন্যাসের কিঞ্চিৎ পর্যালোচনায় এগোচ্ছি। উপন্যাস শিল্প হিসেবে গোরা একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্ম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। E. M. Forster -এর Aspects of the Novel, Percy Lubbock এর The Craft of Fiction ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব তথা নির্মাণ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। উপন্যাস গল্প বলে—'oh dear yes, the novel tells a story' এই ফর্স্টার বাণী সুপরিচিত, মূলকথা এই গল্পকে উপন্যাসে আকার দেয়ার জন্য লেখককে বিশেষ শিল্পরীতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

গোরার মত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়—যথাক্রমে—(১) Structural Problems—Unity and coherence, Plot and story; The Time Factor; — গঠনগত সমস্যাবলী — ঐক্য ও সংলগ্নতা, প্লট ও কাহিনী; সময়পট। (২) Narrative Technique গল্পকথন পদ্ধতি। (৩) Characterization চরিত্ররূপায়ণ। (৪) Dialogue সংলাপ। (৫) Background পটভূমি। (৬) স্টাইল বা ভঙ্গিমা। এখন উপন্যাসটির পাঠবিশ্লেষণের সাহায্যে একে একে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

প্রথমেই আলোচিতব্য গোরা উপন্যাসের ঐক্য ও সংলগ্নতা, প্লট ও কাহিনী এবং সময়পটসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ। উপন্যাসের ঐক্য ও সংলগ্নতার ক্ষেত্রে W.H.Hudson তার "An Introduction To The study of Literature" গ্রন্থের "The Study of Fiction" অধ্যায়ে উপন্যাসের দু' ধরণের প্লট লক্ষ্য করেছেন। "These are what we may call respectively the novel of loose plot and the novel of organic plot"—এক ধরণের প্লটকে শিথিলবিন্যস্ত প্লট বলা যেতে পারে; আর একধরণের প্লট হচ্ছে একমুখী প্লট। প্রথম ক্ষেত্রে মূলকাহিনীর মধ্যে একাধিক উপকাহিনী থাকে অথবা অজস্র ঘটনা থাকে যারা পরস্পর খুব একটা ন্যায়সঙ্গতভাবে যুক্ত থাকে না। একজন ব্যক্তি বা নায়কের জীবনে যে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে তারই শিথিল বিন্যাস্ত সমাহারপুঞ্জ এখানে। উদাহরণ হিসেবে ডিকেন্সের "পিকউইক পেপার্স" বা থ্যাকারের "ভ্যানিটি ফেয়ার" উপন্যাসের নাম করা যায়। অন্যদিকে সংহত প্লটের উপন্যাসে প্লট বা কাহিনীর একটা স্পষ্ট ছাঁচ থাকে যা সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত, ঘটনাগত উপাদানের সুলগ্নতাযুক্ত। গোরা মাঝারি অবয়বের উপন্যাস—রবীন্দ্ররচনাবলীতে (সপ্তম খণ্ড : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৫) তিনশো পাতা স্থান অধিকার

করেছে। এই উপন্যাসের ঘটনাবলী মোটামুটিভাবে গোরা-বিনয়কে ঘিরে আবর্তিত কিন্তু পাশাপাশি আরো নানা চরিত্র ও সংঘটন আছে। একে আমরা প্লটের দিক থেকে মধ্যবর্তী স্থানে রাখতে পারি অর্থাৎ কিছুটা loose plot ও কিছুটা Organic plot এর মিশ্র অবয়ব এখানে।

E. M. Forster তার Aspects of the Novel এ প্লটের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"A plot is also narrative of events, the emphasis falling on causality"—প্লট কাহিনী বা ঘটনা বর্ণনা করে কিন্তু জোর দেয় ঘটনার কার্যকারণশৃঙ্খলা অর্থাৎ বাস্তবতার উপর। বাইরে যা নিছক গল্প, উপন্যাসে সন্নিবেশিত হলে তাই হয়ে ওঠে প্লট—সেখানে লেখককে পদে পদে বাস্তবতার দাবী মেনে চলতে হয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হয়, ঘটনার কার্যকারণসূত্র স্পষ্ট করে দেখাতে হয়। আমরা দেখি গোরা উপন্যাসে বাস্তবতার দাবী গুরুত্ব পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথই যে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত রোমান্স বা কল্পনা ও আকস্মিকতা নিয়ন্ত্রিত কাহিনীর পরিবর্তে বাস্তবতা বা যুক্তি বিশ্লেষণ সমন্বিত কাহিনীর প্রচলন করলেন তা এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়। এজন্যই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে বাংলা উপন্যাসে প্রথম আধুনিকতার শুরু হয়েছে। গোরা উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে কল্পনাসমৃদ্ধ, কাব্যিক বা রোমান্টিকভাবে—"শ্রাবণমাসের সন্ধ্যাবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কলেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-করকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের দ্বারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।" কিন্তু এই রোমান্টিক উচ্ছাসের হাত এসে ধরল অবিলম্বে বাস্তবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা—"ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই মেয়েটির পিছনে দাঁড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।" এখানে বিনয়ের সঙ্গে সুচরিতার প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণিত এবং উপন্যাসটির প্লট যে realism-naturalism অর্থাৎ আধুনিক বাস্তবতার দিকে ধাবিত হবে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

সময়পটের ব্যাপারে বলা যায় গোরা উপন্যাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ উপস্থাপিত, ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ এবং হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতসমন্বয়ের দিকটিও এখানে আলোচিত। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

গোরা উপন্যাসের চরিত্রায়ন বা Character প্রসঙ্গ নিয়ে অতঃপর কিছু বলা যাক। এ উপন্যাসে চরিত্রের বর্ণউজ্জ্বল বিচিত্র সমারোহ রয়েছে। গোরা এবং বিনয় চরিত্রই সর্বাধিক কৌতূহলের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গত দিয়েছে সুচরিতা ও ললিতা চরিত্র। উপন্যাসের নায়কনায়িকা সম্পর্কিত তত্ত্ব বা প্রসঙ্গ এখানেই নিহিত। গোরা অবশ্যই এ উপন্যাসের নায়ক, তার নামেই উপন্যাসের নামকরণ; বিনয় গোরা চরিত্রের আড়ালে কিছুটা চাপা পড়েছে কিন্তু এ আড়াল ভেঙে বাইরে আসার বিদ্রোহ বিনয় চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকন্তু তার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম ভাবুকতা। এই ধরণের যুগল বন্ধু চরিত্র যারা অত্যাগসহন অথচ স্বভাবে বিপরীত রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য। আমরা গোরাবিনয় ছাড়া শচীশ-শ্রীবিলাস, নিখিলেশ-সন্দীপ, সুপ্রিয়-ক্ষেমংকর প্রভৃতি নামউচ্চারণ করতে পারি। গোরা চরিত্রের দৃপ্ত তেজ ও বিনয় চরিত্রের অনুভূতিসূক্ষ্মতা দুই-ই রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গোরা এবং সনাতন হিন্দুধর্ম এই দুই এর চাপে পড়ে দ্বন্দ্বময় বিনয়ের আন্তর বিদ্রোহ এই চরিত্রকে আকর্ষনীয় করেছে—"বিনয় পদে পদে তাহাদের দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে। অনেক সময় দ্বিধা বোধ করিয়াছে, তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি।" অল্প কথায় অনেক কিছুই বলা হয়েছে। গোরা চরিত্রের তেজোময় হিন্দুত্বও লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে দেখিয়েছেন, বস্তুত এ ব্যাপারটির উপরই উপন্যাসের মূল প্রবাহ অনেকটা নির্ভর করছে। পাঠক দশম অধ্যায়ের শুরুতেই গোরার আগমন

বর্ণনা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন—"গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরণে মোটা ধুতির উপর ফিতাবাধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতো। কে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।"

সুচরিতা ও ললিতা এই যুগল নারীচরিত্র অঙ্কনে উপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুচরিতা শান্ত ও আত্মসমর্পণময়, ভাবপ্রাধান্যমূলক; ললিতা তর্কপটু, বিদ্রোহিনী, বুদ্ধিদীপ্ত; এই দু'টি চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক। সুচরিতার হৃদয়ে গোরার প্রতি প্রেমআবির্ভাবের বর্ণনা প্রথমে আভাসেইঙ্গিতে ও পরে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত। সুচরিতার অন্তর্মুখি ব্যক্তিত্বের চারদিকে একটা রহস্য ও সৌন্দর্যের ছায়া অবশ্যই আছে। নিদ্রাহারা রাতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের শুরুতে নায়িকার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে প্রেমের মনস্তত্ত্ব যথেষ্টই প্রকাশিত—"ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। সেই সূর্যাস্তরঞ্জিত গাড়িবারান্দার উপর গোরার উদ্দীপ্ত মুখ স্পষ্ট ছবির মতো তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল এবং তখন তর্কের যে সমস্ত কথা কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল কে সমস্তই গোরার গভীর প্রবল কণ্ঠস্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়া তাহার মনে পড়িল।" ললিতাকে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ, এ উপন্যাসে তাকে বিনয়ের প্রণয়িনীরূপে দেখতেই আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।" এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিনয়ও তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়াতে সে একদিকে সংকোচ এবং অন্য দিকে একটা নিগূঢ় হর্ষ অনুভব করিতেছিল। এই হর্ষ যেন নিষেধের সংঘাত দ্বারাই বেশি করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, তাহার এত কাছে আসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে আত্মীয় সমাজের কোনো আড়াল নাই, ইহাতে কতখানি কুণ্ঠার কারণ ছিল—কিন্তু বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আব্রু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্তার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল।" স্টীমার যাত্রাকালীন ললিতার এই হৃদয়ভাবনা বিনয়ের প্রতি তার প্রেমানুরাগকেই ব্যক্ত করছে।

গোরা উপন্যাসের চরিত্রায়ন সম্বন্ধে আরো দু'একটি কথা বলা যায়। আনন্দময়ী চরিত্রের ভিতর দিয়ে মানবধর্মের প্রকাশ; পরেশবাবুর চরিত্রেও একই মানবতাবাদ প্রকাশিত। হারাণ বা পানুবাবুর ভিতর গোরার প্রতিস্পর্ধী একটি চরিত্রের অবতারণা, একে ঘিরে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণাও হয়েছে। কৃষ্ণদয়ালবাবু অর্থাৎ গোরার পিতার তন্ত্রমন্ত্রে আসক্তিও কৌতুকের আবহ সৃষ্টি করেছে। আনন্দময়ী গোরাকে যথার্থ পুত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণদয়াল প্রথমে তাকে পুত্র হিসেবে খুব একটা স্বীকার করেননি, পরে তাঁর হিন্দুয়ানী যত বাড়াবাড়ি চেহারা নিয়েছে বিজাতীয় গোরার স্পর্শ তত সাবধানে তিনি এড়িয়ে যেতেন। গোরার প্রকৃত পরিচয়ও স্বয়ং তিনিই তাকে প্রদান করেছিলেন, ভেবেছিলেন এভাবেই গোরাকে উন্মার্গগামী ভুল ধর্মচেতনার হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু গোরা জীবনে আত্মস্থ হয়েছে সুচরিতার ভালোবাসার বন্ধনে বন্দী হয়ে। অতএব গোরা উপন্যাসের পরিণতি তত্ত্ব ও ধর্মবিতর্ক ছেড়ে শেষপর্যন্ত মানবজীবনের বিকাশই দেখিয়েছে এবং এ ভাবেই পেয়েছে এক নিজস্ব শৈল্পিক মাত্রা।

এছাড়া গোরা উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব বিচার করতে গেলে—উপন্যাস হিসেবে তার শৈল্পিক সার্থকতা দেখতে গেলে এর সংলাপ, পটভূমি, স্টাইল ও সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত লেখকের জীবনদর্শনও বিচার্য। সংলাপরচনার নৈপুণ্যের উপর ঔপন্যাসিকের উৎকর্ষ অনেকটাই নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসসাহিত্যে সংলাপরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সংলাপ কোনো চরিত্রের মুখে হয়ে ওঠেছে অনুভূতিপ্রধান ও ভাবময়, আবেগগর্ভ; আবার কোনো চরিত্রের মুখে হয়ে উঠেছে বুদ্ধিদীপ্ত, চাতুর্যময়, তীক্ষ্ণপ্রখর। তর্কবিতর্ক এ উপন্যাসে পাতার পর পাতা জুড়ে আছে—মূলত এ বিতর্ক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে, যদিও অন্যভাবে দেখলে একে বিপরীত প্রকৃতির দ্বৈরথই বলা যায়। উপন্যাসের পাতার পর পাতা জুড়ে অনুরূপ তর্ক আমরা বিশ্বসাহিত্যে অলডাস হাক্সলির 'Point Counterpoint', টমাসমানের 'Magic Mountain', অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছয়খন্ড "সত্যাসত্য" প্রভৃতি বই-এ

দেখেছি। "সুচরিতা কহিল, 'আপনার বন্ধুর মনে বোধ হয় সংস্কারগুলো খুব দৃঢ়।"

বিনয়। বাইরে থেকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হয়। কিম্বা একটা কথা আপনি মনে রাখবেন আমাদের দেশের সংস্কারগুলোকে তিনি যে চেপে ধরে থাকেন, তার কারণ এ নয় যে, সেই সংস্কারগুলিকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন।" অথবা "গোরা.....কহিল, 'ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব। আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

"কিম্বা বিনয় কহিল, 'ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি আমাকে কোনোদিন তুমি দ্বিধা করতে দিয়ো না।" লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই সংলাপ হালকা ও ঝকঝকে, কথ্য বাগভঙ্গীর চমৎকার ব্যবহার এখানে।

গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতার সংলাপ কখনো কখনো হয়ে উঠেছে কাব্যিক—সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ, ভাবাবেগময়। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—গোরার সংলাপ থেকে—"গোরা কহিল, 'ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখছি পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে....."। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহারে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন,তিনি অসাধারণ শব্দবিদ বলেই এই ব্যাপার ঘটেছে, গদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অধিকার বড় একটা কম ছিল না।

উপন্যাসের আর একটি উপাদান background বা স্থানকালগত পটভূমি। গোরার সময়কালকে ঊনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশশতকের শুরুতে স্থাপন করতে পারি। তখন বঙ্গদেশে ঊনিশ শতকীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অভিঘাত, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ধর্ম থেকে উদিত ব্রাহ্মধর্মের পাশাপাশি অবস্থান এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বদেশচেতনার ঢেউ পটভূমিকে উদ্বেল করে রেখেছিল। এইসব ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে কলকাতা অবশ্যই ছিল এবং গোরা উপন্যাসের স্থানপটভূমি হচ্ছেএই শহর কলকাতা—ইংরেজ বনিকের বাণিজ্যরাজধানীরূপে যা ক্রমশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

উপন্যাসের style বা ভঙ্গী নামক উপাদান নিয়েও কিছু বলছি। উপন্যাসে থাকবে অনুভূতির প্রকৃত কণ্ঠস্বর। তা হবে আত্মসচেতন, স্বচ্ছ ও সরল। এখানে রয়েছে বাক্যনির্মাণনৈপুণ্য ও শব্দগুচ্ছবয়নের কৌশল। সৌন্দর্যবোধই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। Form বা আঙ্গিক হয়ে উঠবে শিল্পময়। গোরা উপন্যাসে রয়েছে Realism ও Naturalism বাস্তববাদের কল্পনামিশ্রিত ভঙ্গিমা। শব্দের শক্তিশালী প্রয়োগ, উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা বা কলাকৌশল, শৈল্পিক কর্মের সাধননৈপুণ্য, পরিচিত শব্দাবলী নিয়ে এক সতেজ নতুন জগৎ নির্মাণ বা অক্ষরভুবনের প্রতিষ্ঠা, আবেগআলোড়িত চিন্তাবস্তুর পরিবেশন, স্বতোস্ফূর্ত ও নানন্দিক রহস্যময়তা গোরা উপন্যাসে প্রাচুর্যপূর্ণভাবেই রয়েছে। বস্তুত এ সবের মিলিত যোগফলই হচ্ছে গোরা উপন্যাসের স্টাইল। এই স্টাইলকে বোঝাবার জন্য আমি গোরা উপন্যাসের ১৫তম অধ্যায়ের শুরু থেকে অনুচ্ছেদ উদ্ধার করছি—"রাত্রে গোরা বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার ছাতের উপর বেড়াইতে লাগিল।

তাহার নিজের উপর রাগ হইল। রবিবারটা কেন সে এখন বৃথা কাটিতে দিল। ব্যক্তিবিশেষের প্রণয় লইয়া অন্যসমস্ত কাজ নষ্ট করিবার জন্য তো গোরা পৃথিবীতে আসে নাই। বিনয় যে পথে যাইতেছে সে পথ হইতে তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কেবলই শরীর নষ্ট এবং নিজের মনকে পীড়িত করা হইবে। অতএব জীবনের যাত্রাপথে এখন হইতে বিনয়কে বাদ দিতে হইবে। জীবনে গোরার একটি মাত্র বন্ধু আছে তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্মকে সত্য করিয়া তুলিবে। এই বলিয়া গোরা হাত নাড়িয়া বিনয়ের সংস্রবকে নিজের চারদিক হইতে যেন সরাইয়া

ফেলিল।" রবীন্দ্রীয় উপন্যাসিক স্টাইলের পরিচয় এখানে ভাষা, আবেগ, চিন্তা, মনন সবকিছুরই এক সম্মিলিত দীপ্তির সমাহার এই উদ্ধৃতি— সমগ্রত গোরা উপন্যাসে এ ভাবেই এক মৌলিক শিল্পরীতি গড়ে উঠেছে।

প্লট-চরিত্র-সংলাপ-পটভূমি প্রভৃতি উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান গোরা উপন্যাসে কিভাবে শৈল্পিক মাত্রা পেয়েছে অতি সংক্ষেপে বললাম। কিন্তু ও সবের বাইরে সকল উপন্যাসিকের রচনাকর্মে একটি সর্বব্যাপী অতিরিক্ত চরম উপাদান থাকে। তাকে বলতে পারি লেখকের Philosophy of Life বা জীবনদর্শন। সমগ্র গোরা উপন্যাসে জড়িতামিশ্রিত হয়ে আছে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মনীষী রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ, স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা ও নরনারীর প্রেমসম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়নসংক্রান্ত অভিমত। এই মূল্যবান ভাবব্যঞ্জনা উপন্যাসটির গৌরব বহুগুণ বাড়িয়াছে। স্মরণ করুন উপন্যাসের সমাপ্তিতে গোরার মহৎ উচ্চারণ—

"গোরা কহিল, 'দেখুন পরেশবাবু, কাল রাত্রে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যে আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নতুন জীবনলাভ করি। এতদিন শিশুকাল থেকে আমাকে যে কিছু মিথ্যা যে কিছু অশুচিতা আবৃত করেছিল আজ যেন তা নিঃশব্দে ক্ষয়ে গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ করি। আমি ঠিক যে কল্পনার সামগ্রীটি প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি— তিনি তাঁর নিজের সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে এনে দিয়ে আমাকে চমকিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।' বলাবাহুল্য এখানে গোরার ভিতর দিয়ে লেখকের জীবনদর্শনই প্রকাশ। ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা ছেড়ে মানবধর্মের উদার ব্যাখ্যা গোরা উপন্যাসের একটা মূলকথা এবং রবীন্দ্রীয় ভাবনার এই এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব শিল্পের মায়াদর্পনে।

উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব ও গোরা প্রসঙ্গে বলতে পারি এ উপন্যাসে উপন্যাসশিল্পের চরম উৎকর্ষই লক্ষ্য করি, প্রতিটি উপাদান প্রতিভার রসায়নে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যময় নির্মিতি পেয়েছে।

6.3 ঃ যুগলবন্ধু চরিত্র—গোরা ও বিনয়

গোরা উপন্যাসের বিখ্যাত যুগলবন্ধু চরিত্র গোরা ও বিনয়, এরা স্বভাবে বিপরীত, পরস্পরের পরিপূরক, এইজন্যই একে অন্যকে আকর্ষণ করে। চরিত্রের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের তাত্ত্বিকেরা অনেক কথা বলেছেন। যেমন মার্টিন টার্নেল ফরাসী উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, চরিত্র শব্দগুচ্ছ নিয়ে রচিত বই এর বাইরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ চরিত্ররচনায় কল্পনার ভূমিকা যেমন আছে তেমনি চরিত্র বিচার করতে গেলে উপন্যাসের শব্দঅবয়ব ভাষাবয়বই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এডুইন ম্যুইর (Edwin Muit) তাঁর 'The Structure of the Novel' গ্রন্থে "the novel of character" এই বাকবন্ধ ব্যবহার করেছেন— উপন্যাস অনেকটাই চরিত্রনির্ভর। গোরা উপন্যাস অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে গোরা চরিত্রের জন্য অথবা টলস্টয়ের "War and Peace" যেমন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে পিটার বেজুকভ অথবা প্রিন্স অ্যান্ড্রু চরিত্রের জন্য। উপন্যাসের চরিত্রে অনেক সময় বাস্তব মানুষের আদল থাকতে পারে সমকালীন কোন মানুষ এই চরিত্রসৃষ্টির নেপথ্যে থাকতে পারে, কিন্তু লেখক তাকে কল্পনা মিশিয়েই তৈরী করেন, তার বাস্তবমূলটুকু প্রায় যেন মুছেই দেন। তাই গোরা, বিনয় প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে কোন বাস্তব মানুষের আভাস আছে কিনা এই প্রশ্ন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং এইসব চরিত্র যথার্থ কল্পনার সামগ্রী হয়ে উঠতে পেরেছে কি না, তারা যথেষ্ট জীবন্ত ও নাটকীয় কিনা— এইসব প্রশ্নই বিচার্য। উপন্যাসশিল্পীর প্রতিভার রসায়নই উপন্যাসের চরিত্রকে পরিবর্তিত আলোয় দেখায়। চরিত্রগুলি লেখককে যেন ঘিরে ধরে, এমনকি তাঁর অস্তিত্বের অংশ হয়ে যায়, তাঁর নিজস্ব স্বপ্ন ও কামনাকে আকর্ষণ করে নেয়। তাই গোরা উপন্যাসে

অনেকসময় বিনয়ের ভিতর আমরা অনুভব করি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়স্পন্দন; গোরার মনীষাদৃপ্ত ব্যক্তিত্বে তার স্বদেশপ্রেমে ও আদর্শবাদে সঞ্চারিত হয় রবীন্দ্রীয় 'ক্যারিসমা' বা বোধদীপ্ত প্রত্যয়পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিভা। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—"এমন দিনে বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তার বাসার দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া রাস্তার জনতার চলাচল দেখিতেছিল।.....

আলখাল্লা-পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচীন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর রাতে যেমন শীত শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুণগুণ করিতে লাগিল।"

এরকম অনুভূতিময় বাক্যব্যবহার আমরা ছিন্নপত্রাবলীর অনেক জায়গায় পেয়েছি কিম্বা পূর্ববর্তী জীবনস্মৃতিতে। আর রবীন্দ্রনাথের ওই বাউল পংক্তি দুটি যে কত প্রিয় তাও কারোর অবিদিত নয়। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে উপন্যাসের চরিত্ররূপে বিনয় হয়েও স্বরূপে সে যেন কিছুটা রবীন্দ্রনাথের সমভাগী হয়ে উঠেছে।

এবার গোরাচরিত্র প্রসঙ্গে যাচ্ছি। উপন্যাসের সমাপ্তি অংশে পরেশবাবুকে গোরা যে কথা বলেছিল স্মরণ করি—"গোরা কহিল, 'পরেশবাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা-না-একটায় জায়গায় বেধেছে সেইসব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিন-রাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারিনি—সেই আমার একটিমাত্র সাধনা ছিল। সেইজন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি। আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের মধ্যে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে,—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।"

বলাবাহুল্য নাটকীয়ভাবে রূপান্তরিত পরিবর্তিত নবজন্মলব্ধ নিজের মানবপরিচয়লাভে বলশালী গোরার এই উদ্দীপ্ত বাকচ্ছটা আমাদের কখন যেন নিজেদের অগোচরে 'কালান্তরের' জগতে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার জগতে নিয়ে যায়। গোরার চরিত্রের ভিতর অনুবিষ্ট হয়েছে মহৎ রবীন্দ্রীয় জীবনদর্শন সন্দেহ নেই। সেই দর্শনের মূলকথা স্বদেশপ্রেমে কর্মের সঙ্গে সত্য ও কল্যাণের যথার্থ যোগ।

জীবনের মালা থেকে খসে এসে পড়েছিল হাসি, আনন্দ, বেদনা আর উপন্যাসকার তাদের নিয়েই রচনা করেছিলেন তাঁর সৌন্দর্যলোক তথা দ্বিতীয় ভুবন। সুচরিতা, ললিতার মত নারীদের লেখক নিশ্চয়ই দেখেছিলেন—তাঁর নিজস্ব ব্রাহ্মসমাজবৃত্তের মধ্যেই তারা হয়তো ছিল। কিন্তু তারা তো ব্রাহ্ম বা হিন্দু নয়, তারা বাঙালিনী—চিরকালের মানবী, কখনো তেজে জ্বলে উঠছে কখনো বা আত্মসমর্পণে হয়ে উঠেছে কমনীয়। গোরা ও বিনয় চরিত্রদুটিকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্যই এদের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাশাপাশি দুটি অনুচ্ছেদে অবিস্মরণীয় যুগলবন্ধু চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন। লেখকের বৈশিষ্ট্য তিনি চেহারার বর্ণনা দিয়ে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন—

"সে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকিয়াছে। সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কলেজের পণ্ডিতমশাই রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রঙটা কিছুটা উগ্ররকমের সাদা—হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো—গলার আওয়াজ এমন মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; চোখের উপর ভুরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।

আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে। কলেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনোমতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারিত না। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা কয়টার ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া আনিয়াছে।"

বোঝা যায় গোরা কর্মিষ্ঠ, আদর্শবাদী, দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী; বিনয় বুদ্ধিবাদী ও ভাবুক। E.M. Forster তাঁর Aspects of the Novel গ্রন্থে বলেছেন—"We may divide characters into flat and round." দুই ধরণের চরিত্র আছে সমতল বা একপেশে ও ডৌল বা বহুমাত্রিক। একপেশে চরিত্রকে টাইপ চরিত্রও বলা হয়—তারা একমুখী প্রবণতাযুক্ত, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকে, পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু ডৌল বা বহুমাত্রিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়, নাটকীয়—আমাদের তার দিক বদলে আশ্চর্য করে দেয় কিন্তু সে দিকবদল কার্যকারণযুক্ত, আকস্মিক নয়; তার মধ্যে আছে জীবনের অনির্দেশ্যতা, "The test of a round character is whether it is capable of surprising in a convincing way..... It has the incalculability of life in it". লক্ষ্য করলে দেখা যায় গোরা এবং বিনয় উভয় চরিত্রেই ডৌল বা বহুমাত্রিক চরিত্রের লক্ষণ আছে, গোরা চরিত্রে অবশ্য পরিবর্তন কিছু বেশি। তুলনায় হারান বা পানুবাবুকে টাইপ চরিত্র বা শ্রেণীপ্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র বলতে পারি।

গোরা একদিকে পরম মাতৃভক্ত, কিন্তু সে নিজের এই অটুট মাতৃভক্তির জন্য তার হিন্দুসামাজিক আচারনিষ্ঠাকেই কারণ হিসেবে কিছুটা নির্দেশ করে। আবার বিনয়ের অতিরিক্ত হৃদয়বত্তা বা ভাবাবেগকেও তার সেরা পদ্ধতি বলে মনে হয়না। সে বস্তুত কঠোরতার ভক্ত। তার প্রাসঙ্গিক সংলাপ তুলছি—"মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে! আমার মার মতো মা কজনের আছে, কিন্তু আচার যদি না মানতে শুরু করি তবে একদিন হয়তো মাকেও মানব না। দেখো বিনয়, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো—হৃদয় জিনিসটা অতি উত্তম, কিন্তু সকলের চেয়ে উত্তম নয়।"

বিনয়ের পরিবর্তন উপন্যাসের শুরুতেই। তার মনে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে—"মত এবং মানুষে তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়াছিল।" সে এতাবৎ গোরার মতকেই নিজের মত বলে জেনেছে এবং এই নিঃসঙ্গ যুবা আনন্দময়ীকে নিজের মার মতই মনে করে। "এখনকার কালের নানাপ্রকার তামাশা এবং গোপন আঘাত হইতে সমাজ

যদি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে চায় তবে খাওয়া ছোঁয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হইবে এই মতটি বিনয় গোরার মুখ হইতে অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে, এ লইয়া বিরুদ্ধ লোকদের সঙ্গে সে তীক্ষ্ণভাবে তর্ক করিয়াছে;" এবং "গোরার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বিনয় যেদিন হইতে আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেদিন হইতে তাহাকে মা বলিয়াই জানিয়াছে।"—এই বাক্যদুটি প্রাণধানযোগ্য।

বিনয়ের চিত্তবদলের সূচনা সুচরিতার সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাতে ও পরেশবাবুদের বাড়ি গিয়ে ললিতার সঙ্গে পরিচয় ও ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধীয় ধারণাবলীর সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিচয়ে। "বিনয় পদে পদে তাহাদের দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে। অনেক সময় দ্বিধাবোধ করিয়াছে, তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ দেখাদিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি।" বিনয় চরিত্রের বিকাশ দু'ভাবে ঘটেছে একদিকে গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে, অন্যদিকে ললিতার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে। এই দুটি জিনিসে প্রথমে ছিল সংঘাত পরে ঘটল প্রার্থিত সমন্বয় বা পরিণামরমনীয়তা।

বিনয় গোরাকে শুধু বন্ধুরূপে ভালোবাসে না, নেতারূপে শ্রদ্ধা করে। পরেশবাবুর বাড়ীতে বিনয়কে তার বন্ধু সম্পর্কে কৌতূহলী জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয়েছিল—"বিনয় তাহার বন্ধুর কথা আলোচনা করিতে করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গোরার যে কিরূপ অসামান্য প্রতিভা, তাহার হৃদয় যে কিরূপ প্রশস্ত, তাহার শক্তি যে কিরূপ অটল তাহা বলিতে গিয়া বিনয় যেন কথা শেষ করিতে পারিল না। গোরা যে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের মাথার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে—বিনয় কহিল, 'এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই'।"

গোরার হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরা, তার বহিরঙ্গ নিয়ে অতি উৎসাহ কিন্তু আসলে ছিল তার শুধ স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয়। "কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা অভিমানে হাসিতে পারে, ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকলপ্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে তাহার জন্য গোরার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে, দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না—নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে। আজ তাই শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বইপড়া ও নকলকরা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অদ্ভুত কটকি চটি কিনিয়া পরিয়া বুক ফুলাইয়া ব্রাহ্মবাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল। অতএব বলতে পারি গোরার এই প্রকাশিত অহং-এর মধ্যে স্বাদেশিকতার সুরই বেশী করে বেজেছে।

সুচরিতার সঙ্গে প্রণয়ে গোরার প্রতিদ্বন্দ্বী হারানবাবু। আবার ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে তর্কবিতর্কেও গোরা হারাণবাবুর প্রধান বিরোধীপক্ষ। হারাণবাবু বাঙালি সমাজের নানা কু-প্রথার উল্লেখ করে তাদের নিন্দা করেছিলেন। গোরা কিন্তু এর জন্য হারাণবাবুর মিথ্যা ইংরেজ অনুকরণকেই দায়ী করেছিল—"গোরা কহিল, 'আপনি যাকে কুপ্রথা বলছেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বলছেন, নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না'।" অতএব গোরা দেশ সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরই জোর দিতে চায়।

গোরা চরিত্রের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের দিকটি বিশেষ আলোচনা যোগ্য। বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় তর্কবিতর্কে দ্বন্দ্বসংঘাতে গোরা চরিত্রের স্ফুলিঙ্গদীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত—এইসব অংশগুলি গোরা উপন্যাসের বহুমাত্রিক আবেদন বাড়িয়েছে।

সুচরিতার সঙ্গে যখন গোরার পরিচয় হ'ল তখন গোরা তার হৃদয়ের নবআবির্ভূত প্রেমকে প্রথমে স্বীকার করে

নি, বরং সে ওই নারীকে তার নারীত্বসমেত স্বদেশপ্রেমের আচরণমণ্ডিত করেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল। রচনাংশ উদ্ধৃত করে বক্তব্যের সমর্থনে একটু উদাহরণ দিচ্ছি—"ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল।" সে যে তথাকথিত গোঁড়া হিন্দু নয় একথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে সুচরিতাকে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। এককথায় এই অসাধারণ উপন্যাসের রবীন্দ্রীয় নায়ক নায়িকার সঙ্গে কথোপকথনকালেও প্রেমের অনুরণন নয় স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত ঝংকারকেই তার জীবনবীণার তারে তারে ঝংকারিত করে তুলেছিল। চারদেয়ালের বন্দিনী আত্মমুগ্ধা সুচরিতার মনে সে যেন ভিতরে ভিতরে একটা বৃহৎজীবনের আহ্বান জাগিয়ে তুলল।

গোরা ভ্রমণে বেরিয়েছিল, গ্রাম্য ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে গ্রহণ করবে বলে। সেই ভ্রমণকালে গোরা দেশজোড়া দারিদ্রের দুঃখ, অস্পৃশ্যতার অপরাধ, হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের দৈন্যতা সম্বন্ধে কিছু ধারণ করতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবদা অপেক্ষা আদর্শবাদ ও একপ্রকার উৎকট স্বপ্নের মায়াঘোরই তাকে যেন বেশী আচ্ছন্ন করেছিল। পরিব্রাজক গোরার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে সেই গোরাকে যেন এক অলৌকিক তত্ত্বমূর্তি, উদ্দেশ্যবাদের বিগ্রহ অথবা গ্রহান্তরের মানুষ বলে মনে হয়—"লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয়ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়মোটা, মজবুত মানুষ তিনি বাংলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালির মতো নহে। গায়ে একখানা খাকি রঙের পাঞ্জাবি জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।"

গোরা যখন তার অনুগামী ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজের পুলিশের কাছে গ্রেপ্তারবরণ করল, তাকে তার—হাজতবাস থেকে মুক্ত করতে চেষ্টিত হয় বিনয়। অধিকন্তু গোরা পেয়েছিল সুচরিতা ও ললিতার সপ্রশংস সহানুভূতি।

পিতা কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে গোরার সম্পর্কে জটিলতা ছিল। উপন্যাসের প্রায় সমাপ্তি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"কৃষ্ণদয়ালের কোনো কথায় কোনোদিন গোরার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। আজও সে তাঁহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া মনের মধ্যে স্বীকার করিল না। সাংসারিক জীবনের চেয়ে বড়ো যে জীবন, সেখানে গোরা পিতামাতার নিষেধকে মান্য করিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে না। কিন্তু তবু আজ সমস্ত দিন তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণদয়ালের সমস্ত কথার মধ্যে কী একটা সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার মনের ভিতরে এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে ছিল। একটা যেন আকারহীন দুঃস্বপ্ন তাহাকে পীড়ন করিতে ছিল, তাহাকে কোনোমতেই তাড়াইতে পারিতেছিল না। তাহার কেমন একরকম মনে হইল কে যেন সকল দিক হইতেই তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিজের একাকীত্ব তাহাকে আজ অত্যন্ত একটা বৃহৎ কলেবর ধরিয়া দেখা দিল। তাহার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ, কাজও অতি প্রকান্ড, কিন্তু তাহার পাশে কেউই দাঁড়াইয়া নাই। স্পষ্ট বুঝতে পারি গোরা চরিত্র এক গভীর আত্মিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের সমাপতনে এই আত্মিক সংকটের অভিনব নিরসনও দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণদয়াল অসুস্থ অবস্থায় ভেবেছিলেন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট। তাই গোরাকে তিনি তার আত্মপরিচয় জানালেন। 'গোরা চকিত হইয়া কহিল, 'আমি ওঁর পুত্র নই?'

আনন্দময়ী করিলেন, 'না'।

অগ্নিগিরির অগ্নিউচ্ছ্বাসের মতো তখন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'মা, তুমি আমার মা নও?'

আনন্দময়ীর বুক ফাঁঠিয়া গেল; তিনি অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে কহিলেন, 'বাবা, গোরা, তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বাবা।'

গোরা তখন কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'আমাকে তবে তোমরা কোথায় পেলে?'

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, 'তখন মিউটিনি। আমরা এটোয়াতে। তোমার মা সিপাহিদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তোমার বাপ আগের দিনেই লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল—'

গোরা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দরকার নেই তাঁর নাম, তার নাম আমি জানতে চাইনে।'

কৃষ্ণদয়াল গোরার এই উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।"

এডাবেই গোরার নবজন্ম হল। "গোরা কহিল, 'পরেশ বাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্য সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা না একটা জায়গায় বেধেছে—সেইসব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত দিনরাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি—এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে পারি নি—সেই আমার একটি মাত্র সাধনা ছিল। সেইজন্যেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যসৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বারবার ভয়ে ফিরে এসেছি—আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞানঅজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি। সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কর্মক্ষেত্র'।" —গোরার এই উত্তরণ তার মুখের দেশপ্রেমের বাণীকে প্রায় রবীন্দ্রবাণীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। (দ্রষ্টব্য 'কালান্তর' গ্রন্থ)। এজন্যই বলতে পারি গোরা চরিত্রের উপসংহার গড়ে তুলেছে এক বিশিষ্ট রবীন্দ্রীয় জীবনদর্শন। স্বদেশপ্রেম সেখানে উদার বিশ্বপ্রেম ও মানবতাবাদের সঙ্গে জড়িত। গোরার সংকীর্ণ ধর্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে গেল; এবার সে খোলা মনে সুচরিতার মধ্যে আপনার প্রেমপরিচয় অন্বেষণ করতে পারবে।

গোরা জেনেছে সে তার অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে ভারতবর্ষের কোলের উপর নূতন করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সুচরিতা গোরাকে দেখে ভেবেছিল আজও তার যুদ্ধের সাজ; কিন্তু গোরার মন প্রেমের সাজ পরেই এসেছিল।—"গোরা হাসিয়া কহিল, 'সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ঐ গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।'

এই বলিয়া গোরা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিয়া নিজের হস্ত তাহার হস্তে স্থাপন করিল।"

William H. Gass মন্তব্য করেছেন—"A great character has an endless interest, its fascination never wanes." (The concept of character in Fiction : Essentials of the Theory of Fiction; ed. by Michael I Hoffman and Patrick D Murphy) — একটা মহৎ চরিত্রের অসীম সম্ভাবনা, এর আকর্ষণ কখনো ফুরায় না, সমালোচকের এই উক্তি গোরা চরিত্র সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য। সন্দেহ নেই জীবনের মাল্য থেকে সহসা খসে পড়া এক অপরূপ ভাববীজ থেকেই কবি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসের নায়কের সূচনা করেছিলেন, জীবন রহস্যের সৌন্দর্য এই চরিত্রে বহুলভাবে ফুটে উঠেছে এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হলেও গোরা চরিত্রটিকে আমরা সহজে ভুলতে পারি না।

গোরা চরিত্রে যদি থাকে নায়কোচিত বিভা তাহলে বিনয় চরিত্রে রয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীর

সূক্ষ্ম মনন ও হৃদয়াবেগের প্রতিফলন। পাশাপাশি তার মধ্যে রয়েছে প্রেমের মনস্তত্ত্ব—ললিতার সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এই মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। তার চরিত্রের আর একটি মাত্রা প্রখর আদল পেয়েছে গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বের আত্মহারা সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। বিনয়ের জীবনে নারীর প্রথম আবির্ভাব সুচরিতার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে, এ যেন প্রায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত অভিজ্ঞতা—"বেলা বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাড়ির স্রোত অফিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং চারিদিকের কুৎসিত কলিকাতা মায়াপুরীর মতো হইয়া উঠিল, ...এই বর্ষপকৃতির রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ময় যবনিকার মতো পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল।" পরে যখন উপন্যাসের ঘটনাস্রোত এগিয়ে চলল তখন দেখি সুচরিতা নয় ললিতাই হয়ে উঠল এই নবযুবার হৃদয়ের মানবী।

বিনয়ের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন—"আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে। কলেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে।" বিনয়ের গোরার সঙ্গে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানঅভিমান, গোরার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আত্মসমর্পন আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম বর্ণিত বিষয়। "মধ্যাহ্নে গোরার কাছে যাইবার জন্য বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনয় গোরার কাছে নিজেকে নত করিতে কোনোদিন সংকোচ বোধ করে নাই। কিন্তু নিজের অভিমান না থাকিলেও বন্ধুত্বের অভিমানকে ঠেকানো শক্ত। ..... বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহির হইয়া বিনয় আবার ফিরিয়া আসিল; বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয় এই ভয়ে সে গোরার বাড়িতে যাইতে পারিল না।" আসলে বিনয় ও গোরা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে সহমতই পোষণ করত যদিও বিনয় কখনই গোরার মত হিন্দু ধর্মের উগ্র সমর্থক ছিল না। সে যখন ব্রাহ্মধর্মের চক্রে প্রবেশ করল, ললিতার প্রতি ভালোবাসা ও পরেশবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করল তখন দুই বন্ধুর সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম চিড় ধরল। দুজনের যাত্রাপথ আলাদা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কাহিনীর শেষে আবার দুজনের সখ্যতার পরিপূর্ণ মিলন ঘটে।

বিনয়ের মধ্যে ছিল বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতা। গোরাকে সে একজন প্রতিভাধর বা genius বলেই জানত। সুচরিতাকে তাই বলতে পেরেছিল—"আমি আপনাকে বলছি, আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক বলে মনে করতে পারি নে।" নির্জন ছাতে কত জ্যোৎস্নারাতে গোরার সঙ্গে সাহিত্যসমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে সে কত কথা বলেছে। আজ সে গোরাকে তার প্রেমের কথা বলতে বসেছে। বস্তুত ললিতার সঙ্গে তার প্রণয়ই বিনয় চরিত্রে অতুচ্ছের আলো ফেলেছে এবং তাকে রোমান্টিসিজমের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে ও কল্পনার প্রভু করেছে। "সে কী মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপালের কোমলতার মধ্যে কী সুকুমারভাবে প্রকাশ পাইতেছে। হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কী আশ্চর্য আলোর মত ফুটিয়া পড়ে। ললাটে কী বুদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা! আর সেই দুটি হাত—সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে। বিনয় নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে, এই আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ করে—বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোখের সামনে মূর্তিমান দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য কিছুই নাই।"

ললিতাকে কেন্দ্র করেই বিনয়ের জীবনে এই প্রেমের আবির্ভাব। এই প্রেমের কথা সে মুখ ফুটে গোরাকে বলতে

চেয়েছিল। গোরার হাজতবাস এবং স্টীমারযোগে কলকাতা যাত্রায় ললিতার কিছুটা আকস্মিকভাবে বিনয়ের যাত্রাসঙ্গী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিনয় চরিত্র তার পূর্ণতার পথে এগিয়েছে। একদিকে প্রীতির নিকষে ঘসে সে গোরার প্রতি বন্ধুত্বের সম্যক পরিচয় পেয়েছে অন্যদিকে ললিতাকে তার জীবনের পরিপূর্ণ প্রেমপ্রতিমা বলে চূড়ান্তভাবে জেনেছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে পাঠ বা Text থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি— "পূর্বে হইলে ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয়ের মনে তিরস্কারের উদয় হইত— আজ তাহা কোনোমতেই হইল না। এমন কি, তাহার মনে যে বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল— ইহাতে আরো একটি আনন্দ ছিল, তাহাদের সমস্ত দলের মধ্যে গোরার অপমানের সামান্য প্রতিকার চেষ্টা কেবল বিনয় এবং ললিতাই করিয়াছে। এজন্য বিনয়কে বিশেষ কিছু দুঃখ পাইতে হবে না। কিন্তু ললিতাকে নিজের কর্মফলে অনেক দিন ধরিয়া বিস্তর পীড়া ভোগ করিতে হইবে।.... ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটা মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমন্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।"

গোরা ও বিনয় এই যুগলবন্দির চরিত্র গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। গোরা বিনয়কে বলেছিল ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব। আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আর বিনয় বলেছিল, 'ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। .....আমাদের দুইজনের এক পথ— কিন্তু আমাদের শক্তি তো সমান নয়। গোরা সাধনায় বিঘ্ন হবে বলে বিনয়কে পর্যন্ত ত্যাগ করতে চেয়েছে, বিনয় গোরার একাধিপত্যে ক্লান্ত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে মনে মনে, শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনে অসাধারণ যুগলনারীর আবির্ভাব এক সুন্দর প্রেমপথে দুজনকে নিদ্বন্দ্বভাবে এক করে দিয়েছে। এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য বিচিত্র ঘটনাবলীর বয়ন করতে হয়েছে। হেনরি জেমস বলেছেন— "What is character but the determination of incident ? What is incident but the illustration of character." চরিত্র ঘটনাকে নির্ধারিত করে, ঘটনা চরিত্রকে প্রকাশিত করে, এক কথার ঘটনা ও চরিত্র ওতপ্রোত। (The Art of Fiction : Henry fames)। গোরা উপন্যাসের ঘটনাবলী গোরা ও বিনয় এই দু মূল চরিত্রকে ঘিরে বহুলাংশে আবর্তিত হয়েছে একথা বলা যায়। ললিতা ও সুচরিতা চরিত্রদুটি এই ঘটনাস্রোতে বেগ সঞ্চার করেছে।

6.4 ঃ যুগল নায়িকা—সুচরিতা ও ললিতা চরিত্র

সুচরিতা ও ললিতা রবীন্দ্র উপন্যাসের দুটি উজ্জ্বল নারীরত্ন, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত পরেশবাবুর সংসারের সদস্যা, একজন কন্যাস্থানীয়া ও অন্যজন কন্যা। গোরার প্রথম আবির্ভাব সুচরিতার নারী হৃদয়ে যে প্রবল ভাবতরঙ্গ তুলেছে রবীন্দ্রনাথ তা মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। গোরা দেশের দারিদ্রকে মেনে নিয়েও দরিদ্র ভারতবাসীকে ভালোবাসে, তাই সুচরিতা গোরাকে শ্রদ্ধা করেছে, পানুবাবুর সঙ্গে তর্কে গোরার পক্ষ সমর্থন করেছে। রাতে ভাবউদ্বেল চিত্তে বাড়ীর ছাদে সে একাকিনী, তার দুটি চক্ষু নিদ্রাহারা— "একজন অপরিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া আসিয়াছে, অথবা তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার অহংকার নত করা গেল না এইজন্যই সুচরিতা এতক্ষণ ধরিয়া পীড়া বোধ করিতেছে ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত হাস্যকর কিছুই হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মন হইতে সে বিদায় করিয়া দিল। তখন আসল কারণটা মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইল। আজ তিন চার ঘন্টা সুচরিতা সেই যুবকের সম্মুখেই বসিয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহাকে একেবারে যেন লক্ষমাত্র করে নাই— যাইবার সময়েও তাহাকে সে যেন চোখে দেখিতেই পাইল না। এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই যে সুচরিতাকে গভীর ভাবে বিধিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। ..... গোরার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল—গোরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল কিন্তু তবু সেই বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ পুরুষের সেই নিঃসংকোচ দৃষ্টির স্মৃতির সম্মুখে সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত ছোটো হইয়া গেল—কোনো মতেই সে নিজের গৌরব খাড়া করিতে পারিল না।"

বোঝা যাচ্ছে গোরার দৃপ্ত মূর্তি প্রথম দর্শনেই সুচরিতার কুমারীহৃদয়ে স্বর্ণিল রেখাপাত করেছে। অনুরূপ ঘটনা উপন্যাসে আরও আছে। হারাণবাবু ও গোরা তর্করত, সুচরিতা টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে। "সুচরিতা যে গোরাকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের যদি চেতনা থাকিত তবে সে লজ্জিত হইত, কিন্তু সে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াই গোরাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুই বাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে, ... আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কি, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল। সুচরিতা চরিত্রটি এভাবেই নারীর পুরুষের প্রতি আত্মনিবেদনের মহিমা নিয়ে এ উপন্যাসে ক্রমবিকশিত হয়েছে।

এবার নায়ক অর্থাৎ গোরার দৃষ্টি দিয়ে দেখা নায়িকা অর্থাৎ সুচরিতার রূপ ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় আসা যাক। ".....সেই সময়ে গোরা তাহার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়! তাহার মুখে তাহার বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে। মুখের ডৌলটি কি সুকুমার। ভ্রুযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুইটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে। ..... সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইতে লাগিল।..... দেখিতে দেখিতে সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল. একই কালে সমগ্র সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।" বলতে পারি সুচরিতা চরিত্রের অমোঘ আকর্ষণে প্রেমের ক্ষেত্রেও গোরার এক নবজাগরণ ঘটেছিল।

সুচরিতা চরিত্র হিসেবে অন্তর্মুখী—"নিজেকে সংবরণ করিয়া রাখাই সুচরিতার চিরদিনের স্বভাব ও অভ্যাস।" পিতৃস্থানীয় পরেশবাবুর প্রতি তার সেবামূলক মনোভাব, হারাণবাবুর প্রতি তার মনোভাব ক্রমশ প্রতিকূল।

পাশাপাশি ললিতা চরিত্রে কিঞ্চিৎ বহির্মুখী ছাপ আছে। সে প্রয়োজনে তেজ ও ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে। সুচরিতার প্রতি ভালোবাসায় তার এক পরিচয়, বিনয়ের প্রতি প্রেমে তার অন্য পরিচয়। ললিতা শুধু রূপসী নয় সে বিদ্রোহিনীও বটে। শুরুতে তার এক চেষ্টা ছিল বিনয়কে গোরার প্রভাবের বৃত্তের বাইরে আনা। গোরার সঙ্গে বিনয়ের মনের মিল আছে, সুচরিতার এ কথায় সে প্রতিবাদ করেছে—"ললিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, 'না, না, না, সম্পূর্ণ মিল নেই। গৌরমোহনবাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়েগেছে—সেটা দাসত্ব, সে ভালোবাসা নয়। অথচ উনি জোর করে মনে করতে চান যে তাঁর সঙ্গে ওঁর ঠিক এক মত,..... উনি গৌরমোহনবাবুকে মানছেন হয়তো ভালোবাসা থেকে, ..."।

ললিতা বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কে তার্কিক থেকে ধীরে ধীরে প্রেমিকা হয়ে উঠেছিল—"ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল।" ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গোরার হাজতবাসের আজ্ঞা এবং বিদ্রোহিনী ললিতার বিনয়ের সঙ্গে জাহাজে ষ্টীমারযাত্রায় ললিতা চরিত্র নতুন করে বাঁক নেয়। গোরার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কমে সে এখন অনুকূল। নতুন আলোয় ললিতাকে দেখে বিনয়ও এখন অধিকতর মুগ্ধ—"অথচ এই ললিতাকে বিনয় বরাবর গোরার বিরুদ্ধ বলিয়াই জানিত। যতই ভাবিতে লাগিল ততই ললিতার এই পরিণাম বিচারহীন সাহসে এবং অন্যায়ের প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহার প্রতি বিনয়ের ভক্তি জন্মিতে লাগিল। ..... ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহংকার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।" তেজ ও সৌন্দর্যের সমবায়ে রচিত ললিতা চরিত্র এভাবেই গোরা উপন্যাসে জীবনের পথ দিয়ে হেঁটে চলে গেছে।

রবীন্দ্রনাথেরই তত্ত্ব অনুযায়ী সুচরিতাকে আমরা মা জাতের মেয়ে ও ললিতাকে প্রিয়াজাতের মেয়ে বলতে পারি, একজনের সঙ্গে লক্ষ্মীর অন্যজনের সঙ্গে উর্বশীর তুলনা। গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ realism-naturalism এর অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববাহিত বাস্তবতারই পথবাহী হয়েছেন তবু বলা যায় সুচরিতা ও ললিতা এই দুটি শ্রীময়ী নারী চরিত্রকে অনেকটাই তিনি গীতিকবিতাসুলভ সৌন্দর্যের আধারে স্থাপন করেছেন। মনস্তত্ত্ব ও subjectivity বা আত্মমুখিনতা এ দুটি চরিত্রে ঢের রয়েছে। রালফ ফ্রীডম্যান যথার্থই বলেছেন—"Although lyrical writing is a rather specialised genre, it bears deep implications for modern writing as a whole"—সামগ্রিকভাবে একালের উপন্যাসে গীতিকাব্যিক ছাপ যথেষ্টই আছে, গীতিকাব্যিক রচনা সাহিত্যে জাতি হিসেবে যদিও স্বতন্ত্র। (The Lyrical Novel : Retrospect and Prognosis—Ralph Freedman; Essentials of the Theory of Fiction)। গোরা উপন্যাসে চরিত্রবয়নে ও ভাষাবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বহুসময়েই পাঠক-পাঠিকাকে গীতিকাব্যিক মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন।

৬.৫ অন্যান্য চরিত্র

গোরা উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আনন্দময়ী, কৃষ্ণদয়াল, বরদাসুন্দরী, হরিমোহিনী, মহিম, অবিনাশ, হারান বা পানুবাবু, পরেশবাবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে এদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। আনন্দময়ী চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। আইরিশশিশু গোরাকে বুকে ধারণ করে তিনি এক উদার বিশ্বমাতৃত্বের ধারণায় উন্নীত হয়েছেন। সমাজের সংকীর্ণ মতামতকে উপেক্ষা করার মত সৎসাহস তিনি এখান থেকেই অর্জন করেছিলেন। আনন্দময়ীর গোরার প্রতি উক্তি উদ্ধৃত করছি—"কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস? ছোটো ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাতি নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেছি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোটো জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।" উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখছি গোরা তাঁকে বলেছে—"মা তুমিই আমার মা। যে মাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।" বস্তুত মাতৃত্বের এক উদার রূপই আনন্দময়ী চরিত্রে দেখা যায়। কৃষ্ণদয়ালবাবু প্রথম জীবনে আনন্দময়ী শিবপূজা করলে ঠাকুর ছুঁড়ে ফেলতেন, পরে তিনিই উত্তরজীবনে উৎকট আচারতান্ত্রিক হিন্দুয়ানিতে মেতে ওঠেন। তাঁকে ঘিরে এ অংশে অল্পস্বল্প হাস্যরসও ফুটেছে। গোরার সঙ্গে তাঁর যুগবৎ ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক। বরদাসুন্দরী

সংকীর্ণচিত্ত ব্রাহ্মসমাজের রমণী, হরিমোহিনী সকীর্ণচিত্ত হিন্দুসমাজের রমণী। মহিম সাংসারিক চরিত্র, অবিনাশ- ও ভবিষ্যতে তাই হবে। হারাণ বা পানুবাবু গোরার ব্রাহ্মসামাজিক প্রবল প্রতিপক্ষ, প্রেমেও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে কেন্দ্র করে কিঞ্চিৎ হাসরসেরও পরিবেশন আছে। ভন্ডামির প্রতিমূর্তি, শেষে তার পরাভব। পরেশবাবু উল্লেখযোগ্য চরিত্র, আনন্দময়ীর মতই আদশবাদের প্রতিভূ। তিনি ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী এবং উদার মানবতাবাদী। গোরা তার মধ্যে দেখেছিল মুক্তির মন্ত্র, পরেশবাবু প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কোনো সমাজেই স্থান পান নি।

6.6 ঃ উপসংহার ঃ গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ

Henry fames তাঁর "The Art of Fiction এ বলেছিলেন— "A novel is in its broader definition, a personal, a direct impression of life"— উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে, বড়ো করে দেখলে, জীবনসম্বন্ধীয় এক ব্যক্তিগত, প্রত্যক্ষ ও প্রতিফলন। খুবই সত্যি কথা, গোরা উপন্যাসের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রীয় জীবনদর্শন বা আদর্শবাদের প্রতিবিম্বন দেখেছি। গোরা epic ধর্মী মহাকাব্যিক আবেদনযুক্ত উপন্যাস।এই বিশালত্ব এসেছে ভাবের মহত্ব ও গভীরত্ব থেকে। ধর্ম নয়, মানবধর্মেই মানুষের যথার্থ পরিচয়, ঔপন্যাসিক এ কথা বলতে চেয়েছেন। লিও টলস্টয়ের "War and Peace" উপন্যাসেও জীবনসম্পর্কিত এমন মহাকাব্যিক ধারণা আছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে— কিন্তু তিনি ব্রাহ্মও নন, হিন্দুও নন, এক প্রগাঢ় মানবতাবাদী।

6.7 ঃ গ্রন্থপঞ্জী : Bibliography

রবীন্দ্ররচনাবলী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত।

রবীন্দ্রজীবনকথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

E.M. Forster : Aspects of the Novel Essentials of the Theory of Fiction : ed. by Hoffman and Murphy.

6.8 ঃ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসধারা ও গোরা— এই মর্মে একটি নিবন্ধ লেখো।

২। উপন্যাসের শিল্পতত্ত্বের নিরিখে গোরা উপন্যাসের মূল্যায়ন কর।

৩। গোরা উপন্যাসে বিখ্যাত যুগলবন্ধু চরিত্র— গোরা ও বিনয় চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৪। গোরা চরিত্র বিশ্লেষণ কর ও তার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মানবধর্মের পরিচয় দিয়েছেন তার বিবরণ দাও।

৫। গোরা উপন্যাসের যুগলনায়িকা— সুচরিতা ও ললিতা চরিত্রের রূপরেখা অঙ্কিত কর।

৬। গোরা উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রসমূহের পরিচয় দাও— আনন্দময়ী, কৃষ্ণদয়াল; পানুবাবু ইত্যাদি।

৭। গোরা উপন্যাসের প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ— এই মর্মে একটি নিবন্ধরচনা কর।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. **150.00**

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007